চিত্তরঞ্জন ঘোষ

বিভূতিভূষণ

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ
২৮ শে ভাদ্র, ১৩৬৬
(বিভূতিভূষণ-জন্মদিবস)

প্রকাশক :
শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
২০, গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা--৫

পরিবেশক :
মিত্রালয়
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রক :
শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
পি, এম, বাগচী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৩৮ এ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
পূর্ণেন্দু পত্রী

সূচী

প্রথম অধ্যায়

রবির আলোকে

॥ এক ॥

॥ 'রবীন্দ্রনাথের দান' ॥

বাংলা-সাহিত্যে বিভূতিভূষণের আবির্ভাব 'প্রবাসী' ও 'বিচিত্রা' পত্রিকার মাধ্যমে। উভয় পত্রিকাই রবীন্দ্রভক্ত। 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালের সুহৃদ, এবং তাঁর আমলে উক্ত পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যার প্রথম রচনা থাকত রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত। 'বিচিত্রা'-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও রবীন্দ্রভক্ত ; তাঁর কাগজ রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করত। এই কাগজ দুটির সঙ্গেই যোগাযোগ ঘটেছিল বিভূতিভূষণের। বিভূতিভূষণও মনেপ্রাণে রবীন্দ্রানুসারী—সঠিক যায়গাতেই এসে পেঁাছেছিলেন তিনি।

বিভূতিভূষণের সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিকদের অনেকে যখন সচেতন-ভাবে রবীন্দ্র-বিরুদ্ধ বিদ্রোহ সুরু করছেন, তখন বিভূতিভূষণ সচেতনভাবেই রবীন্দ্রানুরাগী। তাঁর মনোধর্ম রবীন্দ্র-গোত্রের—এ সংবাদ তিনি মনের গভীরে জানতেন। তাই রবীন্দ্রনাথকে সেলাম জানিয়ে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে বিভূতিভূষণ কলম ধরেছিলেন। তাঁর কলমকে নিজের মনোধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়নি। প্রথম উপন্যাসেই তাঁর চরম সিদ্ধির এটি অন্যতম কারণ। তাঁর সমসাময়িকদের অনেকে, যাঁরা মনের দিক দিয়ে ছিলেন রবীন্দ্র-গোত্রীয়, রোমান্টিক বাসনা-কল্পনা ছিল যাঁদের প্রতিভার প্রাণস্রোত, তাঁরাও রবীন্দ্র-প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তাঁরা অনেকে তখন জানতেন না যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অর্থ অনেকখানি নিজের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ। এই আত্মদ্বন্দ্বে তাঁদের অনেকখানি

সময় ও শ্রমের অপচয় ঘটেছিল, সিদ্ধি হয়েছিল বিঘ্নিত ও বিলম্বিত। তাঁদের নূতন ধারা প্রবর্তনের উৎসাহ ও প্রয়াস নিশ্চয়ই উল্লেখ্য, কিন্তু তাঁদের তাৎকালিক সিদ্ধি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামান্য। অন্য দিকে, বিভূতিভূষণ পূর্বসূরীর প্রবর্তিত ধারায় চলমান, আত্মদ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে অনাগত, প্রথম গ্রন্থই তাঁর সিদ্ধির চূড়ান্ত। 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত' উত্তর-বিভূতিভূষণ কর্তৃক অনতিক্রান্ত। অন্যদের ক্ষেত্রে বিপরীত কথাই প্রায়শ সত্য ; তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধি ছিল উত্তরকালে অপেক্ষমান।

এঁদের রবীন্দ্রসাধনা ছিল রাবণের পথে—শত্রুভাবে। বিভূতিভূষণের রবীন্দ্রসাধনা মিত্রভাবে।

রবীন্দ্রনাথ কোথায় বড়, এবং কেন তাঁকে ভাল লাগে, এই আলোচনা বিভূতিভূষণ করেছিলেন একটি প্রবন্ধে। তাঁর সাহিত্য-জীবনের গোড়াতেই এটি লিখিত। 'বিচিত্রা'য় 'পথের পাঁচালী' সমাপ্ত হয় ১৩৩৬ সনের আশ্বিনে। আর ১৩৩৮-এর আশ্বিনে 'বিচিত্রায়' প্রবন্ধটি প্রকাশিত। প্রবন্ধটির নাম—'রবীন্দ্রনাথের দান'। এটি প্রায়-অজ্ঞাত একটি রচনা।* দুটি কারণে এই বিস্মৃত রচনাটি বিশেষ উল্লেখ্য। প্রথমত, ঐ সময়ের বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচার এতে আছে। তাতে রবীন্দ্রনাথের কোন বৈশিষ্ট্যগুলি বিভূতিভূষণের মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, ঐ সূত্র অবলম্বন করে রবীন্দ্রমানস ও বিভূতিমানসের আত্মীয়তা কোথায় তারও কিছুটা আভাস পাওয়া সম্ভব।

তাঁর কালের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ঐ সময়েই তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতেন। ঐ প্রবন্ধের এক যায়গায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিভূতিভূষণ বলেছেন, 'এ যুগের বাংলার কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধলেখক —তাঁর কাছে সবারই ঋণের বোঝা বিপুল, বর্তমান চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত

---

* প্রবন্ধটি খুব সম্ভবত কোন গ্রন্থে স্থান পায়নি। বিভূতিভূষণের গ্রন্থের স্বত্বাধিকারীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

করেচেন তিনি, রূপ দিয়েচেন তিনি—বিশ্লেষণ করে দেখলে সকলেরই চিন্তার উপর রবীন্দ্রনাথের এই প্রভাব ধরা পড়বেই।' বিভূতিভূষণের এই ঋণ কতটা, তার পরোক্ষ ইঙ্গিত এই প্রবন্ধটিতে পাওয়া যাবে। রচনাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আগে নিয়ে নেওয়া যাক।

প্রবন্ধটির প্রথম বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথ কোন ইংরেজ বা বিদেশী লেখকের মত ঠিক-ঠিক নন। বাংলার কোন অমুক বলা চলে না তাঁকে।

দ্বিতীয় বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনা সম্পর্কে। বিভূতিভূষণের ভাষাতেই এই যায়গাটা তুলে দিচ্ছি ঃ 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন নানাভাবে। একটা কথাই এখানে বলি। আমার হাতের কাছে একখানা বাংলা উপন্যাস রয়েছে, নাম 'বিজয়বল্লভ' (১৮৮০)।...উপাখ্যানভাগ অবশ্য কাদম্বরীর অনুকরণে রচিত, প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যে পাই decadent যুগের সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে আড়ষ্ট ও মামুলী ধরণের বাঁধিগৎ। পূর্ণিমার থেকে কোকিলের কুহু পর্যন্ত তাতে সবই আছে, নেই কেবল প্রাণ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতিবর্ণনাও সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব মুক্ত নয়, কিন্তু সর্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথেরই মধ্যে পাই প্রকৃতির বিপুলতা ও রহস্যকে। অনাড়ম্বর ও বাহুল্যবর্জিত বলেই তা প্রাণবন্ত ; অসাধারণ চক্ষুষ্মান প্রতিভা সেখানে কেতাবী বর্ণনা-পদ্ধতির মোহপাশ কাটিয়ে দিয়ে নিজের চোখ ও মনকে বড় বলে মেনেচে ; সে দর্শনও যেমন নিখুঁত, তেমনি convincing—পদ্মাচরের বিপুল প্রসারের সঙ্গে, পুষ্পিত কাশবনের সৌন্দর্যের সঙ্গে মন সেখানে একদিকে যেমন এক হয়ে মিশে যায়, অন্যদিকে তেমনি নতুন শক্তির উৎসমুখের সন্ধান পেয়ে নতুন পথে দিগ্বিজয়ে বার হবার অদম্য স্ফুর্তিকে লাভ করে। ..তাঁর নব দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যেক জিনিষটি নতুন করে দেখেচে, বিশ্ব মানবের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগসূত্রকে আবিষ্কার করেচে,—দৃষ্টির সঙ্গেই নবসৃষ্টির সূচনা হয়েচে, এমন একটি জীবন্ত সদাজাগ্রত মনের পরিচয় আমরা পাই পদ্মাবুকের বজরার কামরায় যা নিদ্রিত হয়ে পড়েনি—নির্জন

রাত্রে রহস্যময়ী প্রকৃতি কখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন, কখন তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি দেখা হবে—তারই আশায় বিনিদ্র রজনী যাপন করেচে।'

প্রবন্ধটির তৃতীয় বক্তব্য ঐ 'নতুন' শক্তির উৎসমুখের সন্ধান পেয়ে নতুন পথে' যাত্রা সম্পর্কে। বিভূতিভূষণ বলছেন, 'জীবনের ও জগতের ব্যাপারে এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাই সর্বপ্রথম। ...তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূলে আছে যে প্রগাঢ় অনুভূতি, তা সাধারণ মনের ব্যাপার নয়, চেতনা ও অনুভূতির সে স্তর সাধারণের দুরধিগম্য—তাই তাঁর কাছে আমরা যে লোকের সন্ধান পাই, আমাদের দৈনন্দিন তুচ্ছ অনুভূতি পরম্পরার বহু উর্ধ্বে সে এক অপরূপ আনন্দলোক —তাঁকে পথপ্রদর্শক না পেলে সেটা আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাতই রয়ে যেতো চিরদিন।'

চতুর্থ বক্তব্য: রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যকে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করে দিয়েছেন। 'আমাদের সাহিত্যের যে আদর্শ ছিল অত্যন্ত খর্ব, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গত পঞ্চাশ বৎসরের সাধনায় তার ষ্ট্যাণ্ডার্ড এত উঁচু করে দিয়েচেন—সাধারণ গতিতে চলতে চলতে হয়তো দেড়শো বছরেও তা ঘটত কিনা সন্দেহ।'

পঞ্চম বক্তব্য: রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা। 'রবীন্দ্রনাথের দানের তুলনা নেই, জীবনে এমন কোন দিকও নেই, যেদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েনি, যার সম্বন্ধে তিনি কিছু না কিছু নতুন কথা না শুনিয়েছেন, তা শরৎ-কালীন দুপুর সম্বন্ধেই হোক বা নাম উচ্চারণ করবার পদ্ধতি নিয়েই হোক।'

এর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্তব্যটিই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই দুটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ সগোত্র। ঐ দুটি দিকে বিভূতিভূষণের মানসিক আগ্রহকে নিঃসন্দেহে পরিপুষ্ট করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিভূতিভূষণও তাঁর সদাজাগ্রত মন নিয়ে বিশ্বমানবের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগসূত্রকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। আর তিনিও সাধারণের

দুরধিগম্য চেতনা-স্তরে গিয়ে প্রকৃতি-আবরণের অন্তরালে নতুন শক্তির উৎসমুখের সন্ধানী।

প্রকৃতিরাজ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অব্যবহিত অগ্রপথিক ও পথপ্রদর্শক। তাঁর সমগ্র প্রকৃতিচেতনাতেই তার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে। কেবল দুটি সামান্য ব্যতিক্রম উল্লেখ করা সম্ভব যেখানে বিভূতিভূষণ ঈষৎ স্বতন্ত্র।

বিভূতিভূষণ স্নিগ্ধ প্রকৃতির উপাসক। রুদ্র সব কিছুর দিক থেকে—প্রকৃতির দিক থেকেও—তিনি তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছেন। অবশ্য এ কথা ঠিক, রোমান্টিক শিল্পীদের প্রকৃতিচেতনায় নিষ্ঠুর প্রকৃতির অনুপস্থিতি স্বাভাবিক, কারণ যে প্রকৃতির গভীর প্রেমে তারা অবলুপ্তপ্রায়, তার নিষ্ঠুরতায় অন্ধ না থাকাটাই অসম্ভব।* কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃতির রুদ্র সুরে বা শক্তির প্রবলতায় মুগ্ধ হওয়ার মুহূর্ত পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিদের কাব্যে একেবারে অনুপস্থিত নয়। সে মুহূর্ত রবীন্দ্রনাথেও আছে। সেগুলির সংখ্যা তাঁদের স্নিগ্ধ মুহূর্তের তুলনায় কম হলেও তীব্র অনুভূতির আবেগেই উপস্থিত। বিভূতিভূষণে তা নয়। তিনি স্নিগ্ধ প্রকৃতির বেদীতলে একেশ্বরবাদী।

দ্বিতীয়ত, গ্রাম-বাংলার অবহেলিত তুচ্ছ প্রকৃতি-বিষয়ের এত বড় রসিক আর নেই। গ্রামদেশের গাছ পালা, রৌদ্রবৃষ্টি, আকাশ-বাতাস থেকে খানা-ডোবা পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন, এবং তাকে খুঁটিয়ে উপস্থিত করেছেন। গ্রামজীবনের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। তাছাড়া তুচ্ছ প্রকৃতি-বিষয়ের প্রতি তাঁর ঝোঁক কম ছিল। শেষ জীবনে এ ঝোঁক তাঁর কিছুটা এসেছিল —এবং হয়তো সেটা সচেতনভাবেই। কিন্তু তাঁর মনের এমন

* ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রসঙ্গে হাক্‌স্‌লির উক্তি স্মরণীয়: 'A few weeks in Malaya or Borneo would have undeceived him. Wandering in hothouse darkness of the jungle, he would not have felt so serenely certain of those "Presence of Nature", those 'souls of lonely places", which he was in the habit of worshipping on the shore windermere and the Rydal.'

একটা বিশেষ ধর্ম ছিল যার ফলে তুচ্ছকে তার তুচ্ছতার মধ্যে রেখে তার সৌন্দর্যকে আস্বাদন করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে সম্ভব হোতো না। তাঁর মনের ছোঁয়ায় তুচ্ছ তার তুচ্ছতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে একটা ঊর্ধ্বমুখী গতি নিত।

এই সামান্য পার্থক্য সত্ত্বেও মূলত বিভূতিভূষণের প্রকৃতি চেতনা রবীন্দ্র-সগোত্র।

রবীন্দ্রনাথের আর যে বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে তিনি সচেতন, সেটি তাঁর ক্ষেত্রেও বর্তমান। তিনিও সাধারণের দুরধিগম্য চেতনা-স্তরে গিয়ে প্রকৃতি-আবরণের অন্তরালে নতুন শক্তির উৎসমুখের সন্ধানী। তাঁর অপু 'চেতনা-স্তরের আর একটা dimension' খুঁজে পেয়েছে। (অপরাজিত, পৃঃ ৪০৪)। 'দৃষ্টিপ্রদীপের' নায়কও বলে, 'আমি আমার বিরাট চেতনার রথচক্র চালিয়ে দিই শতাব্দী থেকে শতাব্দীর পথে, জন্মকে অতিক্রম ক'রে আবার আনন্দ-ভরা নবজন্মের কোন অজানা রহস্যের আশায়।' (দৃষ্টিপ্রদীপ, পৃঃ ১৮০)

জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ চেতনা ক্রমাগত চলমান বলে মৃত্যু তাঁর কাছে আশঙ্কার নয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যু যেমন মাতার স্তন থেকে স্তনান্তরে আশ্রয় পাবার সামিল, বিভূতিভূষণও মৃত্যুর এক নব রূপ দেখেছেন। তাঁর কাছেও জীবন ও মৃত্যু উভয়ের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর আর এক জীবন সৃষ্ট হয়। 'নদীর ধারে আজিকার এই আসন্ন সন্ধ্যায় মৃত্যুর নব রূপ সে দেখিতে পাইল। মনে হইল যুগে যুগে এ জন্মমৃত্যুচক্র কোন বিশাল-আত্মা দেবশিল্পীর হাতে আবর্তিত হইতেছে—তিনি জানেন কোন্ জীবনের পর কোন্ অবস্থার জীবনে আসিতে হয়, কখনও বা সঙ্গতি, কখনও বা বৈষম্য—সবটা মিলিয়া অপূর্ব রসসৃষ্টি—বৃহত্তর জীবনসৃষ্টির আর্ট।' (অপরাজিত, পৃঃ ৪০৪)

চেতনাস্তরের এই নতুন dimension-এর কাছে এ জগৎ এবং ও জগৎ প্রায় একই সঙ্গে মেশামেশি করে আছে; কোন নির্দিষ্ট

সীমারেখা দিয়ে দুই জগতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটানো যায় না। বিশ্ব-চরাচরের বস্তুরূপ ও অধ্যাত্মরূপ একই সঙ্গে সত্য, বিভূতিভূষণের কাছে বেশী সত্য—অধ্যাত্মরূপটা। সেইটাই তাঁর কাছে 'প্রকৃত রূপ'। চেতনাস্তরের সেই dimension যাদের অনায়ত্ত, তারা শুধুমাত্র বস্তু-রূপে আবদ্ধ। নির্জনে বসলেই বিভূতিভূষণের মনে হয়, 'এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে, এর ফুলফল, আলোছায়ার মধ্যে জন্ম-গ্রহণ করার দরুণ এবং শৈশব হইতে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার দরুণ, এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না। এ আমাদের দর্শন ও শ্রবণগ্রাহ্য জিনিষে গড়া হইলেও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি রেণু যে অসীম জটিলতায় আচ্ছন্ন—যা কিনা মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত এ সত্যটা চোখে পড়ে না। (অপরাজিত, পৃঃ ৪০৩) *

'এই অদৃশ্য জগৎটায় মোহস্পর্শ' (অপরাজিত, পৃঃ ২৮৭) কিন্তু বিভূতিভূষণের কাছে অত্যন্ত সহজে এসে পৌঁছোয়। 'বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত' জগৎ এবং চেতনাস্তরের নতুন dimension—এই দুয়ের সংস্পর্শের কাহিনী অপু-কাহিনীতে সুরু হয়ে দৃষ্টিপ্রদীপ † ও

---

* 'অপরাজিত' লেখবার কালের সমসাময়িক ডায়রী 'তৃণাঙ্কুরে' রয়েছে : 'একটা কথা আজকাল নির্জনে বসে ভাবলেই বড মনে পড়ে। এই পৃথিবীর একটা spiritual nature আছে, আমরা এর গাছপালা, ফুলফল,, আলোছায়া, আকাশ-বাতাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেচি বলে, শৈশব থেকে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলে, এর প্রকৃত রূপটি ধরা আমাদের পক্ষে বড কঠিন হযে পড়ে। এই অপূর্ব সৃষ্টি যে আমাদের দর্শন ও শ্রবণ-গ্রাহ্য বস্তুসমূহ দ্বারা গঠিত হয়েও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি অনু যে অসীম সম্ভাব্যতায় ভরা, মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত এক জটিলতায় আচ্ছন্ন, তা হঠাৎ ধরা পড়ে না।' (পৃঃ ৩)

† 'দৃষ্টিপ্রদীপে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মাধ্যমে ভাবী ঘটনার ছায়াপাত হোতো। এই জাতীয় কাহিনী রচনার প্রেরণা তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন? রবীন্দ্রনাথে অনুরূপ কিছু নেই। ডি এইচ. লরেন্সের 'The Rocking-Horse Winner'-এর নায়ক Paul অনুরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বলে ভাবী বিজেতা-অশ্বের, নাম জানতে পারত। অবশ্য এই বিষয়টি ছাড়া দুটি কাহিনীতে আর কোন মিল নেই। লরেন্সের গল্পের স্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা। এ যুগের স্বর্ণতৃষার অতি বাস্তব একটি সমস্যার বিপুল আবেগময় আলোড়নে পূর্বোক্ত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বিষয়টি সেখানে বরং গৌণ। সাহিত্যিক

আরণ্যকের মধ্য দিয়ে ইছামতী—দেবযান—কুশলপাহাড়ীতে প্রসারিত। আর কতগুলি গল্পও এই গতিরেখার উপর বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো।

বিভূতিভূষণে এই বিশেষ চেতনলোকের অভিজ্ঞতার কাহিনী কোথাও সূক্ষ্ম, কোথাও অত্যন্ত স্থূল । 'অপরাজিত' বা 'ইছামতী'-তে একটা সূক্ষ্ম অধ্যাত্মরূপকে ধরবার প্রচেষ্টা তাঁর আছে। 'আরণ্যকে'-র অতিলৌকিক ঘটনাটির বর্ণনা, দেবযান, কতগুলি অতিপ্রাকৃত গল্প * প্রভৃতির রূপায়ন অত্যন্ত স্থূল । রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে বিভূতিভূষণের এইখানে একটা পার্থক্য । স্থূল অর্থে যাকে আমরা অতিলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত বলে থাকি, তার ভিত্তিতে নিছক ভূতুড়ে কাহিনী রবীন্দ্রনাথ একটাও লেখেননি। বিভূতিভূষণ অসংখ্য লিখেছেন। এর মূলে রয়েছে বিভূতিভূষণের কিশোরসুলভ বিশ্বাস-প্রবণতা । বালকের মত সরল আস্থায় তিনি সব কিছুকে বিশ্বাস করেছেন। রবীন্দ্রনাথে আছে এক ধরণের পরিণত প্রজ্ঞা। বিভূতি-সাহিত্যের বহু স্থানে অপেক্ষাকৃত অপরিণত মনের আন্তরিক সারল্য অতি-প্রকট। তাতে সরলতার স্বাদ আছে, গভীরতার অভাব আছে ।

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের মুখে শুনেছি, বিভূতিভূষণ বলতেন যে তিনি দৃষ্টিপ্রদীপের প্রেরণা অংশত পেয়েছেন Dean Inge-র লেখা পড়ে। গৌরীবাবু বিভূতিবাবুর একাধিক বইয়ের প্রকাশক এবং তাঁর জীবৎকালের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। সুতরাং তাঁর কথার গুরুত্ব আছে। তাঁর উক্তির কিঞ্চিৎ সমর্থন বিভূতিবাবুর ডায়রী 'তৃণাঙ্কুরে' পেয়েছি: 'Dean Inge যাকে Joy of Life বলেচেন, তা আমি এই গত মাসটিতে প্রাণে প্রাণে অনুভব করেচি। সেরকম নিভৃত,শান্ত, শ্যামল মাঠ ও কালো-জল নদীতীর না হলে মনের আধ্যাত্মিক পুষ্টি কেমন করে হবে?…জীবনের সার্থকতা …জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে, বিশ্বের রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করবার আনন্দের মধ্যে, এই সব শান্ত সন্ধ্যায় বসে এই অসীম সৌন্দর্যকে উপভোগ করায়। …এরকম এক একটা সময় আসে যখন বিদ্যুৎচমকে অনেকখানি অন্ধকার রাস্তা একেবারে দেখতে পাওয়ার মত সারা জীবনের উদ্দেশ্য ও গভীরতা যেন এক মুহূর্তে জানতে পারা যায়। একে সকলে চিনতে পারে না, ধরতে পারে না।… শিমুল গাছের মাথাটার উপরকার আকাশটার দিকে চেয়ে দেখে নিয়ে বামে নতিডাঙ্গার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিতেই রক্ত-মেঘস্তূপ যেন যুগান্তের পর্বতশিখরের মত আকাশের নীল স্বপ্নপটে—তার ওপারে যেন জীবন পারের বেলাভূমি আনন্দ আবছায়ার মত সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার একটু একটু চোখে পড়ে।' (পৃঃ ১—২)

* 'ছোটগল্প' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ঐ সারল্যের পথেই বিভূতিভূষণ এসে উপস্থিত হয়েছেন তাঁর পারলৌকিক চিন্তা-প্রসঙ্গে। এখানেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিরাট ব্যবধান।

Astronomy-তে বিভূতিভূষণের বিশেষ আগ্রহ ছিল। পড়াশুনোও করতেন এ বিষয়ে। (দ্রষ্টব্য, 'তৃণাঙ্কুর' পৃঃ ৬২) নক্ষত্রলোকের দিকে তাকিয়ে তিনি সরল মনে বিশ্বাস করতেন, 'আকাশের অগণ্য তারায় তারায় কত দেবলোক, কত পৃথিবী, কত জগৎ—কত অগণিত প্রাণীকুল, কত দেবশিশু—' (তৃণাঙ্কুর, পৃঃ ৭১)। এটাকে তিনি চৈতন্যের প্রসার মনে করতেন। এই ব্যাপ্ত চৈতন্যের শেষ অঙ্কে তিনি একথাও ভাবতেন যে ঐ নক্ষত্রলোকে এককালে তিনি ছিলেন, এবং ভবিষ্যৎ কালে আবার থাকবেন। তাঁর চৈতন্য কি কি বিষয়ের মধ্যে দিয়ে ব্যাপকতা লাভ করে তার পরিচয় দানের সময় শেষ পর্বে বলছেন 'মৃত্যুপারের দেশ, মৃত্যুপারের বিরাট জীবনে'র কথা। (তৃণাঙ্কুর, পৃঃ ৭২)। নক্ষত্রলোকে, তাঁর ধারণা, বাস করে 'কত উচ্চস্তরের জীবকুল।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৮৩)। 'ওই দূর আকাশের নক্ষত্রটি—ওর মধ্যেও স্নেহ, প্রেম যদি না থাকে তবে ওর সার্থকতা কিছুই নয়।' (তৃণাঙ্কুর, পৃঃ ১০৬) তাঁরও 'অশান্ত প্রাণপাখী আর মানে না।' সে-ও জৈবিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি নিয়ে ঐ আলোকদেহী উচ্চ জীবকুলে মিশে যেতে চায়। সেখানে ইচ্ছাই সৃষ্টি, আলোকপক্ষ সেখানে যান। (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৩১)। আনন্দের মুহূর্তে পার্থিব দেহসত্তার বন্ধনকে অতিক্রম করে তাঁর কেবলই মনে হয়, 'আমি পৃথিবীর কেউ নই—আমি দেবতা—এই মুহূর্তে পাখা ছেড়ে এই মেঘভরা আকাশ চিরে ওপারে বহুদূরে কোথায় উড়ে যাবো।' (তৃণাঙ্কুর, পৃঃ ৭৪)

আকাশ চিরে উড়ে যাওয়ার প্রয়াস তাঁর বহু গ্রন্থেই আছে। কিন্তু সব চেয়ে চরম উত্তরণ তাঁর ঘটল 'দেবযানে'। তাঁর astro-

nomy-র আকাশলোকের সঙ্গে হিন্দু-সংস্কার-নির্দিষ্ট মৃত্যু-উত্তর জগতের বিশেষ ব্যবধান রইল না। সরল কিশোর-সুলভ বিশ্বাসে দুটো জগতকে তিনি এক করে মিশিয়ে নিলেন। তাঁর মনে বিজ্ঞান ও হিন্দু সংস্কারের দ্বন্দ্ব ছিল না। তিনি Max Planck-এর এই উক্তি সমর্থন করে গিয়েছেন, 'There can never be any real opposition between religion and scicnce; for one is the complement of the other.' (হে অরণ্য কথা কও, পৃঃ ৩২)

Quaint বিষয়ের প্রতি বরাবরই বিভূতিভূষণের একটা আগ্রহ ছিল। তিনি নিজেই একাধিক স্থানে তার উল্লেখ করে গিয়েছেন। তাঁর কর্তব্য কর্মের যে লিষ্ট তিনি তৃণাঙ্কুরে দিয়েছেন, তার অন্যতম হচ্ছে 'Quaint ধরণের লোকের সঙ্গে আলাপ।' (পৃঃ ৬২)। ঐ লিস্টেরই পঠিতব্যের তালিকায় আনাতোল ফ্রাঁসকে রেখেছেন; এবং কিছুটা পরে বলছেন, 'আনাতোল ফ্রাঁসের Procurator of Judea গল্পটি খেতে খেতে ওদের কাছে কর্লুম—রসের বৈচিত্র্য ও Quaintness হিসেবে।' (পৃঃ ৭০) তাঁর Quaint-প্রীতি কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তার সব চেয়ে বড় নমুনা'দেবযান'।

পথের পাঁচালী-অপরাজিতের সময় থেকেই বিভূতিভূষণের Spiritualism-এর প্রতি বিশ্বাস ও আগ্রহ ছিল। এবং এ বিষয়ে তিনি চর্চাও করতেন। 'তৃণাঙ্কুরে' পাই: 'অতুলবাবুর কাছে একটা Spiritual circle-এর ঠিকানা নিলুম।' (পৃঃ ৫৬) অথবা অন্যত্র: 'গোপাল হালদারের সঙ্গে Spiritualism নিয়ে সেখানে ঘোর তর্ক।' (পৃঃ ৬৩)। গোপাল হালদার মার্কস্‌পন্থী, অতএব তিনি যে Spiritualism-সম্পর্কিত বিতর্কে কোন পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন বোঝাই যায়। নিঃসন্দেহে বিভূতিভূষণ Spiritualism-এর স্বপক্ষে তর্ক চালিয়েছিলেন।

আত্মার ব্যাপ্তি-প্রয়াস রবীন্দ্রনাথেও স্পষ্ট। তিনিও নিজেকে স্থূল জৈবিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাননি। বৃহৎ পরিধির মধ্যে গিয়ে নিজেকে উপলব্ধি করা তাঁর আত্মার ধর্ম। কিন্তু এই ধর্ম আচরণে তাঁকে Spiritualism-এর আশ্রয় নিতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথে আত্ম-প্রসারণের উপায় পারলৌকিক নয়, বা স্থূল অর্থে যাকে আমরা অতিলৌকিক বলি তাও নয়। জন্মান্তর -সংস্কার তাঁর পথ নয়। জাগতিক বা নাক্ষত্রিক শূণ্যে অদৃশ্য জগতের অশরীরীদের সঞ্চরণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। 'মাষ্টারমশায়', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে' প্রভৃতি নাম স্মরণে রেখেও বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত কোন বিষয়ে কাহিনী লেখেননি। ববং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির একটা সংস্কার তাঁর আত্মব্যাপ্তির প্রয়াস-মুহূর্তেও হয়তো অবচেতনে সক্রিয় থাকত। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করতেন, তৃণগুচ্ছের মধ্যে তৃণ হিসেবেই একদিন তাঁর প্রাণসত্তা স্পন্দিত ছিল, পৃথিবীর তরলিত শৈশবের সেই সামুদ্রিক জঠরে একদিন তিনি লীন ছিলেন, সূর্যের প্রাণশক্তির মধ্যেই একদিন তাঁর আত্মা একটা তেজঃ-কণিকা হিসেবে বর্তমান ছিল। তৃণে, গুল্মে, সমুদ্রে, বসুন্ধরায়, সূর্যে—এবং বৃহৎ কালপরিধিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে বড় করে নিজেকে অনুভব করতে চান, কিন্তু তাঁর এই বিশেষ কল্পনাটি বৈজ্ঞানিক চেতনার একটি প্রচ্ছন্ন বৃন্তে বিধৃত।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনাসমৃদ্ধি বিভূতিভূষণে ছিল না, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমাদের বক্তব্য মাত্র সেইটুকু নয়। বিভূতিভূষণ বহুক্ষেত্রে কল্পনাকে পরিহার করে কাল্পনিকতাকে আশ্রয় করেছেন; সেই আতিশয্যের চড়া সুর বহু সময় convincing নয়। এখানে 'কল্পনা' ও 'কাল্পনিকতা' শব্দ দু'টি রাবীন্দ্রিক সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের

মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসঙ্গতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শত গুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প তাহারা সাহিত্যে প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে—কারণ, ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু।'

বিভূতিভূষণে এই আতিশয্য অনেক ক্ষেত্রে আছে। 'দেবযানে'র আত্মব্যাপ্তি সম্পর্কেও ঐ কথা বলা যায়, 'ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু।'

শৈশবে মানুষের মনের কাছে অনেক কিছু এসে দাঁড়ায়। মন তার তখন সেগুলিকে নিয়ে নতুন জাগে। সে মনের কাছে ঐ জেগে ওঠাটাই বড়, অবলম্বনটা বড় কথা নয়। তাই মনের তখন তার বাদ-বিচার নেই। তার জগতে তখন কল্পনা ও কাল্পনিকতায় সীমারেখা টানা নেই। কাল্পনিকতার জগৎ তখন প্রকাণ্ড, এবং তার কাছে মস্ত বড় সত্য। যত মনের বয়স হয় তত সে অভিজ্ঞতা ও চিন্তা দিয়ে কাল্পনিকতা-পূর্ণ সেই বিরাট ফানুসটা 'সুনির্দিষ্ট আকার-বদ্ধ' করে। সেই কল্পনা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনি সংযত। মনের এই balance যথার্থ কল্পনার পক্ষে অপরিহার্য। বিভূতিভূষণে অনেক সময় এটি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাঁর মনের একটা বড় অংশ চিরকালই শিশু থেকে গিয়েছিল। সেই শিশুটা কাল্পনিকতায় আনন্দ পেতো, তাই তিনি ওটা পূরো পরিহার করতে পারেননি। 'দেবযানে'র পরলোক-বার্তা ঐ কাল্পনিকতার একটি বড় উদাহরণ।

বিভূতিভূষণে এই অ-রাবীন্দ্রিক পরলোক-প্রীতি কোথা থেকে এল?

শৈশবের হিন্দু-সংস্কার তাঁর পরলোকচিন্তার প্রাথমিক উৎস। এটিকে তিনি লালন ও পুষ্ট করেছিলেন নানাবিধ চর্চায়। এই বিষয়টিকে

সাহিত্যে রূপ দেবার প্রেরণা কি তিনি পেয়েছিলেন ইংরেজ লেখিকা মারী করেলী-র কাছ থেকে ?

বিভূতিভূষণের যখন তরুণ বয়স, তখন মারী করেলী বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। মারী করেলীর মনের সঙ্গে বিভূতিভূষণের মনের অনেক সাদৃশ্যও আছে। মারী করেলী নাগরিক অর্থাসক্তি, কৃত্রিমতা, জটিলতা ও গতানুগতিক জীবনধারা বাদ দিয়ে শান্ত অনাড়ম্বর প্রকৃতির পক্ষপাতী। প্রকৃতি মারী করেলীর কাছে 'the divine goddess (God's Good Man. পৃঃ ১) এবং 'Mother Nature' (ঐ, পৃঃ ১৬১)। ছোটখাট প্রাকৃতিক ঘটনানিচয়ের মধ্যে নির্বাক আমন্ত্রণবাণী ('wordless invitation'। ঐ, পৃঃ ২৬) শুনতে পেয়ে তিনিও যেতে চান into the fair freedom of Nature (বিভূতিভূষণ যেতে চান 'মুক্তরূপা প্রকৃতির কোলে।)। আর সেখানে দাঁড়িয়ে নয়ন-মন অভিষিক্ত করে নিলে মানুষের অস্থির কর্মকাণ্ডকে মনে হয় অনাবশ্যক নিরর্থক ধৃষ্টতা (all the restless work of man seems an impertinence rather than a necessity.—The Secret Power. পৃঃ ৬৭)।

তিনিও প্রকৃতি-লালিত তরুরাজিকে নিধন করার বিরোধী। 'God's Good Man' গ্রন্থের নায়িকা বৃক্ষকে শুধু নিষ্ঠুর হত্যার হাত থেকে বাঁচায় না, উইল করে যায় ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য। "They shall never be touched in my lifetime,...I believe I'll put something in my last will and testament about them—something binding, you know! Something that will set up a block in the way of land agents. Such trees as these ought to stand as long as Nature will allow them." (—পৃঃ

১৫৮)। গাছও কৃতজ্ঞতাবোধে সাড়া দেয়ঃ The wind rustled softly through the boughs, which bent and swayed before her, as though the grand old trees said : 'Thanks to you, we live!' (পৃঃ ৩২১)। God's Good Man-এর নায়িকা ছিল জমির মালিক। সে প্রকৃতির সম্পদকে রক্ষা ক'রে গিয়েছিল। 'আরণ্যকে'র নায়ক ছিল জমিদাররের কর্মচারী। নিজে হাতে বৃক্ষছেদনের বেদনায় সে বিদ্ধ।

মারী করেলী মানুষের সেই রূপটা বড় করে দেখেছেন যা সততা ও সারল্যে শান্ত, আস্তিক-ভাবনায় স্থিতধী, প্রকৃতি-রসের রসিক, প্রেমের জগতে দেহোর্ধ্ব, একনিষ্ঠতায় আদর্শ।

একালের মানুষের সম্পর্কে মারী করেলীর খুব বড় একটা অভিযোগ ছিল যে তাদের কল্পনাশক্তি ও অনুভূতিশক্তি কমে যাচ্ছে। এ যুগে "all imagination, all poetry, all instinctive sense of the divine, is being subordinated to what we consider as Fact." (ঐ, পৃঃ ২৯৪)। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও এর প্রতিফলন ঘটেছেঃ 'Nowadays, the authors that are most praised go in for what they call 'realism',—and their realism is very unreal, and very nasty. For instance, this garden,—these lovely trees,—this dear old house—all these are real—but much too romantic for a modern writer. He would rather describe a dusthole and enumerate every potato paring in it. (ঐ, পৃঃ ১৩১) এর কারণ তিনি মনে করতেন কল্পনা শক্তির দৈন্য।* এই দৈন্যকে বরাবর

---

* **Philosophical Institution, Edinburgh-তে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার বিষয় ছিল—The Vanishing Gift। এই gift টি মানুষের imagination.**

তিনি মোচন করবার চেষ্টা করেছেন তাঁর সাহিত্যে—সৌন্দর্যসন্ধানী কল্পনার রথচালনার মাধ্যমে। সে-রথ পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের সন্ধানে অনেক সময় বল্‌গাহীন। তাঁর কল্পনা-রথের গতি শুধু এ জগতে সীমাবদ্ধ নয়—অন্য জগতেও তার গতি অবাধ। তাঁর রোমান্‌স্ শুধু এ জগৎকে নিয়ে নয়, পরজগৎকে নিয়েও। তাঁর Romance হচ্ছে 'of two worlds'.

বিভূতিভূষণেরও তাই। তাঁর বল্‌গাহীন রথও শুধু এ জগতেব পথে থেমে থাকতে চায় না, উত্তরলোকে তাঁর মানসযাত্রা।

বিভূতিভূষণ ও মারী করেলী উভয়েই সরল বিশ্বাসে পরলোকের আলোচনা করেছেন তাঁদের উপন্যাসে। পারলৌকিক সত্তাদের চেহারা, আচরণ, বাক্‌ভঙ্গী ইত্যাদির বর্ণনায় উভয়েব সাদৃশ্য আছে।

চেহারার প্রতিচ্ছায়া এঁকেছেন মারী কবেলী এইভাবে: "The cabin was filled with a pearly lustre like the vapour which sweeps across the hills in an early summer dawn—and in the centre of this as in an aureole stood a nobly proportioned figure, clad in gold-coloured garments fashioned after the early Greek models. Presumably this personage was human,—but never was a semblance of humanity so transfigured. The face and forms were those of a beautiful youth,—the eyes were deep and brilliant,—and the expression of the features was one of fine serenity and kindliness." (The Secret Power, পৃঃ ২২৩) 'দেবযান'-এর পরলোকবাসীরাও অনুরূপ জ্যোতির্বলয়িত আলোকসত্তা।

উভয়ের পরজগতে মুখ্য প্রেরণা প্রেমানুভূতি। আলোর গতির

পথে সেখানে সানন্দ যাত্রা! সৌন্দর্যের দ্যুতি সেখানকার প্রতিটি অনুতে, প্রতিটি প্রাণীতে।

বস্তুত, বিভূতিভূষণের 'দেবযান' পড়বার সময় মারী করেলীর বইয়ের (A Romance of Two Worlds প্রভৃতি) কথা মনে পড়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

॥ দুই ॥

॥ ইছামতী ও পদ্মা ॥

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভূতিভূষণের বড় সাদৃশ্য জীবনদৃষ্টির ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদ আনন্দবাদে বিশ্বাসী। তিনি জানেন পরম আনন্দসত্তা এ জীবনের উৎস। জীবনান্তের মোহানাও এক আনন্দসঙ্গম। সৃষ্টির উপর আনন্দসত্তার নিত্য স্পর্শ। তাই কোন ক্ষয়-ক্ষতিই বড় নয়। এমন কি মৃত্যুও নয়। মৃত্যু আর এক সুন্দর জগতের দ্বার উন্মোচন করে। সে তো মাতার এক স্তন থেকে স্তনান্তরে প্রয়াণ।

বিভূতিভূষণও এই দৃষ্টিতেই জগৎকে দেখেছেন। তাঁর গল্প উপন্যাস ডায়েরীর প্রতি ছত্রে এর অনুরণন। রবীন্দ্রনাথের মত বিভূতিভূষণও অসংখ্যবার তাঁর ডায়েরীতে 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' প্রভৃতি পংক্তি উদ্ধার করেছেন। 'তৃণাঙ্কুরে' (পৃঃ ৩৩) বলেছেন, "গুন গুন করে বানিয়ে গাইলুম, আপনিই মুখে এসে গেল :—'গভীর আনন্দরূপে দিলে দেখা এ জীবনে হে অজানা অনন্ত—'।" তাঁর মুখের এ ভাষা যে রবীন্দ্রনাথের, তা বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না।

তিনি জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি হতাশা-নিরাশাকে বড় একটা দেখেননি দেখেছেন জীবনব্যাপী আনন্দ-বিকিরণ। বিষাদ বলতে বুঝতেন রোমান্টিক-সুলভ "Emotional Sadness।" এটা Romantic Melancholy-র সগোত্র। তিনি ভাবতেন, 'emotional Sadness জীবনের একটা খুব বড় সম্পদ।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ১৮)। মরণোত্তর এক অতিসুন্দর জগৎ সম্পর্কেও তাঁর ধারণা কত প্রবল ছিল তার উদাহরণ

'দেবযান।' মৃত্যু শুধু এক আনন্দলোক থেকে আরো বড় এক আনন্দলোকে প্রয়াণের একটি দ্বার মাত্র।*

(দু'একজন সমালোচক হার্ডির সঙ্গে বিভূতিভূষণের সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। প্রকৃতিমুখিতায় ও আধুনিক সভ্যতার প্রতি বিরূপতায় উভয়ের কিছুটা সাধর্ম্য বর্তমান। কিন্তু তাঁদের গুরুতর পার্থক্য জীবনদৃষ্টিতে। বিভূতিভূষণ আনন্দবাদে বিশ্বাসী আর হার্ডি বিশ্বাসী এক ধরণের দুঃখবাদে। বিভূতিভূষণে জীবন, জগৎ ও প্রকৃতি এক সানন্দ সালোক স্বপ্নলীলা, হার্ডিতে দুজ্ঞের্য় এক অন্ধকার নিয়তির খেলা।)

উভয়ের সাদৃশ্য আরও আছে। বিভূতিভূষণের মতে, 'জীবনকে যারা দুঃখময় বলেচে, তারা জীবনের কিছুই জানে না, জগৎটাকে দুঃখময় মনে করা নাস্তিকতা। জগৎ হোল সেই আনন্দময়ের বিলাস বিভূতি।' (ইছামতী, পৃঃ ১৩)।

তবে দুঃখেরও মূল্য আছে, কারণ 'দুঃখকে বাদ দিয়ে জগতে সুখ নেই—প্রকৃত সুখের অবস্থা গভীর দুঃখের পরে···দুঃখের পূর্বের সুখ অগভীর, তরল খেলো হয়ে পড়ে—দুঃখের পর যে সুখ —তার নির্মল ধারায় আত্মার স্নানযাত্রা নিষ্পন্ন। (ইছামতী, পৃঃ ৩১২)। রবীন্দ্রনাথ জানেন যে তাঁর দীপকে না জ্বালালে আলো দেয় না, না পুড়লে ধূপ দেয় না সুরভি; তীব্র দহনের মধ্যেই হৃদয় আলোকে আশ্রয় পায়; 'প্রভাতের স্নিগ্ধতাকে মধ্যাহ্নতাপে দগ্ধ করিয়া তবেই সায়হ্নের লোকলোকান্তরব্যাপী বিরাম।' (শকুন্তলা, প্রাচীন সাহিত্য)।

রবীন্দ্রনাথের সীমা-অসীমের তত্ত্ব-ও বিভূতিভূষণ তাঁর নিজস্ব ধরনে গ্রহণ করেছিলেম। বিভূতিভূষণ বলেন, 'ভগবানের আসল তত্ত্ব শুধু স্বরূপে সীমাবদ্ধ নয়, স্বরূপ ও লীলাবিলাস দুটো মিলিয়ে

---

* মারী করেলী বলেন, "Your whole life is an interval of happiness between this world and the next." (The Secret Power. পৃঃ ১০৬)

ভগবৎ-তত্ত্ব। কোনটা ছেড়ে কোনটা পূর্ণ নয়। এই শিশু, এই নদীতীর সেই তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত জিনিষ। সে থেকে প্রথম নয় —সেই মহা-একের অংশ মাত্র।' (ইছামতী, পৃঃ ৩৫৮)।

তাই এ বিশ্বপ্রকৃতির সবকিছু ঐ কুমুদ ফুলটাও তাঁর মন্দির— 'তাকে (প্রকৃতিকে) ভালবেসে সেই প্রকৃতিরই সাহায্যে প্রকৃতির অন্তরাত্মা সেই মহান শক্তির কাছে পৌঁছতে হবে।' (ইছামতী, পৃঃ ৩৭৪)। আর রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে।...সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ঐ ফুল। সে চুপি চুপি আমাদের কানে এসে বলে,—আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন। আমি সেই সুন্দরের দূত, আমি সেই আনন্দময়ের খবর নিয়ে এসেছি।' (শ্রাবণসন্ধ্যা, শান্তিনিকেতন)

রবীন্দ্রনাথেরও একটা গভীর মন 'সহজ সরল' সুখের জন্য পিপাসিত; আধুনিক সভ্যতার জটিলতা, যান্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতায় ক্ষুব্ধ মানুষের সভ্যতার অন্তরে সরলতা প্রতিষ্ঠায় প্রত্যাশী। গ্রামের সরল একটি চাষীর কথা শোনবার পর তাঁর মনের ভাব এই রকমঃ 'এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভাল মনে হয়, তা এরা জানে না।' (ছিন্নপত্র, ৯৬ নং পত্র।)

শুধু শ্রদ্ধা জানিয়েই ক্ষান্ত নন রবীন্দ্রনাথ, সভ্যতার মর্মে ঐ সরলতার স্থান হওয়া যে একান্ত কাম্য, সে কথাটিও উল্লেখ করেছেনঃ 'যতক্ষণ না সভ্যতার মাঝখানে এই স্বচ্ছ সরলতার প্রতিষ্ঠা হয় ততক্ষণ সভ্যতা কখনই সম্পূর্ণ এবং সুন্দর হবে না। সরলতাই মানুষের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়— সে যেন গঙ্গার মত, তার মধ্যে স্নান করে সংসারের অনেক তাপ দূর হয়ে যায়।' (ঐ পত্র)। রবীন্দ্র মনোভাবের এই প্রবাহ বিভূতিমানসে অত্যন্ত স্পষ্ট। বিভূতিভূষণের বরং এই ঝোঁক আরও বেশী। যার ফলে বিভূতিভূষণের মন যতটা গ্রামীণ বা আরণ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে যতটা সভ্যতা-বিরূপ, রবীন্দ্রনাথের মন তা নয়। বিভূতিভূষণ উল্লাসের সঙ্গে তাঁর

আশার (এবং অন্য মানুষের আশঙ্কার) কথা বলেছেন যে অরণ্য একদিন গম্ভীর ব্যাপক পদক্ষেপে সভ্য লোকালয়কে লেহন করে নেবে এবং নিজের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করবে। এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথের মন বিভূতিভূষণের মত অতটা একপেশে নয়, ভার-সামঞ্জস্য সে মনের অনেক বেশী। তাই আধুনিক সভ্যতার 'তাপ' সত্ত্বেও সেদিক থেকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত। এর মধ্য দিয়েই পথ পরিষ্কার করে অগ্রসর হতে হবে তা তিনি জানতেন। ঐ চিঠিতে যেমন বলছেন, 'এখানকার মানুষের মধ্যে যে জিনিষটি আছে সে বড় অনাদরের নয়।' তেমনি আবার একথাও বলেছেন, 'তবু প্যারিসের সভ্যতা থেকে কত তফাৎ। সে এর চেয়ে কত কঠিন, কত উজ্জ্বল, কত সুগঠিত।'

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সভ্যতাকে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন, বিশ্লেষণ করে-ছিলেন; শৈশব-শিক্ষা থেকে মানবমনে প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ সরলতার প্রতিষ্ঠায় প্রয়াস ছিল তাঁর। বিভূতিভূষণ একে আয়ত্ত করতে চাননি, বিশ্লেষণ-বিমুখ তাঁর মন, সমাজে সারল্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে উদ্যমহীন। সরলতার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে সুখী তিনি। বিভূতিভূষণের ভাবনা বেশী নিজেকে নিয়ে; রবীন্দ্রনাথের—নিজেকে ও দশকে নিয়ে। বিভূতিভূষণ গ্রামীণ, ও এক সুরে বাঁধা তাঁর মন; স্বীয় জীবনের সরলীকরণে তাঁর সাফল্য অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথ নগর-সন্তান, ইয়োরোপের বিচিত্র জটিল সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাঁর যথেষ্ট, সরলীকরণের তৃষ্ণা ও প্রয়াস সত্ত্বেও তাঁর সাফল্য সীমিত। প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ সরলতার সান্নিধ্যে এলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়, "এই তো বেশ আছি; মায়ের কোলের মধ্যে সন্তান যেমন একটি উত্তাপ, একটা আরাম. একটা স্নেহ পায়, তেমনি এই পুরাতন প্রকৃতির কোল ঘেঁসিয়া বসিয়া একটা জীবনপূর্ণ আদরপূর্ণ মৃদু উত্তাপ চতুর্দিক হইতে আমার সর্বাঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। তবে এই ভাবে থাকিয়া গেলে ক্ষতি কী।" (মন, পঞ্চভূত)। কিন্তু ইচ্ছা করলেও ঐভাবে থাকতে পারেন না

রবীন্দ্রনাথ। কারণ, "সভ্যতার খাতিরে মানুষ মন নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়া অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এখন তুমি যদি তাহাকে ছাড়িতে চাও সে তোমাকে ছাড়ে না।" (মন)। রবীন্দ্রনাথে এই সভ্যতার-বাড়িয়েতোলা মন; সে মনে প্রাপ্ত ও কাম্যের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের ট্রাজেডি বর্তমান—যে ট্রাজেডির অস্তিত্ব আধুনিক মানুষের সকলের মধ্যেই অল্পাধিক উপস্থিত। বিভূতিভূষণের মন বেশ কিছুটা পরিমাণে প্রাথমিক (primeveal), মনের সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্যও তাই তাঁর সহজ-আয়ত্ত। আধুনিক মানুষের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব তাঁর সামান্য। তিনি প্রসন্ন, আত্মতৃপ্ত।

বিভূতিভূষণ রবীন্দ্র-সগোত্র, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিস্তার, গভীরতা, বৈচিত্র্য ও জটিলতা বিভূতিভূষণে নেই, রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথে বিভূতিভূষণের যাত্রা, কিন্তু রবীন্দ্র-সরণি বহু দুরধিগম্য অঞ্চলের গভীরে শাখা-প্রশাখায় বিসর্পিত, সেখানে নিজেকে প্রসারিত করার সাধ্য নিঃসন্দেহে বিভূতিভূষণে দীন।

একজন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে তুলনা করেছেন পদ্মার সঙ্গে। বিভূতিভূষণের প্রতিভার প্রতীক বলা যায় ইছামতীকে।

রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁর একটি পত্রে (ছিন্নপত্র, ১৪৬ নং পত্র) ইছামতী আর পদ্মাকে পাশাপাশি রেখে কয়েকটি কথা বলেছিলেন, সে-উক্তি বিভূতিভূষণ ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিতুলনার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। ইছামতীকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এ যেন একই কবিতার কয়েকটা লাইন।' বিভূতিভূষণও ঠিক তাই। রবীন্দ্রনাথের মনে হয় 'ছোট বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার।' বিভূতি-মানসের আত্মীয় মন যাঁদের, তাঁদেরও একথা মনে হবে বিভূতি-সাহিত্যের সান্নিধ্যে এলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতীক পদ্মা। 'পদ্মার মত বড় নদী এতই বড়ো যে সে যেন ঠিক মুখস্থ ক'রে নেওয়া যায় না।'

বিশেষ ঋতু-নির্ভর নদী ইছামতী—'বর্ষা-মাসের দ্বারা অক্ষরগোনা।'

বিভূতিমানসও প্রকৃতির বিশেষ আবহাওয়ায় জেগে ওঠে, তার বাইরে তাঁর প্রাণের স্ফুরণ হয় না। পদ্মা বর্ষায় হয়তো প্রবল, কিন্তু কোন ঋতুতেই সে স্তিমিত নয়।

'ইছামতী মানুষ-ঘেঁসা নদী ;·········সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী, স্নানের সময় মেয়েরা যে-সমস্ত গল্পগুজব নিয়ে আসে সেগুলি এই নদীটির হাস্যময় কলধ্বনির সঙ্গে এক সুরে মিলে যায়।' গ্রামের অন্তঃপুরের সঙ্গে বিভূতিভূষণের 'মাখামাখি সখিত্ব'। আর পদ্মাকে যত ভালই লাগুক, তাকে বেশ খানিকটা সমীহ করতে হয়।

ইছামতীর 'উপরে ঘনবর্ষার সমারোহের মধ্যে একটি চিঠি লিখতে ইচ্ছা করছে, মেঘলা গোধূলিতে নিরালা ঘরে মৃদুমন্দ স্বরে গল্প ক'রে যাবার মতো চিঠি।' বিভূতিভূষণের জগতে এলেও চিঠির মত ডায়রীর মত একান্ত ব্যক্তিগত একটা সুর মনে জাগে।

পদ্মার জগৎ যেন মৃদু সুরে ব্যক্তিগত আলাপের নয়। দু' একটা মুহূর্ত হয়তো তেমন থাকতে পারে; কিন্তু সে চিঠি নয়, ডায়রী নয়। মহাকাব্যের মত সে বিরাট দেশকালে পরিব্যাপ্ত, ব্যক্তিকে ছাপিয়ে উঠে সে প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত। এক হাতে হিমালয়, আর এক হাতে সমুদ্রকে ধারণ ক'রে বিপুল শক্তিতে সে মুখর। তার অতিকায় বক্ষঃপটে সুবৃহৎ আকাশের প্রতিফলন। ইছামতী যখন বর্ষায় পূর্ণা, রাত্রি যখন গ্রামকে করেছে দূর, ঘাটকে করেছে নির্জন, তখন হয়তো তার ছোট শান্ত বুকে এক ফালি আকাশের কয়েকটি নক্ষত্রের ছায়া পড়ে, সে-নক্ষত্রের সংখ্যা দীন, আলো ক্ষীণ। হয়তো তখন তার মৃদু জলস্রোতে সমুদ্রের ঈষৎ স্পর্শও লাগে, সারা দেহ কাঁপে, সারা প্রাণ তার ধন্য মানে, এর চেয়ে বড় সার্থকতা ধারণের সামর্থ্য নেই তার অঞ্জলিতে। এর চেয়ে বড় স্বপ্ন দেখবার দৃষ্টি নেই তার নয়নের।

লক্ষণীয়, ইছামতীর ঘরোয়া ভাব সত্ত্বেও প্রবলা পদ্মার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ প্রবলতর, পদ্মার প্রতি যেন তার রক্তের টান। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে সে আত্মীয়তার স্বাক্ষর বর্তমান। আর বিভূতিভূষণের যেন রক্ত-সম্পর্ক ইছামতীর সঙ্গে; গল্প, উপন্যাস, ডায়রীর ছত্রে ছত্রে সে আনন্দ-সম্পর্কের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। আর 'পদ্মা? সেও অপূর্ব সন্দেহ নেই। কিন্তু সে আদরে পালিতা ধনীবধূ, একগুঁয়ে, তেজস্বিনী, শক্তিশালিনী, যা খুশি করে, কেউ আটকাতে পারে না—সবাই ভয় করে চলে—খামখেয়ালী—রূপবতী—তবে মিষ্টি নয়—high-bred রূপ ও চালচলন। ঘরকন্না পাতিয়ে নিয়ে থাকবার পক্ষে তত উপযোগী নয়।' (তৃণাঙ্কুর, পৃষ্ঠ ৮৪)

এ অধ্যায়ের সুরুতে ছিল রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে বিভূতিভূষণের উক্তি। আর এ প্রসঙ্গের উপসংহার টানি বিভূতিভূষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি দিয়ে। 'পথের পাঁচালী'কে অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আধুনিক অনেক ভালো গল্প সম্বন্ধে আজও কোনো মত দিই নি—সেই অপরাধ হল নিবিড়—যথা বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি।' নিতান্তই কুঁড়েমি করেই কিছু বলি নি, সে ওজর আজকে বেমানান হবে। পথের পাঁচালির আখ্যানটাও অত্যন্ত দেশী। কিন্তু কাছের জিনিষেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। পথের পাঁচালি যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়। লেখার গুণ এই যে, নতুন জিনিষ ঝাপসা হয় নি, মনে হয় খুব খাঁটি, উঁচু দরের কথায় মন ভোলাবার জন্যে সস্তা দরের রাঙতার সাজ পরাবার চেষ্টা নেই। বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। এই বইখানিতে পেয়েছি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর থেকে শিক্ষা হয় নি কিছুই, দেখা হয়েছে অনেক যা পূর্বে এমন করে দেখি নি। এই গল্পে গাছপালা পথ-

ঘাট মেয়েপুরুষ সুখদুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েছে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিষ পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিষের মতো সে সুস্পষ্ট।' (রোমান্স্‌ প্রসঙ্গে, পরিচয়, বৈশাখ ১৩৪০)।

বিভূতিভূষণের সাহিত্য পড়তে গিয়ে ঐ 'খাঁটি' কথাটা বারবার মনে পড়ে। সরল আন্তরিকতা তাঁর বিশিষ্ট গুণ।

'প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো'-র রীতিটা বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সত্য। এই projection-এর জন্যেই তার প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার বাস্তব কাহিনীও একটা রোমান্সের রঙ পায়। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে ডাঃ সুকুমার সেনও একথা বলেছেন।*

রবীন্দ্রনাথ 'রোমান্স-প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন চারুচন্দ্র দত্তের 'কৃষ্ণরাও' সমালোচনা করতে গিয়ে। তখন তিনি বলেছিলেন যে তাঁর লিখিত আলোচনার ভূমিকা 'কৃষ্ণরাও' ও 'পথের পাঁচালী' উভয় গ্রন্থ সম্পর্কেই প্রায় প্রযোজ্য। 'কৃষ্ণ রাও গল্পের যে ভূমিকা সেইটেই অল্প কিছু বদল করে ঐ বইয়েরও (অর্থাৎ পথের পাঁচালীর) ভূমিকা করা যেতে পারে।' ভূমিকার বক্তব্য এই যে উভয় গ্রন্থেই মন রোমান্স-রাজ্যে গিয়ে বেশ খানিকটা ছুটির রস পায়।

কিন্তু দুই বইয়ের রোমান্সের স্বাদে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে—সে কথাটা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন নি। 'পথের পাঁচালী'-তে নিকট

---

* 'এই গল্পে (পুঁই মাচা) এবং পথের পাঁচালিতে বিভূতিবাবুর রসকল্পনার স্বকীয়তা পরিস্ফুট। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখি পশ্চিম ও মধ্য বাংলার ধ্বংসপথবাহী পল্লীজীবনের অবক্ষয়ক্রান্ত পরিবেশে দারিদ্র্য জর্জর মুমূর্ষু নরনারীর ক্রমবর্ধমান অভিভব। হিংস্র অরণ্য লতাগুল্মের বেড়াজালে পড়িয়া মানব জীবন যেন শুখাইয়া আসিতেছে। বোধহয় যেন জঙ্গলাকীর্ণ পোড়া ভিটার নিঃসঙ্গ বিভীষিকা মরণের ছায়া ফেলিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে বাকি বসতিগুলি দখল করিতে। এই ধ্বংস-পথযাত্রার ছবি বিভূতিবাবুর রচনায় রোমান্টিক দূরত্বের প্রজেকটরের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং বিভূতিভূষণের দৃষ্টি অভিজ্ঞতাবদ্ধ হইলেও বাস্তব নয়, রোমান্টিক।' সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৯৭

দেশকালকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েছে—স্মৃতির ফলকে ছবি দেখার মত; তাতে বিস্মৃতি মন থেকে অনেক কিছু হরণ করেছে কল্পনা অনেক কিছু পূরণ করেছে। চারুচন্দ্র দত্ত দূর দেশ কালকেই দেখেছেন 'কৃষ্ণরাও'-তে। তাকে দূরে প্রক্ষেপ করতে হয়নি, দূরে সে ছিলই। সেখানে 'তাঁর চোখে যা পড়ত সবইromance, কাব্যময়। পাঠককে সেই romance এর ভাগ দেবার ইচ্ছায়' তিনি গল্প লিখেছেন। (কৃষ্ণরাও, পৃঃ ৭৯)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্যাদর্শ

বিভূতিভূষণের সাহিত্যের খাসমহলে প্রবেশ করবার আগে তাঁর সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে তাঁর নিজের মুখ থেকেই কিছু শুনে নেওয়া ভাল। তাহলে ভিতর-মহলে আমাদের গতি অনেক সহজ হবে।

সাহিত্যের কতগুলি মৌলিক প্রশ্ন তাঁর মনেও জেগেছিল। অবশ্য এগুলি নিয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। একটিমাত্র প্রবন্ধ এবং ডায়েরীগুলিতে দু'একটি বিক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত উক্তি ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। ডায়েরীর মধ্যে তাঁর উপলব্ধির গভীর থেকে দু' একটি বাণী প্রকাশ পেয়েছে আকস্মিক বিদ্যুত-দীপ্তিতে। আর প্রবন্ধটিতে ('সাহিত্যের কথা') অনেকগুলি মূল প্রশ্নকে তিনি তুলেছেন, নিজে উত্তর দিয়েছেন। সে-উত্তর অতি সংক্ষিপ্ত ব'লে আফশোষ হ'তে পারে, কিন্তু আবার এই জন্যেই হয়তো তা অতিস্পষ্ট—কথার কুয়াসায় ধোঁয়াটে নয়।

বিভূতিভূষণ চাইতেন যে তাঁর সাহিত্য সর্বসাধারণে বুঝুক। কিন্তু এর জন্য তিনি তাঁর সাহিত্যিক মান-কে নিচের দিকে নামাবার পক্ষপাতী ছিলেন না, বরং শিক্ষা মারফৎ জনসাধারণকে উপর দিকে তুলতে চাইতেন। তিনি বলতেন, 'সাহিত্য ও শিল্পকে সর্বসাধারণের উপযুক্ত করে দাও—এই একটি আধুনিক ধুয়ার কোন মানে হয় না। এ কথার অর্থ তো এই যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রস অত্যন্ত ঘন, একে

খানিকটা জোলো করে দাও,—এর শিল্পের বুননীতে অত সূক্ষ্ম তন্তুর বদলে মোটা দড়ির ব্যবহার প্রচলিত কর। কারণ, তাহলে তখন শিক্ষা ও শক্তি নির্বিশেষে এ সাহিত্য যাবতীয় জনের হয়ে উঠবে, রসের মন্দিরে ভিড়ের আর কম্‌তি থাকবে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, এ রকম কোন আদেশের উপর যদি জোর দেওয়া হয়, তবে সাহিত্যের সর্বনাশ করা হবে, এবং যাদের দিকে চেয়ে সাহিত্যে এই ভুয়ো গণতন্ত্রের সুর আমদানীর জন্য আমরা এ করতে যাব, তাদেরও শেষ পর্যন্ত উপকার কিছু হবে না। রস-সাহিত্যের উপভোগ-সামর্থ্যের দিক দিয়ে যারা 'হরিজন', সাহিত্যকেও জোর করে 'হরিজন'-মার্কা করে তাদের স্তরে না নামিয়ে উক্তরূপে তথাকথিত 'হরিজন'দব আর্ট ও সংস্কৃতিগত শিক্ষার এমন সুযোগ ও সাহায্য দিতে হবে, যাতে করে তারা মনের দিক দিয়ে ক্রমশঃ উঠে আসতে পাবে, সূক্ষ্মতম রসের স্বাদ-গ্রহণে পারগ হয়।...সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, সাহিত্যের যে একটি স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে, এমন কিছু না করা যাতে তা একটুকু ক্ষুণ্ণ হয়, পরন্তু আমাদের সবাইকে তার উপযুক্ত হতে শিক্ষিত করা।'

সাহিত্যে প্রোপাগাণ্ডার স্থান সম্পর্কে তিনি মনে করতেন, আর্টের জাত নষ্ট না করে একটা বিশেষ সীমার মধ্যে থাকলে ক্ষতিব কিছু নেই। 'সমাজ-সংস্কারই হোক, দেশপ্রেমই হোক, অথবা অন্য কোন সমস্যাদি সম্বন্ধে মতবাদই হোক, সব কিছুরই প্রোপাগাণ্ডা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ সীমার ভেতরে থেকে করা যেতে পারে, যদি তা তারপরও সাহিত্যই থাকে, কোন প্রচার-বিভাগের বিশদ চিত্তাকর্ষক প্যাম্ফ্‌লেটের মতন না হয়ে ওঠে। সাহিত্য ও আর্টের জাত নষ্ট হয় তখনি, যখন এ অপরতর কোন উদ্দেশ্য সাধতে গিয়ে আপনার মূল সাধনা—অর্থাৎ সমসাময়িক সমস্যারও অতীত শাশ্বত

সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রেরণা থেকে বিচ্যুত হয়। মনে রাখতে হবে স্বধর্ম ত্যাগ করা ভয়াবহ—অনেক কিছুব মত এক্ষেত্রেও।'

সাহিত্যের বিষয়বস্তু কি হবে?

'দুঃখবেদনা, হাসিঅশ্রু, সমস্যা-বিজড়িত অপরূপ মানুষেব জীবন এবং জগৎ তার (অর্থাৎ সাহিত্যিকের) লেখার মালমসলা।'

অনেকের অভিযোগ তিনি শুনেছেন, 'আমাদের মত পরাধীন দরিদ্র দেশের সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে কথা-সাহিত্যের উপাদান তেমন মেলে না।' এই 'খাড়া-বড়ি-থোড়ে'র অভিযোগ তিনি মেনে নেন নি। তিনি বলেছেন, 'এসব কথা মাত্র আংশিকভাবে সত্য। বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক—বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগতগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যা-সকাল আকাশ-বাতাস, ফলফুল—বাঁশবনের, আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনে ফুলবিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখদুঃখকে রূপ দিতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে জীবন-সংযোগহীন সাহিত্যকে ধিক্কার দিয়েছেন: 'যে-সাহিত্য টবের ফুল—দেশের সত্যিকার মাটিতে শিকড় চালিয়ে যা রস-সঞ্চয় করছে না, দেশের লক্ষ লক্ষ মূক নরনারীর আশা-আকাঙ্খা দুঃখ-বেদনা যাতে বাণী খুঁজে পেল না, তা হয় রক্তহীন, পাণ্ডুর, থাইসিসের রোগীর মত জীবনের বরে বঞ্চিত, নয়তো সংসার-বিরাগী উর্ধ্ববাহু, মৌনী, যোগীব মত সাধারণ সাংসারিক জীবনাস্তে বাইরে অবস্থিত।'

অবাস্তব মিথ্যাশ্রয়ী সাহিত্যকে বলেছেন মূল্যহীন: 'মিথ্যাকে আশ্রয় করেও কথাসাহিত্যিক রসসৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু সে হয় মানুষকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়ে রাখবার সাহিত্য—সমাজের ও জীবনের সত্য

চিত্র হিসেবে তার মূল্য কিছু থাকে না।'

সত্যিকার সাহিত্যিক যিনি, 'চারিপাশের মানব-সমাজ সম্বন্ধে তিনি শুধু চিন্তা করেন এই নয়, এর অন্তরতম হৃদয়-স্পন্দনকে তিনি একান্তভাবে অনুভবের চেষ্টা পান।'

সাহিত্যিককে তাই উন্নাসিকের মত সাধারণ মানুষের গায়ের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চললে হবে না। 'গভীর রহস্যময় এই মানব-জীবন। এর সকল বাস্তবতাকে এক বহুবিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ দেওয়ার ভার নিতে হবে কথাশিল্পীকে। তাকে বাস করতে হবে সেখানে, মানুষের হট্টগোল, কলকোলাহল যেখানে বেশী, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের সুখদুঃখকে বুঝতে হবে।' আর এর জন্যে লেখকদের চাই কেবল 'মানুষের প্রতি সহানুভূতি, তাকে বুঝবার ধৈর্য।'

কিন্তু 'মানুষের হট্টগোল'-এর মধ্যে বাস করলেও সাহিত্য-সৃষ্টির কার্যটি মানসিক, লেখক সেখানে একক, নিঃসঙ্গ, হাটের মাঝে দাঁড়িয়ে করবার নয় এ কাজ। 'সাহিত্য যদিও সর্বসাধারণের মধ্যে আন্তরিকতম মিলনের যোগসূত্রস্বরূপ, এবং যদিও চারিপাশের মানুষকে বাদ দিয়ে এখানে কোন সৃষ্টি সার্থক হওয়া দূরে থাক প্রায় সম্ভবই নয়,—তবুও সাহিত্য-সৃষ্টি লোকালয়ের হাটের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে করবার নয়।'

'সুতরাং সকলেরই সঙ্গে আপনাকে নিরন্তর যুক্ত রেখে তার সাধনা। তবুও, মনের দিক দিয়ে তার পক্ষে চরম একাকীত্ব একটি প্রকাণ্ড সত্য—অপরিহার্য এবং প্রয়োজনীয়ও। 'রিয়্যালিটি'কে বুঝতে হলে, বা বুঝে তাকে যথাযথ আঁকতে হলে তাতে জড়িয়ে গিয়ে আমরা তা পারি না—কর্মকোলাহলের ঠিক মাঝখানে অথবা লোকলোচনের অত্যন্ত স্পষ্ট পাদপ্রদীপের সামনে অনুক্ষণ থেকে আমরা তা পারি না।'

লেখক লেখেন কার জন্যে?

'কবি সাহিত্যিক আপনার জন্য লেখেন, সে হচ্ছে তার আত্ম-

প্রকাশ, অস্তিত্বের সেই একমাত্র রূপের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সকলেরই জন্য লেখেন।'

সাহিত্য-পাঠে পাঠকের কি লাভ?

সাহিত্য পাঠকের 'আত্মসত্তার...বিস্তারের সম্ভাবনা'-কে 'অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে সহায়তা করে', স্বপ্নপ্রবণতার তৃপ্তি ঘটায়, কৌতূহল চরিতার্থ করে এবং শক্তি যোগায়।

'প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কম-বেশী পরিমাণে একটি মানুষ আছে, যে নাকি স্বপ্ন দেখে, যে নাকি অন্ততঃ কোন কোন ক্ষণের জন্যও আদর্শবাদের তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, যে অতীত স্মৃতির অনুধ্যানে সহসা উন্মনা হয়, ভবিষ্যতের কল্পনায় নেশার মতন হয় আসক্ত, রস-সাহিত্যের একটি প্রধানতম কাজ হচ্ছে, প্রত্যেকের ভেতরকার এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিবিধান করা। তা ছাড়া,—কথা সাহিত্যিক সমসাময়িক সমাজ বা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ-কালান্তরিত জীবনের ছবি আঁকেন। তাতে করে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে মানুষটি তার নিজ যুগের মানুষ আর ঘটনাবলী সম্বন্ধে খুব উৎসুক তার কৌতূহল মেটে। সাহিত্য আমাদের কল্পনা ও অনুভববৃত্তিকে উজ্জীবিত করে। এর মননশীল দিক প্রধানতঃ জীবন-সংগ্রামে ও সভ্যতার সংগঠনে আমাদের শক্তি যোগায়।'

গভীর রহস্যময় মানবজীবনের বাস্তবতাকে তিনি সাহিত্যের উপজীব্য মনে করতেন। তাঁর কাছে এই বাস্তবতার সংজ্ঞা কি, তা তিনি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন, আগেই তা উদ্ধৃত করেছি আমরা। এই সংজ্ঞাকে তিনি আবার খানিকটা সীমাবদ্ধও করেছেন —নগ্ন চিত্র বা করাল চিত্রকে তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বীকার

করতে পারেন নি। 'ফ্লবেয়ার বলেছে, মানুষে যা করে, যা কিছু ভাবে, সবই সাহিত্যের উপাদান, তাই তাকে লিখতে হবে, শোভনতার খাতিরে তিনি যদি জীবনের কোন ঘটনাকে বাদ দেন, চরিত্রের কোন দিক ঢেকে রেখে অঙ্কিত চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত বা শ্রেষ্ঠ করবার চেষ্টা করেন—ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 'এমা বোভারি'-র স্রষ্টার উপযুক্ত কথা বটে! কিন্তু এই বাস্তবতার কি একটা সীমা নেই? জীবনের নগ্ন চিত্র—দিগ্বসনা ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবীর মত করাল—সে চিত্র মানুষের মনে ভয় সঞ্চার করে, অবসাদ আনে, জুগুপ্সার উদ্রেক করে—সাধারণ রসবিলাসী পাঠকের সাধ্য নয় সে কঠিন নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হওয়া। সূর্যের অনাবৃত তাপ পৃথিবীর মানুষে সহ্য করতে পারে না, তাই বহু মাইলব্যাপী বায়ুমণ্ডলের আবরণের মধ্য দিয়ে তা পরিস্রুত হয়ে, মোলায়েম হয়ে তবে আমাদের গৃহ-অঙ্গনে পতিত হয় বলে রৌদ্র আমাদের উপভোগ্য, প্রাণীকুলের উপজীব্য। সে আবরণ দেবেন শিল্পী তাঁর রচনায়। নির্বাচনের স্বাধীনতা তিনি ব্যবহার করবেন শিল্পীর সংযম ও দৃষ্টি নিয়ে।'

তিনি স্বীকার করেছেন, 'সঙ্কীর্ণ অর্থে নৈতিকতার মানদণ্ড সাহিত্যের প্রতি প্রয়োগ করা যায় না অবশ্য…।' কিন্তু 'কি জীবনে কি সাহিত্যে—শক্তি ও প্রতিভার সঙ্গে প্রেম ও সত্যবুদ্ধি যুক্ত না হলে স্থায়ী কিছুর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সমাজের প্রচলিত নীতি-প্রথাকে সাহিত্যিক নির্মম আঘাত করতে পারেন, কিন্তু শুধু সত্যের জন্যই পারেন, ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য নয়। সাহিত্যিক বাস্তব জগতের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তার চিত্র আঁকবেন। কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যথেষ্ট পরিষ্কার হলে তিনি দেখবেন যে বাইরের জগতে যা ঘটে, তার চেয়ে লেখকের মনের জগতে আর এক মহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তব আছে; এবং, যদিও মানুষের জীবন এত বিচিত্র ও মোহনীয়রূপে জটিল, কারণ পাপ দুর্বলতা পদস্খলনের কাহিনী তার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবুও

সে যেখানে বড়, সেখানে তার রূপ কেবলএ ই-ই নয়। তাছাড়া, বৃহত্তর অর্থে নীতিবোধ, জীবন ও সমাজের মূল সত্তার সঙ্গে জড়িত; সাহিত্য থেকে তাকে কি আমরা বিচ্ছিন্ন করতে পারি!'

এই উদ্ধৃতির একটি লক্ষণীয় লাইন হচ্ছেঃ 'বাইরের জগতে যা ঘটে, তার চেয়ে লেখকের মনের জগতে আর এক বৃহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তব আছে।' এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যেই তাঁর সাহিত্যে 'বাইরের জগতে'র বাস্তবতা যেমন বিশদভাবেই আছে, তেমনি তাতে মনের রং-ও কম লাগে নি। কারণ মনের জগতের বাস্তবকে তিনি মহত্তর ব্যঞ্জনাময় মনে করতেন। এই মনের জগতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বলেই 'জীবনের নগ্ন চিত্র' বা 'দিগ্বসনা ভীমা ভঙ্করী ভৈরবীর মত করাল' বাস্তবকে তিনি এড়িয়ে গেছেন, প্রকৃতির রুদ্র মূর্ত্তিকে তিনি দেখতে চাননি। জীবনে বোধ হয় একটিও 'ভিলেন' তিনি আঁকেননি। চরিত্র স্থষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি একদেশদর্শী।

'নিরাসক্ত আনন্দে' স্থষ্টি করা সাহিত্যিকের কর্তব্য, তিনি বলেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের সাহিত্যের মধ্যেই তাঁর নিজের আসক্তির ছাপ পড়েছে। সাহিত্যস্থষ্টির ক্ষেত্রে তিনি detached নন। নগ্ন ও করাল বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফেরাতে গিয়ে মানুষের জীবন-সংগ্রামের দিক থেকেও তাঁর চোখ যেন অনেকটা সরে গিয়েছে; অথচ তিনি নিজেই মনে করতেন যে সাহিত্যের 'মননশীল দিক প্রধানতঃ জীবন-সংগ্রামে ও সভ্যতার সংগঠনে আমাদের শক্তি যোগায়।' উপন্যাস ও গল্পকে তিনি কি 'মননশীল' সাহিত্য মনে করতেন না? 'মননশীল' সাহিত্য ও 'রস-সাহিত্য'-কে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দুটি শ্রেণী হিসাবে দেখবার ফলেই কি এমনটা ঘটেছে? যাই হোক, জীবন-সংগ্রামে ব্যর্থ মানুষের জন্য তিনি অনেক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, কেঁদেছেন, কিন্তু 'জীবনসংগ্রামে ও সভ্যতার সংগঠনে আমাদের শক্তি যোগায়' যে সাহিত্য তা রচনা করবার দিকে তত ঝোঁকেননি।

'নির্বাচনের স্বাধীনতা' তাঁকে মাধুর্যের ও কারুণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে।

'মনের জগত' ও 'বাইরের জগত'-এর দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে একেবারে ছিল না তা নয়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে 'মনের জগত'-এর উপর সমস্তটা ওজন রাখার দিকে ঝোঁক ছিল তাঁর সচেতন মনে। তিনি বলেছেন, 'সাহিত্য শিল্পীদের জীবনের প্রতিবিম্ব।' কিন্তু এই সঙ্গে সাহিত্যকে তিনি জীবনের প্রতিবিম্ব বলেননি। তিনি উক্তিটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'প্রত্যেক লোকই তার নিজের অনুভূতি লেখবার অধিকারী। ফুল, ফল, লতা, পাখী, সমুদ্র, মা-বাপ, ছেলে মেয়ে সব আছেই—আমি তাদের কি রকম দেখলাম সেইটাই আসল কথা। জীবনটাকে আমি কি রকম পেলাম, সেইটাই সকলে জানতে চায়।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪১)। 'কি রকম দেখলাম' এটাই তাঁর কাছে আসল, 'কি দেখলাম'-এর ঠাঁই নেই। অবশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে 'কি রকম দেখলাম'-কে একেবারে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, যত বস্তুনিষ্ঠ রচনাই হোক না কেন, তার মধ্যে সূক্ষ্ম বা প্রচ্ছন্নভাবে সেটা থাকে, কিন্তু এটাই যখন সব হয়ে দাঁড়ায়, তখন সাহিত্য 'নিজের অনুভূতি'র মধ্যে বন্দী হ'য়ে আত্মমুখিতার আতিশয্যে আক্রান্ত হয়।

'সাহিত্য শুধু জগতটাকে কে কি চোখে দেখেছে তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪১)। বিভূতিভূষণ এই কথা বলেছেন উপরের উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। কিন্তু কি চোখে দেখেছে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী মাত্রই সাহিত্য নয়, সামাজিক মনের 'সহিত-ত্ব' পেতে হবে তাকে, রসানুভূতি জাগাতে হবে পাঠকের মনে। অভিজ্ঞতা যদি একান্তই 'ব্যক্তিগত' হয়ে নিজের অনুভূতি-র চার দেওয়ালের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে, তবে তা সামাজিক মনে বিশেষ আবেদন জাগাতে পারে না।

এমন কি চরিত্রের ক্ষেত্রেও তিনি মনে করেন, 'বর্ণিত নায়ক-নায়িকার পিছনে শিল্পী তার আবাল্য-দীর্ঘ জীবনের সকল সুখদুঃখ, হাসিকান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। কল্পনাও কিছু না কিছু অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে তবে শূন্যে ভর করে—যেমন সনেটের পিছনে তেমনি হ্যামলেটের পিছনে সেকস্‌পিয়র গুপ্ত থেকেও ধরা দিয়েছেন।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪১)।

সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিপ্রক্ষেপ থাকে ঠিকই, কিন্তু তার মাত্রাধিক্য উপন্যাস বা নাটকের গুণ নয়। হ্যামলেটে শেকস্‌পীয়রের ব্যক্তি-প্রক্ষেপ কতখানি হয়েছে বিতর্কের বিষয়, কিন্তু একথা সর্বজনজ্ঞাত যে শেকসপীয়রের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব বিভিন্ন ধরণের চরিত্রের যথাযথ রূপায়ন; হাজার চরিত্র সেখানে ঠিক হাজারটা আলাদা মানুষের মতই এসেছে। নাম মুছে দিলেও পরস্পর গুলিয়ে-মিশিয়ে যাবার আশঙ্কা নেই। সে আশঙ্কা আছে বিভূতি-ভূষণের সাহিত্যে। তাঁর নায়করা নামেই আলাদা—সকল নামের অন্তরালে একটিমাত্র মানুষের পদধ্বনি নিঃসংশয়িতভাবে শোনা যায়—সেই মানুষটির নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। *

* এই অধ্যায়ের উদ্ধৃতিগুলি বিভূতিভূষণের 'সাহিত্যের কথা' প্রবন্ধ থেকে সংকলিত। তিনটি উদ্ধৃতি আছে 'স্মৃতির রেখা' থেকে—সেগুলি যথাস্থানে উল্লেখ করা আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্পীমানস

॥ এক ॥

॥ নির্জন দেশপ্রেমিক ॥

বিভূতিভূষণ তাঁর কালের নির্জনতম ঔপন্যাসিক। 'নির্জন' শব্দটা জীবনানন্দের সঙ্গে বড় জড়িয়ে গেছে। শব্দটা দেখলেই এখন জীবনানন্দকে মনে পড়ে। এই একচেটে বিশেষণটা থেকে জীবনানন্দের একাধিপত্য যদি খর্ব হয়, তবে তার জন্যে দুঃখ করবার দরকার নেই। বিভূতিভূষণের সমসাময়িক ঔপন্যাসিকরা যখন জীবনের কোলাহলে মুখর, তখন তিনি সেই সাহিত্যসভার একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে একটি স্নিগ্ধ নিভৃত সুরের আলাপ করেছেন।

গ্রাম-বাংলাকে দেহ-মনের যুক্ত অঞ্জলিতে গ্রহণ কবেছিলেন বিভূতিভূষণ। ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে দেখেছিলেন তার রূপ, বরণ করে মনের ঘরে তুলেছিলেন, সাহিত্যের সভায় গেয়েছিলেন তার গান। এইখানেই তাঁর দেশ-প্রেমিকতা। দেশকে তিনি 'মা, মা' বলে উচ্চকণ্ঠে ডাকেন নি, তার সঙ্গে মিশে ছিলেন তিনি।

তাঁর প্রেমিকতা সরবে ঘোষিত নয়, কর্মে সক্রিয় নয়, অনুভূতিতে মাত্র সজীব। মৃদু কলভাষে বাংলার মাটীর এমন জয়গান আর কোন ঔপন্যাসিক করেন নি। তার লতাপাতা, গাছপালা, ঐ যে মাটীর সোঁদা গন্ধটুকু, কিছুই তাঁর কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় নয়, অবান্তর নয়। এখানকার ধূলোমাটি গায়ে মেখে তাঁর তৃপ্তি। তাঁর সাহিত্যের পাতায় পাতায় সেই ধূলোমাটির শ্যামলতা, সেই তৃপ্তির রোমন্থন।

শুধু এই গ্রাম-বাংলা নয়, 'অপরাজিত' 'আরণ্যক' প্রভৃতিতে

এই পটভূমি আরো বিস্তৃত। অরণ্য-ভারত তার পরিধি-ভুক্ত। বাংলার সাহিত্য নতুন দিগন্ত লাভ করল বিভূতিভূষণের হাতে। শেষ গ্রন্থ 'কুশল পাহাড়ী' পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যে অগণ্য আরণ্যের পদধ্বনি।

এই বিস্তার তাঁর হৃদয়ের প্রসারেরই স্বাক্ষর বহন করছে। শিক্ষিত-সুলভ অভিমানে তিনি এদের পিঠ চাপড়ান নি, উপদেশ-বৃষ্টি করেন নি। এদের অন্তরের ঐশ্বর্যকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন আন্তরিক প্রীতি দিয়ে, এবং সৌভাগ্যের কথা, তিনি ব্যর্থ হন নি। অরণ্যের সৌন্দর্য ও অরণ্যমানবের সৌন্দয তাঁর অনুসন্ধেয়, তাঁর আনন্দ। বর্ত্তমান সভ্যতার থাবা যেখানে এই সৌন্দর্যকে করেছে ক্ষত-লাঞ্ছিত, সেখানে তিনি আর্ত হাহাকারে বলে উঠেছেন, 'ন হন্তব্যো, ন হন্তবঃ'। এই আঘাত তাঁকে সময় সময় এত বিচলিত করেছে যে তিনি সমগ্র সভ্যতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চেয়েছেন—বিশেষত শিল্প-সভ্যতার দিক থেকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য-কলা যে-সভ্যতা দান করেছে তাকে তিনি চান, কিন্তু যে সভ্যতা মাটিকে দিয়েছে নোংরা ঘিঞ্জি বস্তী, আকাশকে করেছে চিমনীর ধোঁয়ায় কালো, আর মানুষকে অন্তর-বাহিরের সবল সং সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে কুরূপ, তার প্রতি তাঁর মানসিক বিরূপতা সীমাহীন। এই বিরূপতা তাঁর এত বেশী যে তিনি আশা করেছেন, একদিন অরণ্য তার আজকের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে সভ্যতার ওপর।

'মানুষ প্রকৃতির এই মুক্ত সৌন্দর্যকে ধ্বংস করিতেছে সত্য, গাছপালাকে দূর করিয়া দিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি একদিন প্রতিশোধ লইবে। ট্রপিক্স্-এর অরণ্য আবার জাগিবে, মানুষকে তাহারা তাড়াইবে, আদিম অরণ্যানী আবার ফিরিবে। ধরা-বিদ্রাবণকারী সভ্যতাদর্পী মানুষ যে স্থানে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, পর্বতমালার নাম দিয়াছে নিজের দেশের রাজার নামে, হ্রদের নাম দিয়াছে রাজমন্ত্রীর নামে; ওর শুশুক, পাখী, শিল, বগলা হরিণ, ভালুককে খুন করিয়াছে তেল, বসা, চামড়ার লোভে,

ওর মহিমময় পাইন অরণ্য ধূলিসাৎ করিয়া কাঠের কারখানা খুলিয়াছে, এ সবের প্রতিশোধ একদিন আসিবে।' (অপরাজিত, পৃঃ ৩১৩)।

অতিরিক্ত লোভ নিশ্চয়ই অকাম্য। কিন্তু সভ্যতার রথ একদম তেল-বসা-চামড়া-কাঠ ছাড়া কি করে চলবে! সে-চিন্তা বিভূতিভূষণ করতে চান না, সভ্যতাকে তার সৌন্দর্যগ্রাসী ভয়াবহতা থেকে মুক্ত করে সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিণীত কি ভাবে করা যায়, সে সম্পর্কে তিনি মাথা ঘামাতে চান না। সৌন্দর্যপ্রাণ লেখক সৌন্দর্যের বিন্দুমাত্র লোকসান দেখলেই ভাবাবেগে এত বিচলিত হন যে তখন যুক্তিচালিত চিন্তা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

শুধু ঐ বিশেষ মুহূর্তগুলিতেই নয়, কোন সময়েই তিনি মনন-বিশ্লেষণে আগ্রহী নন। কারণ তাঁর মতে বিস্ময়টা 'mother of philosophy' নয়, বিস্ময়ই ফিলসফি, বাকীটা তার অর্থসঙ্গতি মাত্র। ('অপবাজিত' দ্রষ্টব্য)। তিনি কোন ঘটনারই অর্থসঙ্গতি করতে চান না চিন্তাজগতে, তিনি শুধু বিস্ময়রসকে আকণ্ঠ পান করতে চান। আর সে পান-উপভোগে বাধা পড়লেই তিনি শিশুর মত অযৌক্তিক বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। আর বিভূতিভূষণের অভিশাপ-বাণী উচ্চারণের ভঙ্গি দেখে মনে হয় যে আগামী সভ্যতা-অরণ্য সংঘর্ষে অরণ্য সভ্যতাকে সমুচিত শাস্তি দিলেও বিভূতিভূষণকে সে রেহাই দেবে যেন, সে জানে যে বিভূতিভূষণ অরণ্যকে ভালবাসেন। যত অনুরাগই তাঁর অরণ্যের প্রতি থাক, উক্ত সংঘাতে যে তিনি মানব-সভ্যতার স্বপক্ষে নিয়তি-নির্দিষ্ট, তা ভুলে যান বিভূতিভূষণ। আর সৌন্দর্যগ্রাসী মানবসভ্যতাকে শাসাতে থাকেন এই বলে যে অরণ্যের শক্তি "বিপুল, বিশাল, বিরাট। অসীম ধৈর্যের ও গাম্ভীর্যের সহিত সে সংহত শক্তিতে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, কারণ সে জানে তাহার নিজ শক্তির বিপুলতা।...ঐ শক্তিটা ধীরভাবে শুধু সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র।" (অপরাজিত, পৃঃ ৩১৪)।

অবশ্য এ থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয় যে মানবপ্রীতি তাঁর ছিল না। সভ্যতার বলদর্পী নিষ্ঠুর, লোভী, সৌন্দর্য-সংহারক মূর্তিকে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন। মানুষের জটিলতা, লোভ, উচ্চাশা, নির্মমতার প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক বিরাগ। ভালবাসতেন তিনি গ্রামীণ ও আরণ্য মানুষ, যারা মনে-মুখে এক, জীবন-আচরণে সৎ ও সরল, মনোজীবনে ভাবুক। তাঁর সাহিত্যে এদেরই জয়গান। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিজগৎ শুধু গাছ-পাখী-মাটি নিযে নয়, এই মানুষরাও তার অংশ। মানুষ তাঁর প্রকৃতি জগৎ থেকে নির্বাসিত নয়, জৈব-সূত্রে যুক্ত। তার মানুষ শ্যামল-সুন্দর প্রকৃতি-পরিবারের অন্যতম সদস্য।

দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি এই প্রীতির জন্যই তাকে বলেছি 'দেশপ্রেমিক'। শব্দটা অতি ব্যবহৃত, কিন্তু এখানে ব্যবহারটা ধরা-বাঁধা অর্থে নয়, তা আগেব আলোচনায় স্পষ্ট। তবু এ শব্দটি গ্রহণের কারণ আছে। কেউ কেউ মনে করেন, বিভূতিভূষণে দেশপ্রেম অনুপস্থিত; কারণ হয়ত তার রাজনৈতিক সাহিত্যের অভাব। এই ভুল ধারণার বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত থাক 'দেশপ্রেমিক' শব্দটি। তবে তাঁর ভালবাসা ভাবুকের ভালবাসা, কর্মবীর বা চিন্তাবীরের ভালবাসা নয়। তাঁর প্রেম নিষ্ক্রিয়, সক্রিয়তায় উব্বুদ্ধ নয়। তিনি দেশের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না—কোন সমস্যাতেই বিশেষ মাথা দিতেন না। প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেন নি, দেশ-সমস্যার আলোচনা করে উপন্যাস লেখেন নি। তবু আমরা যেন ভুলে না যাই যে অতি-সাধারণ মানুষ যা ছিল আমাদের আশেপাশে অথচ চোখ এড়িয়ে যাচ্ছিল, এই দেশেরই অতি-সাধারণ সৌন্দর্য, যা ছিল আমাদের দাওয়ার পাশে অবহেলিত, তাদের স্বীকৃতি দান করেছিলেন তিনি।

মানুষের জীবনসংগ্রামের সক্রিয় রূপ তাঁর চোখে পড়ে নি। তিনি দেখেছেন মানুষের সততা সরলতা; এইটে তাঁর মনের

তারে সুর তুলেছে, একেই তিনি বড় করে বাজিয়েছেন।

তাঁর মনে কোন রকমের রৌদ্র সুরই বাজত না। তাঁর সাহিত্যে শিব ধ্যানস্থ ও তন্ময়, প্রলয়-নৃত্যশিল্পী নয়। এইখানে তাঁর সীমাবদ্ধতা। মনের সঙ্গে সুর-মেলানো জগৎ তাঁর। বহু আছে তাতে, বিচিত্র নেই। বৈচিত্রের অসম সুরের সাধনা তাঁর নয়, বহুর সুর সাম্য তাঁর কাম্য ও আয়ত্তাধীন, সুরের এই এককতায় তিনি আত্মহারা এবং সীমিত, আত্মস্থ ও নির্জন।*

যদিও তিনি বলেছেন, 'এই যুগে জন্মে আমি সকল রকম বিচিত্র জীবন-ধারার অভিজ্ঞতা চয়ন করে তার কাহিনী লিখে রেখে যাব।" (স্মৃতির রেখা, পৃ ৪১), কিন্তু তাঁর সাহিত্য-সাক্ষ্যে বলা যায় যে যুগের বিচিত্র জীবনধারার সাধনা তিনি করেন নি। তিনি এর পরের পাতাতেই (পৃঃ ৪২) বলছেন, 'আমি সেই জগতে ডুবে থাকত চাই—সেটা আমারই কল্পনায় গড়া আমারই নিজস্ব জগৎ, আমার চিন্তা, শিক্ষা, কল্পনা, স্মৃতি সব উপকরণে গড়া।"

বাস্তবেব বিচিত্র জীবন ধারা ও কল্পনার নিজস্ব জগৎ—এই দুয়ের দ্বন্দ্বকে তিনি এড়িয়েছেন বিশেষ কৌশলে। কাহিনীর কাঠামো তিনি নিখুঁত বাস্তব থেকে আহরণ ক'রে তার ওপরে নিজের স্বপ্নজগৎ গড়ে তোলেন। নিয়ত দেখা অতি-পরিচিত জগৎ-সংসারের ভিত্তি-ভূমিতে 'রূপকথা'-র সৌধ রচনা করতেন তিনি। তাঁর বাস্তব ঘরে তাই 'খেলাঘর'-এর স্বাদ।

* নির্জনতাকে তিনি চাইতেন 'as a bride'। তৃণাঙ্কুরে (পৃঃ ১২১) লিখেছেন, "এমার্সন বলেচেন, 'Every literary man should embrace solitude as a bride। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হিউ ওয়ালপোল…বড় চমৎকার একটা প্রবন্ধ লিখেচেন। নির্বাসিত দান্তে বলেছিলেন, 'কি গ্রাহ্য করি আমি, যতক্ষণ আমার মাথার ওপর আছে নীল আকাশ আর অগণ্য তারকালোক। জার্মান মিষ্টিক একহার্ট কখনো লোকের ভিড়ে বা শহরের মধ্যে থাকতে ভালবাসতেন না"—

বিভূতিভূষণের দ্বন্দ্ব-ভীরু মন প্রায় সর্বত্রই দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে গেছে। কেবল একটি মাত্র গ্রন্থে—আরণ্যকে—তাঁর স্বপ্ন ও বাস্তব এক অনিবার্য সংঘাতের বেদনায় ট্র্যাজিক মহিমা লাভ করেছে। অন্য কোন যায়গাই তিনি ট্রাজেডির লেখক নন, লিরিকের কবি। শুধু এই 'আরণ্যকে' লিরিক প্রবণতার অন্তরালে এক সূক্ষ্ম ট্র্যাজিক ক্রন্দনের প্রবাহ।

॥ দুই ॥

॥ "আরণ্যক" ॥

'আরণ্যক' শুধু প্রকৃতিপ্রীতির ইতিকথা নয়, অসংলগ্ন চিত্রের প্রদর্শনী নয়। এ সবের আড়ালে একটা অন্তর্বেদনা ফল্গুস্রোতে প্রবাহিত। সেই স্রোতেই 'আরণ্যক'-এর সত্যকার পরিচয়।

গ্রন্থের সুরুতে লেখক বলেছেন, "আমার এ-স্মৃতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনও ক্ষমা করিবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়।" এই অনুতাপের সুরে সমগ্র উপন্যাসটি বিধৃত।

এ বইয়ের মূল চরিত্র দুটি, অরণ্য ও 'আমি'। বইয়ের সুরুতে দুয়ের সাক্ষাৎ—দুই অপরিচিতের আনুষ্ঠানিক পরিচয়; শেষে একের মৃত্যুর মধ্যে উভয়ের চিরবিচ্ছেদ। অরণ্যের প্রতি এই উত্তমপুরুষটির দৃষ্টি প্রথমে অপ্রসন্ন, তাঁর নির্বাসন-নিঃসঙ্গ নয়নে আরণ্য মোহাঞ্জনের ছোঁয়া তখনও লাগে নি। অরণ্য ছেড়ে কোলকাতায় ফেরবার জন্য মন সব সময় পালাই-পালাই করে। পলায়ন-উন্মুখ মনটিকে গোমস্তা গোষ্ঠ সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে—থাকুন দু'দিন শেষে এ ছেড়ে যেতে মন চাইবে না।

ভবিষ্যৎ প্রেমের ইঙ্গিত দিয়েছে গোষ্ঠ গোমস্তা। কিন্তু নায়ক (তথা লেখক) তো বৈরী-সম্পর্কে আগত—অরণ্যের মৃত্যুর কুঠার হাতে নিয়েই এই পরশুরামের আবির্ভাব। অরণ্য পৃথিবীকে নির্বৃক্ষ করাই তাঁর কর্তব্য। সেই মৃত্যুদণ্ড দ্রুত সুসম্পূর্ণ ক'রে তিনি চলে যাবেন, এবং ভেবেছিলেন, হৃদয়ের প্রান্তে বিন্দুমাত্র চিহ্নও থাকবে না এ ঘটনার।

কিন্তু নায়কের নিঃসঙ্গতার শূন্য পেয়ালা অরণ্য ক্রমে পূর্ণ করে তুলতে লাগল, নেশা ধরতে শুরু করল তাঁর। জ্যোৎস্না-রংয়ের শাড়ী পরে মাঠ ও কাশবনের উপর কে যেন এসে দাঁড়াল, নতুন-ফসল-তোলা খামারের মধ্যে পাওয়া গেল তারই দেহের সুগন্ধ, সরস্বতীকুণ্ডের কবরীতে ফুটে উঠল বিচিত্র-বর্ণ পুষ্পরাজি। প্রেমের বাঁধন পড়ল। আর তাই নায়কের হাতের প্রতিটি কুঠারাঘাত দ্বিগুণিত হয়ে তাঁর নিজের বুকেই ফিরে আসতে লাগল। কিন্তু থামবার উপায় নেই। 'আমি' যে ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে মহাকালের দূত, অগ্রসরমান সভ্যতার প্রতিনিধি। যত বেদনাই বাজুক, হাত থেকে কুঠার নামাবার উপায় নেই।

'প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো তার শত বৎসরের সাধনার ফল এই নাঢ়া-বইহার, অতুলনীয় বন্য সৌন্দর্য ও দূরবিসর্পিত প্রান্তর লইয়া বেমালুম অন্তর্হিত হইবে। অথচ কি পাওয়া যাইবে তাহার বদলে? কতকগুলি খোলার চালের বিশ্রী ঘর, গোয়াল, মকাই, জনারের ক্ষেত, শোণের গাদা, দড়ির চারপাই, হনুমানজীর ধ্বজা, ফণিমনসার গাছ, যথেষ্ট দোক্তা, যথেষ্ট খৈনী, যথেষ্ট কলেরা ও বসন্তের মড়ক।" এত সব জেনেশুনেও এ কাজটা করতে হবে নিজে হাতে।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সৌন্দর্য রক্ষা ও বৃদ্ধির কিভাবে সঙ্গতি হতে পারে, এমন কোন পজিটিভ্ ভাবনার দিকে বিভূতিভূষণের মন যেতে চায় না। তিনি সভ্যতার মড়ক ও কুশ্রীতা দেখে মুখ ফেরাতে চান। সভ্যতার দেহ থেকে ব্যাধিগুলিকে মুক্ত করার উপায় ভাবতে চান না। তাই সভ্যতার অনিবার্য দাবীতে অরণ্য যখন শস্যক্ষেত্র এবং শিল্পের জন্য জমি ছেড়ে দেয়, তখন প্রকৃতি-সৌন্দর্য ও মানব সরলতার জন্য তিনি হাহাকার করেন, অথচ কুঠার সংযত করতেও পারেন না। অরণ্যের পায়ের কাছে রাখেন ব্যথিত অনুতপ্ত হৃদয়ের একটি ক্ষমা প্রার্থনার প্রণাম, 'হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন, আমায় ক্ষমা করিও।'

॥ তিন ॥

॥ জীবনবোধ ॥

বিশ-শতকের দ্বিতীয় পাদ বিভূতিভূষণের কার্যকাল। এই সময়ের বৃহৎ ঘটনা—অর্থনৈতিক মন্দা, মধ্যবিত্ত জীবনে সমস্যার প্রসার, উত্তুঙ্গ রাজনৈতিক আন্দোলন, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ প্রাণক্ষয়ী দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব, দেশবিভাগ ইত্যাদি। কিন্তু বৃহৎ ঘটনাগুলি তাঁর সাহিত্যে তেমন প্রবল ছাপ রাখে নি। এই জীবনগতির প্রাবল্যের পরিমাপ তিনি করতে চান নি।

শান্ত, সরল, স্তিমিতগতি জীবনের ঐশ্বর্যসন্ধানী তিনি। জীবনের খর আবর্তে প্রীতি নেই তাঁর, প্রশান্তি তাঁর কাম্য। জীবনের সক্রিয়তা নয়, সমাহিত অনুভূতি তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য। কর্ম-লোককে প্রায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে মনোলোকের সাধনা তাঁর। 'আজকাল আমার মনে হয়,—অনুভূতি, আশা, কল্পনা, স্বপ্ন—এ সবই জীবন' (অপরাজিত, পৃঃ ৩২৫)। জীবন বলতে তিনি এই সীমাবদ্ধ বিষয়কে বুঝতেন।

"জীবন খুব বড় একটা রোমান্স—বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্স—অতি তুচ্ছতম, হীনতম, একঘেয়ে জীবনও রোমান্স।" (অপরাজিত পৃঃ ৩৯৬)। এই উক্তির মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ যেমন তুচ্ছ ক্ষুদ্র অবহেলিত জীবনকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেলেন তেমনি তুচ্ছতা হীনতা একঘেয়েমিকেই যেন প্রাপণীয় বলে পরোক্ষে সীমা নির্দেশ করলেন। সেই তুচ্ছ হীন একঘেয়ে জীবন যে আরো বৃহৎ

ও মহৎ রোমান্সের অভিমুখী হ'তে পারে, হওয়া উচিৎ—অন্তত সভ্যতার কাছে ঐ তুচ্ছ জীবনগুলোর দাবী তাই—তা তিনি ভাবতে চাইলেন না। রুষোর মত তিনি যেন আধুনিক সভ্যতার কাছ থেকে সরে প্রকৃতিরাজ্যে ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু রুষোর সমাজচিন্তা ছিল, 'সামাজিক চুক্তি'-র তত্ত্ব তিনি উপস্থিত করেছিলেন।

একঘেয়ে জীবনে রোমান্সের স্বাদ পেতেন বলে তাঁর সাহিত্যেও একঘেয়েমি প্রভূত। বিভূতিভূষণ 'পথের-পাঁচালী'-'অপরাজিত'-এর পরে নতুন বা গভীরতর কিছু আর বলতে পারলেন না। পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকল তাঁর। শিল্পপ্রাণ আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির পথ যেহেতু নানা কলুষ আবর্তের মধ্য দিয়ে প্রসারিত তাই তিনি পয়লা দিনে হাতের মুঠিতে যে-মন্ত্র পেয়েছিলেন, চোখ বুঁজে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে জীবন-পথ পার হয়ে গেলেন। গিয়ে উঠলেন দেবযানে। মাঝে মাঝে এই সমাহিত চিত্তে বিংশ শতাব্দীর তরঙ্গ আঘাত করে, দু' এক সময় তিনি সামান্য বিচলিত হন, তুচ্ছ জীবনের সৎ সরল সৌন্দর্যের যে খুদকুঁড়োটুকু বিংশ শতকের নিশ্বাসে এখনও কলুষিত হয় নি, তাকে বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরেন, অতীতকে স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তারপরে আবার মনোরাজ্যে নিমজ্জিত হয়ে যান। কিন্তু ঐ খুদকুঁড়ো যে সমাজক্ষেত্রে একটা শক্তি এবং সেই শক্তিও ক্রমাগত নিজেকে প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সম্প্রসারিত করবার চেষ্টা করছে, এই সমাজসত্যকে তিনি ভাল করে লক্ষ্য করতে পারেন নি।

তুচ্ছ হীন অবহেলিত মানুষকে তিনি আন্তরিকভাবেই ভালবাসতেন। কিন্তু সে মানবপ্রেম সেন্টিমেণ্টাল স্তরেই সীমাবদ্ধ, যুক্তিসিদ্ধ সক্রিয়তার পথে অগ্রসর নয়। সাধারণ মানুষের সরল অনাড়ম্বর সৎ জীবন তাঁকে মুগ্ধ করত কিন্তু তাদের দুঃখ, বেদনা, সংগ্রাম, জয়-পরাজয়, আশা ও হতাশার সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ তিনি মেলাতে পারেন নি। যদি পারতেন তবে তাঁর সাহিত্য একই কথার এত ক্লান্ত

পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে বিস্তৃত জীবনের সাগর সঙ্গমে উপনীত হতে পারত। দুঃখের বিষয়, তা হয় নি। মন তার এমন দীক্ষিত ছিল যে এক বিষয়ের পুনরাবৃত্তি তাঁর নিজের কাছে ক্লান্তিকর মনে হোতো না। পল্লীজীবনের সৌন্দর্যও যেমন সত্য, তেমনি সত্য তার গতিহীন স্থাণু জড়ত্ব—যেখানে দীর্ঘকাল থাকতে হলে যে কোন সচল-সজীব মনের ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। সে স্থান মনের মধ্যে ডুব দেওয়ার পক্ষে অবশ্য প্রশস্ত স্থান। তাই তিনি করেছেন, তাই তিনি ভালবাসতেন। সেইজন্য তাঁর ক্লান্তি আসে নি, এক কথা শতবার শতভাষায় ডায়রী ও উপন্যাসে লিখেছেন। কল্প-আলোকে অভিষিক্ত করে দেখতেন বলেই একঘেয়েমিটা তাঁর চোখে পড়ত না। নইলে তাঁর 'একঘেয়ে জীবনও রোমান্স' কথাটা মূলত ভুল, কারণ ও দুটো শব্দ পরস্পর বিরোধী, মনে ওর একটা ভাব জাগলে আর একটা থাকে না।

ডায়রী ও উপন্যাসে ক্রমাগত বলছেন তিনি, 'আজ বড় ভাল লাগল।' এ যেন নিজের মনকেও শোনানো, কারণ এর বাইরে গেলে আরও বড় একটা 'খারাপ' জগৎ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সে জগৎকে খোঁজবার বা বোঝবার দরকার নেই। সাপের ভয়ে কেঁচো খোঁড়া থেকে বিরত রইলেন। আর প্রকৃতি কেন্দ্রিক স্বীয় মানসিক ভাবালুতা যদি সময় সময় একটু একঘেয়ে হয়ই, তবু এই ভাল—এই ভাল।

শিল্পী তার জীবনবোধের চূড়ান্ত যায়গাটায় পেঁাছোয় বহু মেহনৎ ক'রে। অনেকখানি যন্ত্রণা তার মাশুল। এই মাশুল বিভূতিভূষণ খুব পুরো হারে দিয়েছেন ব'লে মনে হয় না। প্রথম যৌবনে (পথের পাঁচালী ও অপরাজিত-তে) তিনি একটা আবছা রকমের অধ্যাত্মদর্শনে পেঁাছলেন এবং সে অধ্যাত্ম-অনুভূতি এত অক্লেশ-আয়ত্ত যে সন্দেহ হয় যতখানি উচ্চারিত ততখানি তাঁর স্বোপার্জিত কিনা। কৈশোরে একটী বালক অন্যের একটী কথা

মোটামুটী বিশ্বাস ক'রেই ভাবালুভাবে তাকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু সেই কথাটাও তার উপলব্ধির গভীরে যেতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে। জীবনের পথের প্রতি বাঁকে হোঁচট খেতে খেতে আঘাতে-আঘাতে সে বোধ দৃঢ়ভিত্তি আসন নেবে উপলব্ধির গভীরে। কিন্তু বিভূতিভূষণ কতকগুলি বিশ্বাস প্রথম যৌবনে গ্রহণ করেছিলেন, বার্ধক্যেও ভোলেন নি, বা নতুন কিছু সংযোজন করেননি। বিশ্বাসগুলিকে—যাকে তিনি সত্য বলে জেনেছেন—বর্তমান জীবন-সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করাতেও যেন তাঁর ভয় ছিল। তিনি জানতেন, মুখোমুখি দাঁড়ালে তাঁর বিশ্বাস কিছুটা টোল খাবে, ভাঙ্গবে, দোমড়াবে, নতুন চেহারা নেবে। এই রূঢ় সহযোগিতাটুকু সব শিল্পীকেই গ্রহণ করতে হয়, কারণ ঐ নতুন-নেওয়া চেহারাটাই বিশেষ শিল্পীর জীবনের খাঁটি সত্য। কিন্তু বিভূতিভূষণ ঐ রূঢ়তাটুকুর ভয়ে সহযোগিতাটুকু নিতে চান নি; তাই সারা জীবনে তাঁর জীবনবোধের কোন অদলবদল হোলো না, বাঁক নিল না, কোন পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত পর্যন্ত হোলো না। তারুণ্যের বিশ্বাসটীকে হাতের মধ্যে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে চোখ বুঁজে জীবনের পথটা তিনি পেরিয়ে এলেন। রূপকথার রাজপুত্রের পেছনে ডাইনে বামে কত লোক ডাকল। বিভূতিভূষণ সেই দলের রাজপুত্র, যে কোন দিকে না তাকিয়ে রাজকন্যার ধ্যান করতে করতে এসে একেবারে চোখ খুলল সেই কন্যার মুখের ওপর। এক ধরণের সিদ্ধি তাঁর হোলো, আর তাতে এমন মসগুল হয়ে রইলেন যে এর অপূর্ণতা জানলেনও না। কিন্তু ঔপন্যাসিকের ধর্ম সেই রাজপুত্রের মত, যে আহ্বানগুলির উৎস-সন্ধানে বিপদকে বরণ করে, আর বিপদমুক্তির মধ্য দিয়ে পূর্ণ সিদ্ধি পায়। বিপদের বাধার মধ্য দিয়েই সে রাজকন্যাকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করে, পায় তাকে আরো বড় করে, কারণ রাজকন্যার জয়মাল্য ঐ বিপদজয়ী রাজপুত্রের জন্য

যত উন্মুখ থাকে এমন আর কারো জন্য নয়। ঐ রাজপুত্র জীবনকে অনেকখানি দেখল, আর বিভূতিভূষণ জীবনপথে দেখলেন প্রধানত নিজের মন। নিজের মনেরও সবটুকু নয়। দুঃখ-বিপদের আবর্তে প্রাপণীয়ের কামনা যখন উদ্বেল, সেই মথিত মন নয়। প্রশান্ত আত্মতৃপ্ত মন। দুঃখকে তিনি তার সত্যরূপে দেখতে পেলেন না, ভাবরসে জারিয়ে তাকে এক সুখানুভূতির পর্যায়ে নিয়ে এলেন—পূর্বস্মৃতি রোমন্থনের ঈষৎ বেদনামিশ্রিত আনন্দের মত সে অনুভূতি। তাই তাঁর কাছে 'সুখ ও দুঃখ দুইই অপূর্ব।' (অপরাজিত, পৃঃ ৩৯৬) কিন্তু যে দুঃখ তার নিষ্ঠুরকাঠিন্যের জন্য কোন ভাবরস গলে না, যে দুঃখ নগ্ন সত্যমূর্তি, তাকে বিভূতিভূষণ চিনতেন না। নির্লজ্জ অমানুষিকতা অপসারণের মর্মান্তিক প্রয়াসের ব্যর্থতার মধ্যে যে মহিমান্বিত দুঃখ স্বয়ংপ্রভ, তাকে তিনি দেখেন নি। বিপদকালীন সুদীর্ঘ-সংগ্রাম-শেষের প্রবল বিজয় আনন্দের স্বাদ তিনি জানতেন না। অথচ বিংশ শতকের চল্লিশের কোঠায় বিশেষ করে এই বিষয়গুলি কী প্রবল আলোড়নই এনেছিল জনজীবনে। রবীন্দ্রনাথ—যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ যুগে জীবনের অর্ধেকটা কাটিয়েছেন, যাঁর মনের আশ্রয়ভূমি দীর্ঘ ঐতিহ্য-চর্চায় সুদৃঢ় ছিল—তিনিও ঐ সময় অতিরিক্ত নাড়া খেয়েছিলেন।

কিন্তু বিভূতিভূষণ অবিচলিত। দু' একটী গল্পে তাঁর অস্থিরতার সামান্য ইঙ্গিত আছে মাত্র। কিন্তু সেগুলিতে বহির্জগতের আলোড়নের প্রবলতার তুলনায় তার সাহিত্যরূপ অত্যন্ত দুর্বল।

বস্তুত, বিভূতিভূষণ খুব উচ্চ অনুভূতিশক্তির অধিকারী ছিলেন না। মাঝারি ধরনের অনুভূতিশক্তি ছিল তাঁর। শুধু মাত্র পূর্বোক্ত বিষয়-গুলির ক্ষেত্রেই নয়, সর্ব ক্ষেত্রে। প্রেম তাঁর সাহিত্যে নিস্প্রভ। তাঁর মুখ্য ও প্রিয় বিষয় বস্তু—প্রকৃতি। কিন্তু প্রকৃতি সম্পর্কেও তাঁর অনুভূতি তীব্রতায় ও গভীরতায় রোমান্টিক ইংরেজকবিকুল বা

রবীন্দ্রনাথের তুলনায় বহু নিম্নে। বিভূতিভূষণের উপন্যাস ও গল্পে দীন-দরিদ্র সাধারণ মানুষের কাহিনী আছে। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তিনি এদের অনেক কাছেও ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্বেও রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি', 'শাস্তি' ইত্যাদির সমস্তরে মর্যাদা পেতে পারে এমন গল্প বিভূতিভূষণের নেই বললেই হয়। অনুভূতি শক্তির এই আপেক্ষিক ন্যূনতার জন্য মৃত্যু বা শোক বা আনন্দের দৃশ্যও তাঁর সাহিত্যে তেমন দৃঢ় রেখাপাত করতে পারে না। তাঁর সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে তীব্র-আবেগ-উদ্বোধক দৃশ্য বিশেষ নেই। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অপু-চরিত্রে 'গভীর আবেগের আপেক্ষিক অভাবের' অভিযোগ করেছেন। 'আমরা সাধারণতঃ ভাব-গভীরতার যে মাপকাঠি লইয়া চরিত্রের উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার করি, অপু সেই আদর্শ পূরণ করে না।' অপু বিভূতি-সাহিত্যের সর্বপ্রধান চরিত্র বলে এ উদাহরণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, অপু বিভূতিভূষণেরই আদর্শ রূপ। সেদিক থেকেও কথাটি বিচার্য।

বিভূতিভূষণ তাঁর শক্তির সবচেয়ে ভাল প্রকাশ করতে পেরেছেন স্মৃতিধর্মী চিত্র-অঙ্কনে—স্মৃতির আবেগ খুব তীব্র নয়, অপেক্ষাকৃত স্তিমিত বলেই বোধহয়।

অনুভূতিশক্তির এই স্বল্পতাই তার লেখকজীবনের খুব বড় অভাব। গীতিকবির মন নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন বলে তাঁর কিছুটা সীমাবদ্ধতা অপরিহার্য ছিল, কিন্তু সেই সংকীর্ণতা সত্বেও গদ্য-লিখিয়ে বড় গীতিকবি হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পেতে পারতেন যদি অনুভূতিশক্তি তাঁর ন্যূন না হোতো। তাঁর এই শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে একটি-দুটি উপন্যাসে এবং কয়েকটি গল্পে। বাকী বিপুলায়তন সাহিত্য রচনা না করলেও তাঁর সাহিত্যিক-কৃতিত্বের ইতর-বিশেষ হোতো না।

॥ চার ॥

॥ প্রকৃতিচেতনা ॥

বিভূতিভূষণের মনের সবচেয়ে বড় আশ্রয় ছিল প্রকৃতি। রোমান্টিক শিল্পীদের পক্ষে এটা নতুন কথা নয়। বিভূতিভূষণের মনও ঐ ধাতু দিয়ে গড়া, এবং রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রীতির সাধারণ লক্ষণগুলি তাঁর ক্ষেত্রেও প্রায় সর্বাংশে বলবৎ।

প্রাচীনকালের কবিদের কারো প্রকৃতি-প্রেম ছিল না এমন নয়। কিন্তু প্রাচীন দৃষ্টি আর আধুনিক কালের রোমান্টিক দৃষ্টির মধ্যে বেশ কিছুটা পার্থক্য আছে।

মানুষ তার একেবারে আদিমকালে বোধহয় প্রকৃতিকে ভালবাসে নি। বরং সে-সময় প্রকৃতি সম্পর্কে ভয় থাকাটাই তার স্বাভাবিক। মানুষ তখনও প্রতিকূল প্রকৃতিকে নিজের বুদ্ধি ও দক্ষতা দিয়ে অনুকূল করে নিতে পারেনি। প্রকৃতির নগ্ন নখ-দন্ত তখন মানুষের অস্তিত্বের উপর প্রতি মুহূর্তে হানা দিচ্ছে। এ অবস্থায় প্রকৃতি সম্পর্কে প্রীতি নয় ভীতি জাগাই স্বাভাবিক। তখনও সম্পর্কটা মৈত্রীর নয়, বৈরীর। সেকালে সাহিত্যের জন্ম হয়নি, নইলে সে-সাহিত্যে মানুষের এই ভীতির ছাপ পাওয়া যেত। আদিম মানুষের প্রকৃতি-প্রতীক দেব-কল্পনার ভয়ঙ্করত্বের মধ্যে সেই মনের কিছুটা পরিচয় এখনও আছে।

ক্রমে মানুষের অগ্রগতি হোলো; বিশেষ করে কৃষি-সভ্যতার পত্তনের সময় থেকেই প্রকৃতি তার প্রাণহন্ত্রী রইল না, প্রাণদাত্রী হয়ে উঠল। মানুষের নিজের বুদ্ধির বলেই প্রকৃতি তার সহায়িকা

হয়ে দাঁড়াল। প্রকৃতির মধ্যে নিষ্ঠুর হিংস্র জিঘাংসু সত্তাকে তখন আর সে দেখল না, দেখল কোমল করুণাময় একটা প্রাণ। বাল্মীকি-কালিদাসে এই দৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। প্রকৃতি ও মানুষের আত্মীয়তার বাণী এদের কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু এদের দৃষ্টির সঙ্গে নব্য কালের রোমান্টিক দৃষ্টির পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক, কারণ সমাজের চেহারাটাও পালটে গেছে অনেকখানি।

একালের সমাজ নগর-কেন্দ্রিক, শিল্পনির্ভর, জটিল এবং প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন। এ সমাজের ভারকেন্দ্র গ্রামীণ কৃষি-অঞ্চল থেকে স'রে বৃহৎ শিল্প-এলাকায় চলে এসেছে। পূর্বে যেখানে মানুষ প্রকৃতির কোলেই বড় হোতো, মিলে-মিশে থাকত দুজনে, আজ সেখানে প্রকৃতিকে লেপে-মুছে দূর করে মাটিতে বস্তী ও যন্ত্র, আর আকাশে কালো ধোঁয়া ছড়ানো। মুখ-দেখাদেখি দুজনের বন্ধ। এই ব্যবধান আমাদের প্রকৃতিপ্রেমের তীব্রতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। একদিন যা নিকটে ছিল আজ তা দূর। একদিন যার মধ্যেই প্রায় আমরা বাস করেছি, আজ সহস্র সাধনাতে তাকে আর পুরো ফিরে পাওয়ার উপায় নেই, কারণ প্রকৃতিকে উৎপাটিত করেই নতুন সভ্যতার পত্তন। এ কালে তাই এ সভ্যতা প্রকৃতির সৌন্দর্যকে যত নষ্ট করবে তত আবার তার জন্য কাঁদবেও। সভ্যতার এ গতিকে সম্পূর্ণ রোধ করাও যাচ্ছে না। প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবধান কমানোও সম্ভব হচ্ছে না। আর এই ব্যবধানই পাওয়ার আগ্রহকে তীব্রতর করছে। প্রাচীন কাল এ আগ্রহকে এত তীব্রভাবে অনুভব করেনি।*

---

* No age ever grew so ecstatic over natural beauty as the ninteenth century; at the same time no age ever did so much to deface nature. No age ever so exalted the country over the town, and no age ever witnessed such a crowding into urban centres.

—Irving Babbitt, Rousseau and Romantcism.

আগ্রহের এই পরিমাণগত তারতম্য এত বেশী যে এটা প্রায় একটা গুণগত পার্থক্যে গিয়ে পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথ এই দুই আকর্ষণের চরিত্রভিন্নতা বোঝাতে একটাকে বলেছেন, 'ভাইবোনের সম্পর্ক', আর একটাকে বলেছেন, 'স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক'। প্রথমটা কালিদাস ইত্যাদি ভারতীয়দের, অর্থাৎ প্রাচীনদের, দ্বিতীয়টা ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের অর্থাৎ এ কালের রোমান্টিকদের।

রবীন্দ্রনাথ যদিও এই পার্থক্যটা উল্লেখ করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পার্থক্য বলে, আসলে এ পার্থক্য কিন্তু প্রাচীন ও নবীনের, এবং পার্থক্যের কারণ পুরানো ও নতুন সমাজের রূপ-ভিন্নতা।

রবীন্দ্রনাথের উক্তিটা তুলে দিচ্ছি (সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, পঞ্চভূত) :

'প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইংরাজ ভাবুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক। আমরা জন্মাবধিই আত্মীয়, আমরা স্বভাবতঃই এক। আমরা তাহার মধ্যে নব নব বৈচিত্র্য, পরিসূক্ষ্ম ভাবচ্ছায়া দেখিতে পাই না, এক প্রকার অন্ধ অচেতন স্নেহে মাখামাখি করিয়া থাকি। আর ইংরাজ, প্রকৃতির বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। সে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই তাহার পরিচয় এমন অভিনব, এমন আনন্দময়, তাহার মিলন এমন প্রগাঢ়তর। সেও নববধূর ন্যায় প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রকৃতিও তাহার মনোহরণের জন্য আপনার নিগূঢ় সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করিতেছে। সে প্রথমে প্রকৃতিকে জড় বলিয়া জানিত, হঠাৎ এক দিন যেন যৌবনারম্ভে তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তাহার অনির্বচনীয় অপরিমেয় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়াছে। আমরা আবিষ্কার করি নাই ; কারণ, আমরা সন্দেহও করি নাই, প্রশ্নও করি নাই।

'আত্মা অন্য আত্মার সংঘর্ষে তবেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে, তবেই সে মিলনের আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণ মাত্রায় মন্থিত হইয়া উঠে। একাকার হইয়া থাকা কিছু না থাকার ঠিক পরেই।

কোন একজন ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন, ঈশ্বর আপনারই পিতৃ-অংশ এবং মাতৃ-অংশকে স্ত্রী-পুরুষ রূপে পৃথিবীতে ভাগ করিয়া দিয়াছেন; সেই দুই বিচ্ছিন্ন অংশ এক হইবার জন্য পরস্পরের প্রতি এমন অনিবার্য আনন্দে আকৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু এই বিচ্ছেদটি না হইলে পরস্পরের মধ্যে এমন প্রগাঢ় পরিচয় হইত না। ঐক্য অপেক্ষা মিলনেই আধ্যাত্মিকতা অধিক।'

এই 'ঐক্য' প্রাচীন যুগের বৈশিষ্ট্য, বিচ্ছেদ এ যুগের, আর এ যুগে তাই 'প্রগাঢ় পরিচয়'।

প্রাচীন পাশ্চাত্য সম্পর্কেও এ ঐক্যের কথা সত্য। গ্রীকদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা নাকি never saw the oak tree without at the same time seeing the dryad.' প্রকৃতিকে তারা ঠিক 'জড়' ভাবত না। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রসারের পরে অবশ্য এই ঐক্য-ধারা ব্যাহত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

প্রাচীন ও নবীন দুই আলাদা সমাজের পরিপ্রেক্ষিত থেকে প্রকৃতিকে দেখবার দরুণ তাদের দৃষ্টির আরও একটা বড় পার্থক্য ঘটেছে। প্রাচীন সমাজ ছিল প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ; প্রকৃতির মধ্যেই মানুষ অনেকটা বাস করত, তাই তার আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতির প্রতিফলন সে প্রকৃতির মুখে দেখতে চাইতো। যেন প্রকৃতিও মানুষের মত অনুভূতিসম্পন্ন একটা সত্তা—তার নিজের আনন্দ-বেদনা আছে, মানুষের জন্যে কিছুটা বোধশক্তি আছে। অর্থাৎ যে-প্রকৃতির মধ্যে মানুষকে বারো মাস থাকতে হোত, তাকে সে অনেকটা মানবায়িত করে নিয়েছিল। প্রকৃতিকে তখন humanize করে নেওয়ার এই প্রবণতা ছিল।

আর একালে যখন মানুষ প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন, এবং সমাজের জটিলতা ও কৃত্রিমতায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, তখন এই শ্বাসরোধী আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে বলছে 'Back to nature'। এ

প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্খা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করবার জন্য নয়, স্বীয় সত্তাকে তার মধ্যে বিলীন করে দেবার জন্য। সমস্ত জটিলতা ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বভাব-সরল পথে ঐ তরুলতা, পশুপাখী, সমুদ্রপর্বত ও আকাশবাতাসের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেবার কামনা তার। বাস্তব যেখানে এই কামনার পথে বাধা, সেখানে রোমান্টিক শিল্পী তার কল্পজগতে ভাবসম্মিলনটা ঘটায়, তার জাগর স্বপ্নের প্রতি মুহূর্তের প্রয়াস 'imaginative melting of man into outer nature.'। অর্থাৎ মানুষকে নিসর্গীভূত করা এ যুগের সাধারণ প্রবণতা।

দুই যুগের এই পার্থক্যটা এক কথায় দাঁড়ায়, প্রাচীন কালে nature-কে humanize করা হোতো। আর এ কালে man-কে naturalize করার ঝোঁক। (অবশ্য এ দুটো সাধারণ ঝোঁক, এর ব্যতিক্রমও নিশ্চয়ই আছে।) আগের কালের চমৎকার উদাহরণ হবেন কালিদাস। তিনি মেঘকে দূত এবং পর্বতকে মানুষ করেছেন, সেটা বড় কথা নয়। তার চেয়ে অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম', যেখানে প্রকৃতি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানবীয় ব্যক্তিত্ব পেয়েছে।

আর এ কালের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের লুসি মানুষ হয়েও প্রকৃতির অংশ বিশেষ। আমাদের সাহিত্যে কপালকুণ্ডলা আরণ্য-সত্তা। রবীন্দ্রনাথেও এ ঝোঁক আছে; বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর গল্পগুচ্ছের দু'একটি চরিত্র। বিভূতিভূষণের অপুও 'অর্ধেক মানব অর্ধেক প্রকৃতি।'

আমাদের বাংলা-সাহিত্যে রোমাণ্টিক প্রকৃতি-চেতনার উন্মেষকাল ঊনবিংশ শতাব্দী। তার আগে প্রকৃতি এসেছে বারমাস্যার গতানুগতিক খাতে, অথবা কোন রীতিরক্ষার খাতিরে। সাহিত্যের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তিতে যেমন মধ্যযুগের বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের ক্লান্তি নেই, প্রকৃতি-বর্ণনার কতগুলি ধরা-বাঁধাগত প্রচারেও তাঁরা তেমনি শ্রান্তিহীন। কিন্তু এই বর্ণনাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যতটা পূর্বসূরীর

প্রতি অন্ধ আনুগত্য, ততটা আত্মমনের অনুভূতিতে সত্য নয়। প্রকৃতি সেখানে প্রায়ই অনড় একটা পটভূমি মাত্র, শিল্পীর মনের তাপে বিগলিত প্রাণবন্ত নয়।

উনবিংশ শতাব্দী পাশ্চাত্য-সংস্পর্শের যুগ, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যুগ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধনের যুগ। তখন আমরা পাশ্চাত্য-কবিদের কাছে প্রেরণা পেলাম, পূর্বতন সংস্কারকে বর্জন করবার দুঃসাহস নিয়ে অগ্রসর হলাম, প্রকৃতির মধ্যে আত্মলীন করে দিয়ে কাব্য রচনা করলাম।

সমাজক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মকেন্দ্রিক রচনার সূত্রপাতও এই যুগে—লিরিকে যার সব চেয়ে বড় প্রকাশ। মধ্যযুগে সম্প্রদায়গত মনের চেহারাটা বেশী ধরা পড়ত কাব্যে, শিল্পে। ব্যক্তিমনের চেহারাটা প্রাধান্য পেল এ যুগে। শুধু প্রাধান্য বললে কম বলা হয়, লিরিক প্রভৃতিতে ব্যক্তিমন একচ্ছত্র। ব্যক্তিমনের প্রকাশের সুযোগ এই রকমভাবে না বাড়লে রোমান্টিক চেতনার পূর্ণ প্রস্ফুটন সম্ভব নয়। সমাজ-মনের গড়পড়তা প্রবণতা এ বিষয়ে যতটুকু, তার ওপরে নির্ভর করে প্রকৃতির মধ্যে আত্মবিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অসম্ভব।

রোমান্টিক প্রকৃতিচেতনার মধ্যে একটা প্রবল আত্মমুখিতা আছে। প্রকৃতির সঙ্গে রোমান্টিক শিল্পীদের যে সাযুজ্য, তা আসলে তাদের mood-এর সঙ্গেই সাযুজ্য। (The Rousseauist, on the other hand, does not in his "communion" with nature adjust himself to anything. He is simply communing with his own mood.—Irving Babbitt.এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৮৩)। রুশোর মতে, প্রকৃতি মৃত, যদি না তাকে প্রেমের উত্তাপে সঞ্জীবিত করা হয়। (বিভূতিবাবুও 'আরণ্যকে' লিখেছেন, 'অনেকদিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে' তার দান মেলে না।) রুশো এক যায়গায় বলছেন, 'Beloved Solitude, beloved

solitude, where I still pass with pleasure the remains of a life given over to suffering. Forest with stunted trees, marshes without water, broom, reeds, melancholy heather, inanimate objects, you who can neither speak to me nor hear me, what secret charm brings me back constantly into your midst ? Unfeeling and dead things, this charm is not in you ; it could not be there. It is in my own heart which wishes to refer back everything to itself.' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩৩) ।

কোলরিজেও এর প্রতিধ্বনি শোনা যায় ঃ

> O Lady ! we receive but what we give,
> And in our life alone does nature live.

এই আত্মমুখিতার সব চেয়ে যোগ্য আধার গীতিকবিতা। বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতকে গীতিকবিতার জন্ম। আর এই গীতিকবিতার মধ্যেই রোমান্টিক প্রকৃতি-চেতনা আত্মপ্রকাশের সুষ্ঠু অবলম্বন পায়। বিহারীলালে তার অস্ফুট সূচনা, রবীন্দ্রনাথে তার পরিণতি। এবং রবীন্দ্র-সরণীতেই বিভূতিভূষণের আবির্ভাব। বিভূতিভূষণ অবশ্য লিখেছেন উপন্যাস। ফলে তাঁর সাহিত্যে আধার ও আধেয়ের একটা বিরোধ আছে তাঁর উপন্যাস অতিমাত্রায় আত্মমুখী—গীতিকবিতার মত।

বাংলা কথাসাহিত্যের মাধ্যমে রোমান্টিক প্রকৃতিচেতনার প্রকাশপ্রয়াসে বিভূতিভূষণ এক প্রধান নায়ক—হয়তো বা সর্বপ্রধান। বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা', রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প, এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু' একটি অস্ফুট উদাহরণ ছাড়া অনুরূপ প্রয়াসের স্বাক্ষর বাংলা সাহিত্যে অনুপস্থিত।

বিভূতিভূষণের 'প্রকৃতি' মানব-বর্জিত নয়। আদিবাসী, অরণ্যচারী

শিশু—এরা প্রকৃতিলীন সত্তা। গ্রামীণ মানুষও প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ। বিভূতিভূষণের 'প্রকৃতি' যেমন সুন্দর ও মঙ্গলময়, তাঁর এই মানুষরাও তাই। এ মনোভাবেরও উৎস রোমাণ্টিক চিন্তাধারার ঐতিহ্যে—'Man, in short, is naturally good and nature hersalf is beneficent and beautiful.' (আর্ভিং ব্যাবিট প্রণীত পূর্বোক্ত Rausseau and Romaticism গ্রন্থের Romantic Morality অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

প্রকৃতিলীন মানুষকে তাঁর বিশেষত সুন্দর লাগে। তিনি নিজেকে এদের সঙ্গে মিশিয়ে দিতেও চান। কিন্তু পারেন কি? সাহিত্যে তবু হয়তো পারেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে? তাঁর ডায়রীর একটি দৃশ্য এখানে উদ্ধার করি: 'সে বনানীর মধ্যে বসে বনের দুলালী মেয়েদের সঙ্গে বনের গল্প করতে আমাদের এত ভাল লাগছিল যে কিছুতেই সেখান থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। ভাত হয়ে গেল, বড় বড় শালপাতার পাত্রে ফেন শুদ্ধ ঢেলে বিনা নুনে বিনা তরকারীতে দিব্যি খেতে লাগল। বিলাসিতার সর্ব-উপকরণ-শূন্য এই সকল অনাড়ম্বর জীবনধারা আমার কাছে এত নূতন, এত অপরিচিত যে শুধু এই দেখবার জন্য আমি সমস্ত রাত এইভাবে কাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু শীত পড়ে আসছে, এ সময় বাইরে বসে থাকা স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিরাপদ নয়। কাজেই আমরা বাংলোর মধ্যে গিয়ে আগুনের ধারে বসলাম।' (বনে পাহাড়ে পৃঃ ৩২-৩৩)।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেম

সাহিত্যের অন্যতম মুখ্য বিষয়বস্তু প্রেম বিভূতিভূষণে তেমন প্রাধান্য পায়নি। প্রেমের রহস্য উন্মোচন বা তার গতিবেগ পরিমাপে তাঁর তেমন উৎসাহ নেই। অপুর মনোবিকাশের খুঁটিনাটি বর্ণনা সত্ত্বেও তার প্রেম-চেতনার উদ্বোধন সম্পর্কে নীরবতা লেখকের এই বিষয়ে আপেক্ষিক অনুৎসাহ প্রমাণ করে। তাঁর সাহিত্যের সুবৃহৎ পটভূমিতে প্রেমের স্থান কতটুকুই বা!

প্রেম যেখানে এসেছে বিভূতি-সাহিত্যে, এসেছে একটা বিশেষরূপে। শান্ত গৃহশ্রী তাঁর প্রেমের প্রদীপে। সে দীপের আলোর পরিধি ছোট, প্রকৃতি স্নিগ্ধ। এত উত্তাপহীন সে বর্তিকা যে মনে হয় বুঝি এক পসলা জ্যোৎস্না শিখার গায়ে কে জড়িয়ে দিয়েছে। সে-জ্যোৎস্না কল্পলোকে ভাবুকতা জাগায়, দাবানল জ্বালায় না। উত্তেজনা বা উন্মাদনা সে-প্রেমের জগৎ থেকে নির্বাসিত। বিভূতিভূষণে প্রেমের স্রোত ইছামতীর মতই স্তিমিত, নিস্তরঙ্গ। খরস্পর্শা সর্বনাশী রূপ তার নয়। পাড় সে ভাঙ্গে না, পাড়ে জাগায় শ্যামসমারোহ। তার প্রেম প্রবল নয়, কোমল। তিনি প্রেমের প্রমত্ত শক্তিকে দেখেন নি, তার প্রেমে পরম স্বস্তি। তার দাম্পত্য প্রেমের আড়ালে বাৎসল্যের অন্তঃস্রোত দুর্লক্ষ্য নয়।

অপু-অপর্ণার প্রেম এর বিশিষ্ট উদাহরণ। ঘুমন্ত অপুকে দেখে অপর্ণার 'এমন একটা মায়া হয় ওর ওপরে।' (অপরাজিত, পৃঃ ২২৮)।

সেই মায়ার স্বরূপ খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন বিভূতিভূষণ অন্যত্র 'অপুর উপর তাহার একটা অদ্ভুত স্নেহ গড়িয়া উঠিয়াছে, ছেলের উপর মায়ের স্নেহের মত। অপুর কৌতুকপ্রিয়তা, ছেলেমানুষি, খেয়াল, সংসারানভিজ্ঞতা, হাসিখুশি, এসব অপর্ণার মাতৃত্বকে অদ্ভুতভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছে।' (অপরাজিত, পৃঃ ২২৫)

আর অপর্ণা-প্রসঙ্গে অপুর চিন্তাও এর পরিপূরক। অপু ভাবে, 'ঠিক এইভাবেই কথা বলিত মা। অপুর অদ্ভুত মনে হয়, মায়ের মত স্নেহশীলা, সেবাপরায়ণা, সেইরকমই অন্তর্যামিনী।' (অপরাজিত, পৃঃ ২২৫)। অন্যত্র অপর্ণা-প্রসঙ্গে অপুর মনোভাব এইরকমঃ 'অপু ভাবে, মা ঠিক এই ধরনের কথা বলিত—এই ধরনেরই স্নেহপ্রীতি-ঝরা চোখে। সে দেখিয়াছে, কি দিদি, কি রাণুদি কি লীলা, কি অপর্ণা—এদের সকলেরই মধ্যে মা যেন অল্পবিস্তর মিশাইয়া আছেন—ঠিক সময়ে ঠিক অবস্থায় ইহারা একই ধরনের কথা বলে, চোখে মুখে একই ধরনের স্নেহ ফুটিয়া ওঠে।' (অপরাজিত, পৃঃ ১৯৩)।

বস্তুত, বিভূতিভূষণের মধ্যে সারা জীবন একটি চিরকিশোর লীলা ক'রে গিয়েছে, সেই চিরকিশোর সকল নারীর মধ্যে মা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পায়নি। মাতৃস্নেহের দীপে তার প্রেমের আরতি। বিভূতিভূষণের প্রেম বাৎসল্যের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়, নিজের শক্তিতে সে অনন্যনির্ভর নয়।

বিভূতিভূষণের প্রেম বিশ্বের পটভূমিতে ন্যস্ত; সেখান থেকে তাঁর প্রেম একটা সূক্ষ্ম নিগূঢ় রস সঞ্চয় করে। রূপানুরাগের মুহূর্তে ব্যাপ্ত দেশকালের স্মৃতি-জগৎ অপুর মধ্যে কথা বলে উঠেছে। দশমহাবিদ্যার ষোড়শী মূর্তি, বেহুলা-লখীন্দর, রাধিকার প্রেম ও গ্রামীণ উপকথার শত সুপ্ত স্মৃতি অপুর মনে জেগে ওঠে অপর্ণাকে কেন্দ্র করে। আর প্রকৃতিজগৎ থেকেও অপর্ণা যেন তার দেহলাবণ্য

সংগ্রহ করেছে। অপর্ণা সম্বন্ধে অপুর মনে হয়ঃ 'এই দূর পল্লীপ্রান্তরের নদীতীরের সকল শ্যামলতা, সকল সরসতা, পথিপ্রান্তে বনফুলের সকল সরলতা ছানিয়া এ মুখ গড়া...'

'এসব জিনিষের দিকে' যেসব চরিত্রের তেমন মন নেই, তারাও প্রেমের মুহূর্তে প্রকৃতি-সচেতন হয়ে ওঠে। তাদের প্রেম শুধুমাত্র ব্যক্তিসীমায় আবদ্ধ না থেকে বিশ্বপরিসরে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। যেমন, 'দুই বাড়ি' উপন্যাসের নায়ক নিধু। মঞ্জুর প্রতি তার প্রেমানুভূতি জাগলে পর 'ছায়াভরা পথে শরৎ-প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় যেন নবীন আশা, অপরিচিত অনুভূতি সারা দেহের ও মনের নব পরিবর্তন আনিয়া দেয়। গাছের ডালে বন্য মটরলতা দুলিতেছে, তিৎপল্লার ফুল ফুটিয়াছে—এবার বর্ষায় যেখানে-সেখানে বনকচুর ঝাড়ের বৃদ্ধি অত্যন্ত যেন বেশী। নিধু আশ্চর্য হইয়া ভাবিল—এসব জিনিষের দিকে তাহার মন তো কখনোও তেমন যায় না, আজ ওদিকে এত নজর পড়িল কেন? শরত প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া আছে কাল বিকালে শোনা মঞ্জুর গানের সুর।' (দুই বাড়ি, সিগনেট সংস্করণ, পৃঃ ৪৪)।

কিন্তু বিভূতিভূষণ যেন এই প্রকৃতিরাজ্যেও থামতে চান না, তাঁর প্রকৃতিদৃষ্টি যেমন প্রকৃতির অন্তরালে আর এক অধ্যাত্মসত্তাকে অনুসন্ধান করতে চায়, তেমনি প্রেমের ক্ষেত্রেও বিভূতিভূষণের দৃষ্টি প্রকৃতির যবনিকা উত্তোলন-প্রয়াসী। তাঁর চেতনায় প্রেমানুভূতি ও অধ্যাত্মানুভূতি প্রায় এক হয়ে মিশে আছে। 'দৃষ্টিপ্রদীপে' এর চমৎকার উদাহরণ আছে। জিতু-মালতীর প্রেমের প্রথম স্তর জিতুর মনে এই রকম ভাব জাগায়ঃ "বাইরের মাঠে এসে দাঁড়িয়ে মনে হল আকাশ-বাতাসের রূপ ও রং যেন এক এই মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেছে চোখে।...এই সেই মাঠ, সেই নীলাকাশ, মাঠের মধ্যে দ্বারবাসিনীর কামারদের কাটানো বড় দীঘিটা, সবই সেই আছে—

কিন্তু মালতীর মুখের একটি কথায় সব এত সুন্দর, এত অপরূপ, এত মধুময় হয়ে উঠল কেন ?' (দৃষ্টিপ্রদীপ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৪৩)।

এর পরে জিতুর অনুভূতি 'ঠিক সেই অদ্ভুত রাত্রিটির মত', যেদিন সন্ধ্যার সৌন্দর্যে শূন্যপথে অদৃশ্য চরণে দেবতার ছায়া মনে নেমেছিল। 'অনুভূতি হিসেবে দুই-ই এক। কোন প্রভেদ নেই।' (দৃষ্টিপ্রদীপ, পৃঃ ১৪৩)। জিতুর মনের অপূর্ব ভাবকে 'আনন্দও বলতে পারি, প্রেমও বলতে পারি, ভক্তিও বলতে পারি। তার মধ্যে ও তিনটেই আছে।' (দৃষ্টিপ্রদীপ, পৃঃ ১৬৬)। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে জিতু বলেছে, 'ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকার ভক্তির প্রকৃতি মালতীর প্রতি আমার ভালবাসার চেয়ে পৃথক নয়। কোন পার্থক্য নেই। একই অনুভূতি—দুটো আলাদা আলাদা নাম মাত্র।' (দৃষ্টিপ্রদীপ, পৃঃ ১৬৭)।

দেবতাকে প্রিয় এবং প্রিয়কে দেবতায় রূপান্তরিত করবার যে ঐতিহ্য আমাদের দেশজ, এবং যা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নতুন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত, তারই অনুসরণ যেন বিভূতিভূষণেও শোনা যায়। এই যোগসাধনের অনুভূতি 'দৃষ্টিপ্রদীপ' ছাড়াও বিভূতি-সাহিত্যের অন্যত্র ছড়িয়ে আছে। শেষ জীবনে বৈকুণ্ঠলোক ও মর্ত্যলোকের স্বাদকে সম্মিলিত করবার চেষ্টায় যে বই লিখেছিলেন (দেবযান) তাতেও এর পরিস্ফুট স্বাক্ষর আছে। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' বইটির মধ্যে এই 'দেবযান' যাত্রার ইঙ্গিত আছে। 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র প্রেম-জ্যোতি মর্ত্যলোকেই উদ্ভাসিত হয়েছিল,—বিভূতিভূষণ তাতে তৃপ্ত হতে পারেন নি। তাই পরবর্তী উত্তরণ একেবারে দেবলোকে। 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র শেষপাতায় রয়েছে এই বর্ণনা: 'মালতীও চলে গিয়েছে কত দিন হল, পৃথিবী ছেড়ে কোন প্রেমের লোকে, নক্ষত্রদের দেশে, নক্ষত্র-দের মতই বয়সহীন হয়ে গিয়েছে।" সেই প্রেমলোক নক্ষত্রদেশের কথাই 'দেবযান'। মর্ত্যের ধূলোবালির ছোঁয়া যাতে একবিন্দুও

না লাগে এমন মানস-আদর্শজগতের কাহিনী এটা। তাতে ধুলো লাগেনি সত্যি, কিন্তু মাটি-মার রসের যোগানও যেন স্তিমিত, তাই অপূর্ণতা সত্ত্বেও জিতু-মালতীর প্রেম মনে যতটা দাগ রাখে যতীন-শান্তির খুঁতহীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত প্রেম তা রাখে না।

বিভূতিভূষণে প্রেম বিদেহ। মনোলোকে স্নিগ্ধ ভাবকল্পনার কলাপ-বিস্তার, সেবা ও শান্তি তাঁর প্রেমের অনুষঙ্গ। তাঁর অবৈধ প্রেমও এর ব্যতিক্রম নয়। সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেম নিষেধের ফলেই উদ্দাম, অতি উন্মুখ, প্রচণ্ড-গতি, প্রলয়ংকর ; এ প্রেমের প্রকৃতিই অবাধ্য একগুঁয়েমি। কিন্তু বিভূতিভূষণে এ প্রেমও আশ্চর্য পোষ-মানা আনুগত্যে সংযত। অসুস্থ উন্মত্ত উত্তেজনা দূরে থাক, উত্তপ্ত প্রেম-কামনার স্পর্শও তাতে নেই। গয়ামেম ও বড় সাহেবের প্রেম, কিংবা গয়ামেমের জন্য প্রসন্ন আমীনের প্রেম (ইছামতী) অসামাজিক হয়েও অনুত্তেজক। উভয় ক্ষেত্রেই প্রেম দেহকে অতিক্রম করে ভাবজগতে উত্তীর্ণ।

অপু-লীলার প্রেমও সমাজ-নিষিদ্ধ এবং শ্রেণীভেদের প্রাচীরও তাদের মধ্যে দুস্তর। কিন্তু নিষেধ বা ভেদের বাধা তাদের প্রেমে তীব্র ঘূর্ণি তোলেনি। মধুর করুণ মৃদুচ্ছন্দ রাগিনীর আলাপ তাদের সম্পর্কের তারে। সে-সম্পর্ক অদৈহিক অমৃতলোক-যাত্রী। সে প্রেমসম্পর্ক ভাবলোকের এত উঁচু-সুরে বাঁধা, এবং এত নিরঙ্কুশ যে অপর্ণা-প্রসঙ্গও সেখানে কোন সংঘাত জাগায় না।

'বিপিনের সংসার'-এ পরকীয়া প্রেমের সংখ্যা—চার। বিপিন ও মানী, বিপিন ও শান্তি, বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্যে ও কামিনী গোয়ালিনী, বিশ্বেশ্বর মাষ্টার ও বাগ্‌দী বিধবা। পটল ও বীণার প্রেমও গ্রামীণ সমাজের বিধি-বহির্ভূত। নিষেধের ফলেই এই ধরণের প্রেমে একটা দুর্বারতা ও তীব্রতা থাকার কথা ছিল। কিন্তু এই পাঁচটির একটিতেও সে-জাতের কিছু নেই। সবগুলিই বিভূতি-সুলভ

স্নিগ্ধতা, কারুণ্য ও মাধুর্যের স্বাক্ষরবাহী; এবং অদৈহিক। এতগুলি অসামাজিক প্রণয়ের একটিতেও সর্বনাশের বিশেষ আঁচ লাগেনি। তাঁর প্রেমের আগুনে দাহ নেই, শুধু আলো। প্রেমের ব্যর্থতা যন্ত্রণার সৃষ্টি করে না বিশেষ, মনে ভাবরসে জারিত হয়ে করুণ-মধুর রসের সৃষ্টি করে।

বিভূতিভূষণের কাছে শোনা গেল যে বিপিন তাড়িখোর, দেহ-বুভুক্ষু ও লম্পট। এ অংশ আমাদের দেখানো হয়নি, শোনানো হয়েছে অতীতের স্মৃতি বা মানীর কাছে বিপিনের স্বীকৃতি হিসেবে। মানীর সঙ্গে প্রেম-সম্পর্কে কিন্তু বিপিনের চেহারা সম্পূর্ণ অন্য। মানীর প্রেম অনুভব করবার পর 'একটি অদ্ভুত মনের ভাবের সহিত বিপিনের পরিচয় ঘটিল আজ হঠাৎ এই মাঠের মধ্যে। মানীর সঙ্গে ভাল-বাসার যে সম্পর্ক তাহার গড়িয়া উঠিয়াছে, এতদিন অন্তত বিপিনের মনের দিক হইতে তাহা দেহসম্পর্কহীন ছিল না, মনে মনে মানীর দেহকে সে বাদ দিতে পারে নাই। বিপিনের স্বভাবই তা নয়। সূক্ষ্ম মানসিক স্তরের আদানপ্রদান তাহার ধাতুগত নয়। মানীর সম্বন্ধে এ আশা বিপিন কখনই ছাড়ে নাই যে, একদিন না একদিন সে মানীকে নামাইবে তাহার নিজস্ব নিম্নস্তরে। সুবিধা সুযোগ এখন নাই বলিয়া ভবিষ্যতেও কি ঘটিবে না?

'আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, মানীর সহিত তাহার সম্বন্ধ অন্য ধরণের। মানী তাহাকে যে স্তরে লইয়া গিয়াছে, বিপিনের মন তাহার সহিত পরিচিত ছিল না। অনেক মেয়ের সঙ্গে বিপিন মিশিয়াছে পূর্বে অন্যভাবে। মন বলিয়া জিনিষের কারবার ছিল না সেখানে।'

লেখকের এত কথা বলা বোধহয় আবশ্যক ছিল না। মানীর দেহের প্রতি বিপিনের লোভ লেখকের উক্তিতে মাত্র বিবৃত, বিপিনের চরিত্র-ঘটনায় তা স্বীকৃত নয়। লেখকের এই উক্তি পড়ে

পাঠক বরং হঠাৎ বিস্মিত হয়—এমন লোভও বিপিনের ছিল নাকি! কারণ বিপিন বরাবরই 'সূক্ষ্ম মানসিক স্তরের' প্রেমিক হিসেবে পাঠকের কাছে প্রতিভাত।

বস্তুত, 'সূক্ষ্ম মানসিক' ছাড়া অন্য কোন স্তরের প্রেমকে বিভূতিভূষণ বর্ণনা করতেই পারেন না। বর্ণনা করতে চানও না, তাঁর মনোধর্মের সায় নেই অন্যত্র। 'সূক্ষ্ম মানসিক স্তর'-এর প্রেম তাঁর কল্পনাশক্তিকে উজ্জীবিত করে। বিপিনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। এমন কি, বিপিনেরও নারীপ্রেম প্রকৃতিপ্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যখন বেলা পড়ে রাঙা রোদ কতক জলি ধানের বিস্তীর্ণ ক্ষেতে, কতক বিলের বাবলা-বনে পড়ল, আইনদ্দির নাতি বিলের ওপরের ডাঙায় কুমড়ো ক্ষেত থেকে সুকণ্ঠে গান ধরল, 'যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি, ও মোর মনে জাগে তার লয়ান ছুটি' * তখন সেই গান শুনে 'বিপিন আবার অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সেই দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ, বিল ও বিলের ধারে ধারে সবুজ জলি ধানের ক্ষেত, উপরে এবং নীচে নাচের ধরনে উড্ডীয়-মান বাবুই পাখীর ঝাঁক, বিলের ধারের জলে শোলাগাছের হলদে ফুলের রাশি, হরিদাসপুরের বাঁশবনের মাথায় হেলিয়া-পড়া অস্তমান সূর্য, সব মিলিয়া তাহার মনে এক অপূর্ব ব্যথাভরা অনুভূতির সৃষ্টি করিল। যেন মনে হইল, মানীকে এ জগতে বুঝিবার ভাল-বাসিবার লোক নাই। মানী যাহার হাতে পড়িয়াছে, সে মানীর মূল্য বোঝে নাই। মানীর জীবনকে ব্যর্থতার পথ হইতে যদি কেহ রক্ষা করিতে পারে, তাহার মুখে সত্যকার আনন্দের হাসি

* গানের এই লাইন দু'টি দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কেও আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নীলদর্পণের ঘটনাস্থল এবং বিভূতিভূষণের জন্মস্থান খুব কাছাকাছি। হয়তো এটি ওখানকার লোকপ্রচলিত কোন গান।

ফুটাইতে পারে, তবে সে বিপিন নিজেই। বিস্তীর্ণ সংসারে মানী হয়তো বড় একা, যেমন সে নিজেও আজ একা। সে মাত্র এইটুকু অনুভব করিল, মানী ছাড়া জগতে আর কেহ আজ যদি তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়ায় তাহার মনের এ শূন্যতা পূর্ণ হইবার নয়। . যে কোন কথাই সেই একটি মাত্র মানুষের কথা মনে আনিয়া দেয়—'

এ অবৈধ প্রেমে আকর্ষণের অতি-তীব্রতা নেই, প্রচণ্ড শিহরণ নেই, শিরায় শিরায় উন্মত্ত তাণ্ডব আবর্ত নেই। সারা বিশ্বের সঙ্গে এ প্রেম একাত্মতা এনে দেয়; প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে যে জগৎ চোখের সমুখে পরিব্যাপ্ত সেই জগতের সঙ্গে প্রেমিকসত্তা একীভূত হয়ে যায়, সর্বত্র দেখে ·সে প্রিয়ার স্মৃতিস্বাক্ষর। এ প্রেম সমাজের বাঁধা খাতের বাইরে বয়েও প্লাবন আনে না উন্মত্ত পদক্ষেপে। এ প্রেম কোন অগ্নিকাণ্ড ঘটায়নি বিপিনের জীবনে বরং তার স্নিগ্ধ আলোকে 'বিপিনের মনের ঘুম ভাঙাইয়াছে মানী। সে সোনার কাঠি ছিল মানীর কাছে।'

সেই সোনার কাঠির ছোঁয়ায় বিপিন সব কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছে। মনের অন্ধকার ঘুচেছে তার। সকল অবনতি থেকে আত্মরক্ষা করে উন্নতির শীর্ষলোকে যাত্রা করছে সে। প্রেমের এই মহত্ব-বিধায়ক শক্তি সম্পর্কে বিভূতিভূষণ অত্যন্ত নিশ্চিত, এবং প্রেমের এ বিশিষ্টতা ঘোষণায় ক্লান্তিহীন। মানীর প্রেম বিপিনকে প্রজাপীড়নের পথ ছেড়ে আর্তসেবার পথে যেতে বলেছে। 'মানী তাহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে, যে পথে গেলে অর্থ ও পুণ্য দুইই মিলিবে। গরিব প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া, তাহাদের রক্ত চুষিয়া তাহার বাবা এবং মানীর বাবা দুইজনেই ফুলিয়া ফাঁপিয়া মোটা হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা সে পাপ পথে চলিবে তো নাই-ই, বরং পিতৃদেবের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিবে

নিজেদের দিয়া। মানী তাহাকে জীবনে আলো দেখাইয়াছে।' *

আর্তসেবার মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করাই শুধু নয়, মানীর প্রেম বিপিনকে তার দৈনন্দিন ছোটখাট সব বিচ্যুতি থেকেও রক্ষা করে। সামনাসামনি অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মানী যেন তার বিবেক-রূপে তার মনোগহনে নিত্য আসীন। আজ একটু খেজুর-রস চুরি করে খেলেও বিপিন ভাঁড়ের মধ্যে পয়সা রেখে আসে। তার মনে হয়, 'চুরি সে করিতে পারিবে না। মানীর কাছে দাঁড়াইতে হইবে তাহাকে, চোরের বিবেক লইয়া দাঁড়াইতে পারিবে সেখানে?'

মানীর প্রেমের এই প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তার পরিচয় পাওয়া যাবে স্ত্রীর প্রতি বিপিনের ব্যবহারের পরিবর্তনে। যে স্ত্রীকে বিপিন কোনদিন ভালবাসেনি, তার প্রতিও একটা সদয় মমত্ববোধ জেগেছে তার এই প্রেমের প্রভাবে।

---

* প্রজাশোষণের বিরুদ্ধে লেখকের এই মনোভাব 'আরণ্যকে'ও বিক্ষিপ্তভাবে আছে। এই ধবণের আধুনিক যুগচিন্তাব কিছু পরিচয় কতগুলি ছোট গল্পেও রয়েছে।

'কযলা ভাঁটা' (গল্প-পঞ্চাশৎ) গল্পে লেখক নিপুনভাবে স্বর্ণলোভী ব্যবসাযীর মুখোস খুলে ধবেছেন; তারা কিভাবে শঠ উপায়ে সরল নির্বোধ কুলিদের শোষণ করে তারও চমৎকার চিত্র আছে গল্পটিতে। কিন্তু গল্পটি শেষ হযেছে অত্যন্ত হতাশভাবে। লেখকের মনোভাবটা এমন যে এসব সরল নির্বোধ কুলিদের উন্নতিসাধন করা একেবারে অসম্ভব। এরা উপকারীকে বোকা ভাবে। (শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজে'র রমেশের অভিজ্ঞতা স্মরণীয।) লেখক হতাশ হয়ে স্বর্ণলোভীদের জয়ধ্বনি দিয়ে গল্প শেষ করেছেন: 'যাবা সত্যিই ঠকেছে এ ব্যাপারে তারা পরের পাঁচ ছ' দিন ধরে আমাকে দেখলেই হাসে, গা ঠেলাঠেলি করে পবস্পরের, যেন আমাকে তারা খুব বোকা বানিয়েছে। ... এ সরলা বঙ্গবালাদের আমি কি বোঝাব? দেবেন মাইতির জয় হোক, মাঠাবুরুর কয়লাভাঁটার মহাজন বলরামপুরের বিরিঞ্জলাল ঘনশ্যাম দাসের সাড়ে তেত্রিশ পার্সেন্ট মহাজনির জয় হোক।' (পৃঃ ১০৭)

অপু কঠোর দারিদ্র্যের সময় একটা ষ্ট্রাইকের জায়গায় কাজ পেল। কিন্তু পরে ভাবল, 'ওরা একটা সুবিধা আদায় করবার জন্য ষ্ট্রাইক করেছে। ছ'মাস তাদের ছেলে-মেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। তাদের মুখের ভাতের থালা কেড়ে খাবো শেষ কালে?' (পৃঃ ১৭২)

'বিপিনের সংসারে'র অন্যান্য প্রেম-সম্পর্কগুলির স্বাদ কমবেশী প্রায় একই রকম। বিশ্বেশ্বর প্রেমের জন্য সর্বস্বত্যাগী হয়েছে। কুলটা কামিনী গোয়ালিনীর প্রেমও লালসা বা বিলাস নয়, মৃত বিনোদ চাটুজ্যের স্মৃতির প্রতি তার মমতা এবং বিনোদ-পুত্র বিপিনের প্রতি তার প্রগাঢ় বাৎসল্য চরিত্রহীনা গোয়ালিনীকেও 'সূক্ষ্ম মানসিক স্তরে'র ঊর্ধ্বলোকে তুলে এনেছে। বীণা তার রুদ্ধ জীবনের হাহাকার বুকের মধ্যে চেপে রেখেছে, কোন অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে নিজের জ্বালাকে নিঃশেষে ভুলতে চায়নি।

শেষ জীবনের লেখা 'দেবযানে'ও এই 'স্বর্গীয়' প্রেমকে একেবারে স্বর্গলোকে স্থাপন করেই দেখবার চেষ্টা করেছেন বিভূতিভূষণ। তাঁর শেষ রচনা 'শেষ লেখা'-ও (কুশল পাহাড়ী) কামনাময় জীবন থেকে 'প্রজ্ঞা-বিমুক্তি' লাভের উপকথা।

সংক্ষেপে বললে, বিভূতিভূষণ প্রেমের যে-রূপ অনুভব করেছিলেন তা হচ্ছে শান্ত, স্নিগ্ধ, স্থূলত্ববর্জিত, কল্পনাজীবী, দেহহীন, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত, মহত্ব-বিধায়ক। বলা বাহুল্য, প্রেমের এটা এক দিককার রূপ। এই রূপের ঘোর তাঁর মনে মোহের সঞ্চার করত, প্রেমের আর অন্য কোন রূপ দেখতে দিত না। ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রেমের বিচিত্রতার সন্ধান করেননি তিনি, ভাবুক হিসেবে যে-প্রেমকে তিনি একতম বলে মনে করেছিলেন, তার সুর বাজিয়ে তোলাই তাঁর একতারার প্রয়াস।

উপসংহারে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে প্রেম-সম্পর্ককে পর্যবেক্ষণ করা আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যের বিশেষ ঐতিহ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক নবচেতনার প্রেক্ষাপটে আমাদের উপন্যাসের জন্ম।

সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসম্পর্কে'র যে রূপান্তর ঘটতে সুরু করেছিল, তার ছাপ উপন্যাসের জন্মক্ষণ থেকেই আছে।

নরনারীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক সামন্ততান্ত্রিক প্রথাবদ্ধতার স্তরকে অতিক্রম করে নতুন ধনবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্তরে উত্তরণের জন্য যে প্রচেষ্টা সুরু করেছিল, তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ-মুখরিত পদক্ষেপটিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার প্রয়াস পেয়েছেন আমাদের কৃতী ঔপন্যাসিকরা—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। তাঁরা প্রেমসম্পর্কের নূতন ধরণটিকে ভাল করে বোঝবার ও বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টার জের রবীন্দ্রোত্তর ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু বিভূতিভূষণ এই দৃষ্টি দিয়ে প্রেম-সম্পর্ককে দেখেননি। নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যা সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ বিশেষ সচেতন ছিলেন না। প্রেম-অনুভূতির রোমান্টিক মাধুর্য তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য।

সামান্য দু' একটি ক্ষেত্রেই মাত্র এর ব্যতিক্রম বার করা চলে—যেখানে প্রেমে রোমান্টিক মাধুর্যের বদলে অন্য কোন বিষয় দেখা দিয়েছে। তবে এগুলি ব্যতিক্রম হিসেবেই মাত্র উল্লেখযোগ্য; সাহিত্যিক সাফল্যের স্বাক্ষর বা লেখকের মনোধর্মের ইঙ্গিত এগুলি বহন করে না। যেমন, 'অভয়ের অনিদ্রা' গল্পটিতে (গল্প-পঞ্চাশৎ) অভয়-বকুলের দাম্পত্য সম্পর্ক অভয়ের কার্পণ্য দ্বারা খণ্ডিত। বকুলের মৃত্যুতে যত না শোক সে পেয়েছে, তার চেয়ে অনেক বড় শোক পেয়েছে বকুলের সঙ্গে এক আনা সোনার দুল ভস্মীভূত হয়েছে বলে। আর স্ত্রী-বিহন সংসারে ঝির জন্যেও মাসে অন্তত দশটা টাকা ব্যয় করতে হবে, তার শোকই কি কম! সেই জন্য সারারাত অভয়ের ঘুম হোলো না। 'স্ত্রীর মৃত্যু সে সহ্য করিতে পারে! কিন্তু এই লোকসানের আঘাত সে ভুলিবে কেমন করিয়া। সারারাত্রি সে জাগিয়া বসিয়া রহিল। স্ত্রীর মৃত্যুতে কেন সে ভাগ্যবান হইল না?' (গল্প-পঞ্চাশৎ, পৃঃ ২৭৪)।

গল্পটিতে ঈষৎ ব্যঙ্গের ভাব আছে। সেদিক থেকেও গল্পটি উল্লেখ্য।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে ব্যঙ্গের স্থান নেই বললেই চলে। (আইনষ্টাইন ও ইন্দুবালা, উড়ুম্বর প্রভৃতি দু'একটি গল্প বাদে)। এই গল্পে লেখকের ব্যঙ্গ স্বল্প-অনুভূতি অভয়ের অতিরিক্ত অর্থপ্রিয়তার বিরুদ্ধে। এই ধরণের লোকের প্রতি লেখকের বিরাগ অতি স্পষ্ট, এবং তাঁর সাহিত্যের অন্যত্রও তা দুর্লক্ষ্য নয়। অভয়ের চরিত্রে প্রেমের রোমাণ্টিক মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলেই লেখকের বিক্ষোভ ও ব্যঙ্গ।

ব্যতিক্রমের আরো দু' একটি স্বাক্ষর পাওয়া যাবে বিভূতিভূষণের ছোট গল্পে। (বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'ছোট গল্প' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। উপন্যাস তাঁর মূল ধারার বাহক, ব্যতিক্রমের নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

অপূর্ব-চরিত-মানস

॥ এক ॥

॥ ভূমিকা ॥

উপন্যাস চরিত্রমুখ্য। কর্মলোক ও মনোলোকে মানুষ কেমন, সেই বিচিত্র রূপের পরিচয় দিতে চায় উপন্যাস। সেদিক থেকে উপন্যাস-সাহিত্য এক বিরাট চরিত্র-প্রদর্শনী। এর বিরাটত্ব শুধু সংখ্যায় নয়, বৈচিত্র্যে এবং ব্যক্তিস্বকীয়তায়।

এই প্রদর্শনশালায় বিভূতিভূষণের দান সংখ্যার দিক দিয়ে স্বল্প নয়, কিন্তু বিচিত্রতার দিক থেকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাঁর প্রধান নায়ক-চরিত্রগুলিকে একটু নজর করে দেখলে এই কথার সত্যতা বোঝা যাবে। তারা প্রায় সকলেই কল্পনাপ্রবণ, ভাবুক, প্রকৃতি-প্রীতিসম্পন্ন, সংবেদনশীল এবং মোটামুটিভাবে রোমান্টিক প্রকৃতির। শিশু-কিশোর-যুবক অপু নিশ্চয়ই এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। কিন্তু আদর্শ হিন্দু হোটেলে রন্ধনরত পাচক ব্রাহ্মণ হাজারী ঠাকুর, সন্ন্যাসী-গৃহী ভবানী বাঁড়ুজ্যে, বা জমিদারী সেঁরেস্তার কর্মচারী বিপিনও এর ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষাদীক্ষা ও পরিপার্শ্বের তারতম্য আছে। কিন্তু তা সবটুকুই বাইরের, ভেতরে এরা এক। এদের সম্পর্ক দূর জ্ঞাতি-সম্পর্কও নয়, একই ব্যক্তির বিভিন্ন বেশবিন্যাস মাত্র। অনেক কাঁচা অভিনেতা যেমন বিভিন্ন পোষাক পরে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেও নিজেদের ব্যক্তিভঙ্গি বর্জন করতে পারে না, বিভূতিভূষণও তাঁর বিশেষ মানসভঙ্গি বর্জন করেননি তাঁর চরিত্রগুলিতে। ফলে তারা যে নামেই দাঁড়াক, দেখা যায় বিভূতি-

ভূষণকে। ঐ কাঁচা অভিনেতার অভিনয়ের প্রথম দৃশ্যেই যেমন দর্শক বলে ওঠে, 'ঐ অমুক অভিনেতা', ভূমিকার কথাটা ভুলে যায়, তেমনি এই চরিত্রগুলোর ব্যাপারেও পাঠক সেই বিশেষ চরিত্রকে দেখে না, দেখে বিভূতিভূষণ ঐ চরিত্র মারফত নিজের রস-পিপাসা কেমন ভাবে চরিতার্থ করছেন। অন্য ঔপন্যাসিক মানুষের চরিত্র-বৈচিত্র্যের সীমাহীনতাকে উদ্‌ঘাটিত করতে ব্যস্ত—সেখানে তারা বৈজ্ঞানিক; বিভূতিভূষণ নিজের বিশিষ্ট মনকে প্রকাশিত করতে ব্যস্ত—তিনি আত্মমুখী ভাবুক। এই আত্মপরায়ণ কল্পনাশক্তি বাহ্যজগতের বিচিত্র মানুষকে প্রকাশ করেনি, স্বীয় আন্তর জগতের এক এবং অদ্বিতীয় পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছে।

এই জন্যে অপু-জিতুই মাত্র 'সূক্ষ্ম মানসিকতা'র অধিকারী নয়, প্রায় প্রতিটি পুরুষ চরিত্রই তাই। নিজের হোটেল হলে হাজারী ঠাকুর কি কি সুন্দর ব্যবস্থা করবে, তার স্বপ্নময় কল্পনা রচনা করে পাচক-ব্রাহ্মণ। বিপিন বৈদেহী প্রেম সম্পর্কে সূক্ষ্ম চিন্তা করতে পারে, প্রকৃতি-সৌন্দর্যে অভিভূত হয়; যে বৌকে সে ভাল বাসে না, তার সম্পর্কেও সংবেদনশীলতার অভাব নেই তার।

এরা উপন্যাসের নায়ক। এদের পাশেই যদি মিলিয়ে দেখা যায় 'তৃণাঙ্কুর,' 'স্মৃতির রেখা' প্রভৃতি ডায়রীর নায়ককে, তবে চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে কোন পার্থক্য লক্ষিত হবে না দুই শ্রেণীর নায়কে। আর আরণ্যক—যেটিকে ডায়রী নয়, উপন্যাস বলে আগেই চিহ্নিত করেছেন, বিভূতিভূষণ সেই গ্রন্থের 'আমি' নামক চরিত্রটি লেখক না নায়ক? নিঃসন্দেহে উভয়ই।

এই আত্মমুখী ভাবুকতার জন্য বিভূতিভূষণের মানুষে এ-কালীন অস্থিরতা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, অর্থলোভ নেই, যশ মান প্রতিপত্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। তারা তুচ্ছ ক্ষুদ্র সরল সাধারণ জীবনের মধ্যে পরম ঐশ্বর্যকে আবিষ্কার করেছে। তারা সেই বাদশাজাদার মত জেনেছে যে

স্বর্ণাভরণের চেয়ে কুসুমাভরণের মূল্য বেশী—তারা প্রলোভনের ঊর্ধ্বে।

এই আত্মপরায়ণতার জন্যই তাঁরা সাহিত্যে রুদ্র চরিত্র নেই। প্রকৃতির রুদ্ররূপে তাঁর অনাসক্তি, মানুষেরও চণ্ডরূপে তাঁর অনাগ্রহ। তাঁর 'ভিলেন' বড় জোর আরণ্যকের সেই পিকনিক-পার্টি, যারা অরণ্যে এসেও প্রকৃতির দিকে না তাকিয়ে শুধু খাদ্যের দিকেই তাকিয়ে ছিল। রাজারাম রায় (ইছামতী), রাসবিহারী সিং (আরণ্যক) বা নন্দলাল ওঝা (আরণ্যক) প্রভৃতি চরিত্রগুলির ভিলেন হিসেবে যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু লেখক সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি, বরং ঘৃণাভরে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিয়েছেন।

সব্‌জেকটিভ্‌ চিন্তা শরৎচন্দ্রের চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রবল; তাঁর অধিকাংশ পুরুষ চরিত্রগুলিই প্রায় এক—আত্মভোলা, উদাসীন, নিষ্ক্রিয়। রবীন্দ্রনাথেরও উপন্যাসে নারী-চরিত্রগুলি দুই-নারী-তত্ত্বের বাইরে বড় একটা যেতে চায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রাঙ্কনেও সব্‌জেক্‌টিভ্‌ চিন্তা অনুপস্থিত নয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে বঙ্কিমে তবু অব্‌জেক্‌টিভ্‌-ভিত্তিতে চরিত্র অঙ্কনের প্রয়াস আছে, যে জন্যে তাঁর চরিত্রে কিছুটা বৈচিত্র্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথে এর চেয়ে কম। শরৎচন্দ্রে এই প্রয়াস অত্যন্ত স্বল্প। বিভূতিভূষণে আরো কম। বাংলাসাহিত্যের চরিত্রসৃষ্টিতে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটবার এটি একটি প্রধান কারণ—এই অতিরিক্ত সব্‌জেক্‌টিভ্‌ চিন্তা।

বিভূতিভূষণ তাঁর গ্রন্থে এমন লোক সাধারণত নির্বাচন করতে চান যা তাঁর মনোভঙ্গির সঙ্গে খাপ খায়। এই নির্বাচন-কুশলতার জন্য তাঁর চরিত্রগুলি বিভূতিভূষণের মনের ছাপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও বিশেষ একটা মাটির রূপ-রস-গন্ধ থেকে বিচ্যুত হয় না। চরিত্র-নির্বাচনের এই কৌশলে তিনি সবজেক্‌টিভ-অব্‌জেক্‌টিভের দ্বন্দ্ব অনেকটা এড়িয়ে গেছেন, যে দ্বন্দ্ব বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরতের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশী।

চরিত্রক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের বৈচিত্র্য নেই, কিন্তু নানা নামে যে একটি

মানুষকে তিনি দেখাতে চেয়েছেন তার মৌলিকতা অনস্বীকার্য। এ কালের একজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক, সমারসেট মম বলেছেন যে, সাহিত্যে মৌলিক চরিত্রের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প; খাঁটি মৌলিক চরিত্র সৃষ্টির চেয়ে কঠিন কাজ আর কিছু নেই। তাঁর মতে যে কোন লেখক একটিমাত্র সঠিক মৌলিক চরিত্র সৃষ্টি করেও কালজয়ী হতে পারেন। উদাহরণ দিয়েছেন ডন কুইক্‌সোটের চরিত্র (Ten Novels and Their Authors, Introduction)। বিভূতিভূষণও অ-পূর্ব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, সে-গৌরব তাঁর প্রাপ্য।

মম্‌ ঐ প্রসঙ্গেই বলছেন যে, তাঁর ধারণা জলজ্যান্ত কোন মানুষের মডেল সামনে না দেখলে মৌলিক চরিত্র সৃষ্টি দুরূহ, প্রায় অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে জীবন্ত একটি মডেল বিভূতিভূষণ পেয়েছিলেন, সে-মডেল তিনি স্বয়ং।

নিজের চরিত্রকে রূপায়িত করবার প্রধান বাধা আত্মসচেতনতা। এটিকে তিনি অতিক্রম করেছেন প্রধানত দুটি পথে। প্রথমতঃ 'আরণ্যক' ছাড়া কোথাও 'আমি' নেই। ফলে পরোক্ষে অন্যের জবানীতে নিজের কথা বলা গেছে। অন্য নামের চরিত্রগুলিই আবরণের কাজ করেছে; তাঁকে সচেতন হয়ে পড়তে হয়নি। দ্বিতীয় উপায় তাঁর আত্মভাবমুগ্ধ লিরিক্যাল মন। এই ভাবতন্ময়তার মুহূর্তে সচেতনতা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে যায়, এবং লেখক চোখ বুঁজে মনের গভীর থেকে মণি-মুক্তা সংগ্রহ করে আনেন। তাঁর লেখার ষ্টাইল্‌-ই ভাবতন্ময়— এক অতল স্মৃতির সাগরে মন যেন মৃদু লয়ে রোমন্থনে ব্যাপৃত।

বিভূতিভূষণের নারীচরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁদের স্নিগ্ধ মাতৃত্ব। স্নেহপরায়ণ মাতৃত্বই এই চরিত্রগুলির মুল উপাদান। সরল মমতাময়ী, সংসারী, দ্বন্দ্বহীনা, একনিষ্ঠা বাংলাদেশের মেয়ে তাঁর উপন্যাসের চিরন্তনী নায়িকা। পরিপার্শ্ব-ভেদে বাহ্য সাজ-পোষাকের কিঞ্চিৎ

তারতম্য থাকলেও ভেতরে তারা এক। সর্বজয়া-অপর্ণা থেকে তিলু পর্যন্ত সকলেই এর সাক্ষ্য দিতে পারে। 'বল্লালী-বালাই' পর্বে ইন্দির ঠাকরুণের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহারটুকু সর্বজয়াকে কিঞ্চিৎ বিশিষ্টতা দিয়েছে। অপর্ণাকে তো ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন সর্বজয়ারই 'একটা তরুণ সংস্করণ—সেবানিপুণতা, মঙ্গলাকাঙ্খা, গৃহস্থালীর কল্যাণ-সাধন, দুঃখে সহানুভূতি, একটু মৃদু কৌতুকমণ্ডিত হাস্য-পরিহাস এ সমস্ত বিষয়েই তাহার মাতা ও স্ত্রী এক।' লীলা তার আধুনিক শিক্ষা আভিজাত্য ও মর্মান্তিক মৃত্যু সত্ত্বেও এদেরই দলের মেয়ে। এমন কি বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুলটা-চরিত্রগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। তারাও সবাই 'সতী-সাধ্বী', একনিষ্ঠ, এবং স্নিগ্ধ সারল্যের প্রতীক, 'ইছামতী'র গয়ামেম থেকে 'বিপিনের সংসারে'র অবৈধ প্রেমের একাধিক নায়িকারা সর্বজয়া-অপর্ণা-তিলুর সঙ্গে সমাজে যত ব্যবধান রেখেই বসুক না, মনের ক্ষেত্রে তাদের আসন খুব দূরে নয়।

তাঁর এই সকল নারীচরিত্রের এই সমধর্মিতার কথা বিভূতিভূষণও হয়ত বুঝতেন, এবং অপুর জবানীতে একবার তার কারণ বিশ্লেষণও করবার চেষ্টা করেছেন: 'সে (অপু) এই মঙ্গলরূপিণী নারীকেই সারাজীবন দেখিয়া আসিয়াছে—এই স্নেহময়ী করুণাময়ী নারীকে—হয়ত ইহা সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, নারীর সঙ্গে তার পরিচয় অল্পকালের ও ভাসা-ভাসা ধরণের বলিয়া—অপর্ণা দুদিনের জন্য তার ঘর করিয়াছিল—লীলার সহিত যে পরিচয় তাহা সংসারের শত সুখ ও দুঃখ ও সদাজাগ্রত স্বার্থদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া নহে—পটেশ্বরী, রানুদি, নির্মলা, নিরুদি, তেওয়ারী বধূ—সবই তাই।' (অপরাজিত, চতুর্থ সংস্করণ পৃঃ ৩৯৮)।

কিন্তু অপু (তথা বিভূতিভূষণ) এতেই খুশী; নারীর অন্য কোন রূপ সে দেখতে চায় না, পাছে কোন মালিন্য দেখতে হয় এই তার ভয়, আর ভয় বন্ধনের। ঐ প্রসঙ্গেই অপু বলেছে,...'অপু

দুঃখিত নয়—তাই ভালো, এই স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া বেড়ানো ভবঘুরে পথিক-জীবনে সহচর-সহচরীগণের যে কল্যাণপাণি ক্ষুধার সময় তাহাকে অমৃত পরিবেশন করিয়াছে—তাহাতেই সে ধন্য, আরও বেশী মেশামিশি করিয়া তাহাদের দুর্বলতাকে আবিষ্কার করিবার সখ তাহার নাই—সে যাহা পাইয়াছে, চিরকাল সে নারীর নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে ইহার জন্য।' (অপরাজিত, পৃঃ ৩৯৯)

'পথের-পাঁচালী' ও 'অপরাজিতে'র নারীচরিত্রগুলিতে এই কৃতজ্ঞতার ঋণ-শোধের প্রয়াস অত্যন্ত স্পষ্ট, পরের রচনাগুলিতেও দুর্লক্ষ্য নয়। তার কারণ বিভূতিভূষণের মন বদলায়নি, তিনি অপু-পর্বে যা ছিলেন, বরাবরই তাই রয়ে গেছেন।

আর লক্ষণীয়, মুখ্যত নারীচরিত্রের কথা বলতে গিয়েও 'সহচর'-দের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বিভূতিভূষণের 'পথিক-জীবনে' সহচরদের সঙ্গেও পরিচয়টা 'ভাসা-ভাসা ধরণের' এবং তাদের কাছ থেকে অমৃত পেয়ে তিনি ধন্য, আরও বেশী মেশামেশি করে তাদের দুর্বলতাকে আবিষ্কার করবার সখ তাঁর নেই।

মানুষের গভীর ও বহুমুখী পরিচয় পেতে হলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হয়। কিন্তু তাতে নির্জনতা-প্রেমিক বিভূতিভূষণের অনিচ্ছা। তিনি বন্ধনভীরু পথিক, ঘনিষ্ঠতার বাঁধন সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তে তাঁর আশঙ্কা ; তাই তিনি কোন মানুষের সঙ্গে ত্রিরাত্রি বাস করে তার আত্মজন হয়ে যেতে চান না। সেই আত্মীয়তা তাঁর সুদূর-পিয়াসী প্রাণবিহঙ্গকে শৃঙ্খলিত করতে পারে, এই তাঁর ভয়। অপু বিবাহকে ভাবে 'সোনার শিকল' (অপরাজিত, পৃঃ ১৮৮), 'সকল প্রকার বন্ধনকে সে ভয় করে।' (ঐ, পৃঃ ১৮০)। এ বন্ধনভীতি শুধু অপুর নয়, বিভূতিভূষণেরও।

দ্বিতীয়ত, তিনি মানুষের কোন মালিন্য দেখতে চান না, তাতে তাঁর সৌন্দর্য-পিপাসু মন আঘাত পায়। কিন্তু এই আঘাত থেকে মনকে বাঁচানো যাবে কি করে—কোন মানুষই তো নিরঙ্কুশ মালিন্যমুক্ত নয়।

তাই লেখক ঐ 'ভাসা-ভাসা' পরিচয়ের অমৃতে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করে মনের সৌন্দর্য-পিপাসাকে তৃপ্ত করতে চান এর চেয়ে কোন বেশী পরিচয় তাঁর কাম্য নয়।

চরিত্র আলোচনায় যে detachment লেখকের কাছে কাম্য তার অভাব আছে বিভূতিভূষণে। তাঁর স্বীয় মনের মাধুরীর গুরুত্ব এতটা বেশী করে রয়েছে বলেই তাঁর নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। স্নিগ্ধ, সরল, unsophisticated, দ্বন্দ্বহীন উভয়েই। একটি জায়গায় মাত্র তাঁর নারী ও পুরুষের পার্থক্য আছে। সেটিও এসেছে বিভূতিভূষণের পরস্পর বিরোধী দুই মনোবৃত্তি থেকে। তাঁর মনের সুদূর-তৃষ্ণা (ও সেই সঙ্গে প্রকৃতিপ্রীতি) পুরুষ চরিত্রে প্রবল; এই তৃষ্ণা নারীচরিত্রগুলিতে নেই; তারা গৃহগতপ্রাণ, গৃহের স্নেহ-মমতা ও সংসারকল্যাণ তাদের কাম্য, তারা সংসারী ধরণের গুছোনো মানুষ।

বিভূতিভূষণের সুদূর-তৃষ্ণা তাকে যেমন গৃহের বাইরে এনে ফেলত, তেমনি তাঁর সংবেদনশীল মনে ঘরের ছোটখাট স্নেহ-ভাল-বাসার বিচিত্র ঐশ্বর্যের প্রতি আকর্ষণও ছিল যথেষ্ট। নিজের এই পরস্পর-বিরোধী দুটি মনোবৃত্তি যেন লেখক সমভাবে বণ্টন করে দিয়েছেন দু' ধরনের চরিত্রে—পুরুষে ও নারীতে। আর লেখকের নিজের মধ্যে যেমন এই দুটি মনোভাব মাঝে মাঝে আপোষ করেছে, চরিত্রগুলিরও কোন কোনটির মধ্যে দেখি তাই। হরিহর দশ বছর দেশান্তরী থাকবার পর সংসার পেতেছে, ভবানী পেতেছে পঞ্চাশ বছর বয়সে; গৃহবিবাগী সত্তা স্নেহের নীড়ে ডানা গুটিয়ে আপোষ করছে। আর তিলু স্বামীর হাত ধরে বৃহৎ জীবনের একটু তৃষ্ণা যেন সামান্য পরিমাণে অনুভব করেছে। দুই প্রবাহ পরস্পরের সঙ্গে মিশেছে এই সঙ্গমগুলিতে। দুই বিরোধী ধারা হয়তো অন্য লেখকের মনে তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু

বিভূতিভূষণ দ্বন্দ্বকে প্রতি মুহূর্তে এড়িয়ে একটা সামঞ্জস্যের মধ্যে জীবনকে ধরতে চান। তাঁর এই মনোবৈশিষ্ট্যের চিহ্ন এই চরিত্রগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে।

বিভূতিভূষণ তাঁর মনকে সমভাবে বণ্টন করে তাঁর নারী ও পুরুষ চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন—তাঁর সকল চরিত্র-প্রবাহের উৎস অর্ধনারীশ্বর বিভূতিভূষণের মানস-সরোবর।

'বর্ণিত নায়ক-নায়িকার পিছনে শিল্পী তার আবাল্য-দীর্ঘ জীবনের সকল সুখদুঃখ হাসিকান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪১)।—বিভূতিভূষণের এই উক্তির মধ্যে এ বক্তব্যের সমর্থন রয়েছে।

বিভূতিভূষণের কল্প-আদর্শের আলোক নারীচরিত্রের উপর পড়ে যে স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় রূপ পরিগ্রহ করত, তার উদাহরণ সমগ্র বিভূতি-সাহিত্যেই বর্ত্তমান। এখানে একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। সেটা থেকেই তাঁর মনোভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাবে। এ উদাহরণটিতেও অপুর মাধ্যমে বিভূতিভূষণকে দেখতে হবে।

অপর্ণাকে দেখে 'অপুর মনে হইল দু-একখানা প্রাচীন পটে আঁকা তরুণী দেবীমূর্ত্তির, কি দশমহাবিদ্যার ষোড়শী মূর্ত্তির মুখে এ ধরনের অনুপম, মহিমময় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য সে দেখিয়াছে। একটু সেকেলে, একটু প্রাচীন ধরনের সৌন্দর্য—সুতরাং দুষ্প্রাপ্য। যেন মনে হয় এ খাঁটি বাংলার জিনিষ, এই দূর পল্লীপ্রান্তরের নদীতীরের সকল শ্যামলতা, সকল সরসতা, পথিপ্রান্তে বনফুলের সকল সরলতা ছানিয়া এ মুখ গড়া, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলার পল্লীর চূত বকুল-বীথির ছায়ায় ছায়ায় কত অপরাহ্ণে নদীঘাটে যাওয়া-আসার পথে এই উজ্জ্বলশ্যামবর্ণা রূপসী তরুণী বধূদের লক্ষ্মীর মত আলতারাঙা পদচিহ্ন কতবার পড়িয়াছে, মুছিয়াছে, আবার পড়িয়াছে। ইহাদেরই স্নেহপ্রেমের, দুঃখ সুখের কাহিনী, বেহুলা লক্ষীন্দরের গানে, ফুল্লরার বারমাস্যায়, সুবচনীর ব্রতকথায়, বাংলার বৈষ্ণবকবিদের

রাধিকার রূপবর্ণনায়, পাড়াগাঁয়ের ছড়ায় উপকথায় সুয়োরাণী দুয়োরাণীর গল্পে।' (অপরাজিত, পৃঃ ১৮৯)।

দেবীমূর্ত্তির মহিমময় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য, নদীতীরের শ্যামলতা, বনফুলের সরলতা বিভূতিভূষণের প্রায় সব নারীরই আত্মার ভূষণ। আর মৃত্যুবিজয়িনী বেহুলা, ব্যাধরমনী ফুল্লরা, প্রেমিকা রাধিকা প্রভৃতি যত আলাদা ধরনের নারীই হোক না কেন, বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে এরা প্রায় সবাই এক।

শিশুর প্রতি মনোযোগ বিভূতিভূষণের অত্যন্ত বেশী। অন্য কোন বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক তাঁদের সাহিত্যে শিশুকে এত গুরুত্ব দেননি। 'পথের পাঁচালী' সারা বইটাই একটি শিশু-লীলার কাব্য। এই সবান্ধব অপু-দুর্গা ছাড়াও আছে কাজল (অপরাজিত), জিতু (দৃষ্টিপ্রদীপ), খোকা (ইছামতী) ইত্যাদি। তাঁর ছোটগল্পেও শিশুর যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব। তাঁর সাহিত্য এক বিরাট শিশুমেলা।

এই শিশুরা অধিকাংশই গৌণ চরিত্রে দাঁড়িয়ে নেই। বরং বহুস্থানে এরাই মুখ্য, এদের নিয়েই কাহিনী।

সাধারণত উপন্যাস সাহিত্যে শিশুর আবির্ভাব ঘটে অল্প। এবং সেইটা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ সাহিত্যের এ ধারায় জীবনের যে গতিবেগকে পরিমাপ করবার চেষ্টা করা হয়, তাতে শিশুর প্রত্যক্ষ সক্রিয় ভূমিকা নেই। সে জীবন-গতির ফলটা অবোধভাবে ভোগ করে মাত্র। সুতরাং উপন্যাস-সাহিত্যে শিশুর বৃহৎ ভূমিকা থাকতে পারে না। কিন্তু বিভূতিভূষণের উপন্যাসের উপজীব্য জীবনচাঞ্চল্য নয়, মানসস্বপ্ন। শিশুমন এই স্বপ্নের যত সুষ্ঠু বাহন হতে পারে, তত আর কোন মন নয়। শিশু যত বড় হয়, তত সে তার এই স্বপ্নকে হারিয়ে ফেলে, তত তার তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টিপ্রদীপের আলো ক্ষীণ হতে থাকে, এবং বিভূতিভূষণের

মনোযোগও সেখান থেকে তত কমতে থাকে। (যাঁরা বয়স্ক হয়েও মনের এই গুণ বজায় রাখতে পারেন, তাঁদের ক্ষেত্রে অবশ্য থাকে।)

এমন কি যে শিশুর মনে স্বপ্ন দেখার মত বোধও ভাল করে জন্মায় নি, যার মুখে অস্ফুট কাকলির বেশী ভাষা ফোটে নি, এমন শিশু সম্পর্কেও বিভূতিভূষণের আগ্রহ প্রচুর। এই ধরনের শিশুকে সাধারণ উপন্যাস-সাহিত্যে প্রায় গ্রহণই করা হয় না। কারণ সাহিত্যের এই ধারা চরিত্রমুখ্য, অথচ এই মানবকের মধ্যে তখনও চরিত্র বস্তুটা দানা বেঁধে ওঠে নি। সে তখন একতাল অস্ফুট চেতনা মাত্র, আকার-প্রকার তার অনির্দিষ্ট। কিন্তু বিভূতিভূষণ এমন মানব সন্তানগুলিকেও সমাদরে উপন্যাসের পাতায় বসিয়ে তাদের অকারণ মুখভঙ্গি ও অর্থহীন মুখভাব দেখে-শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। এই ধরনের শিশুর ভাল উদাহরণ হবে 'ইছামতী'-র খোকা। তাঁর অন্যান্য গল্প-উপন্যাসেও এ জাতীয় চরিত্র আছে।

'ইছামতীর' খোকা অনেকগুলি পাতা জুড়ে একই ধরণের আধভাঙ্গা কথা বকে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে বারবার আনতে লেখকের শ্রান্তি নেই। অগঠিত-চরিত্র বলে অন্য ঔপন্যাসিকের কাছে এ জাতীয় শিশু অপাংক্তেয়, আর ঠিক ঐ কারণেই বিভূতিভূষণের কাছে এরা এত সমাদরের।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শিশু প্রকৃতির সৃজন। কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুলপরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা।' (ছেলে-ভুলানো ছড়া, লোক-সাহিত্য) এই রচনায় মানুষের নীচতা, ক্ষুদ্রতা ও মালিন্যের ছাপও যথেষ্ট পড়ে। আর প্রকৃতি বিভূতিভূষণের কাছে মালিন্যহীন অকলঙ্ক সৌন্দর্যের আধার। মানুষ ও প্রকৃতির এই স্বভাব-বৈপরীত্য সম্পূর্ণভাবে অবসিত হয় শিশুর ক্ষেত্রে। সে মানুষ হয়েও 'প্রকৃতির সৃজন।' সে মালিন্যজাত, কিন্তু সুন্দর। সে মানুষের কোলেই জন্মেছে, কিন্তু প্রকৃতির কোল ছেড়ে আসে নি। শিশুর মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতি তাদের বিরোধ ভুলে সানন্দে সম্মিলিত। এইজন্যই

শিশু বিভূতিভূষণের কাছে এত প্রিয়।

বয়স্কদের মধ্যেও গ্রামীণ, আরণ্য এবং আদিবাসীদের প্রতি তাঁর ঝোঁক। কারণ এরা প্রকৃতির অনেক কাছের মানুষ। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের প্রাচীন শিশু-মানবের সগোত্র হচ্ছে অরণ্যবাসীরা ; 'আরণ্যকে' এবং কতগুলি গল্পে এদের প্রতি লেখকের ভালবাসা সরবে ঘোষিত।

ডায়রীগুলিতে যেখানে যেখানে বিভূতিভূষণ কি নিয়ে লিখবেন ভেবেছেন তার প্রায় সর্বত্রই তিনি দুটি বিষয়ে তাঁর পক্ষপাতিত্ব ঘোষণা করেছেন। এক, প্রকৃতিজগৎ ; দুই, শিশু। তিনি লিখতে চান, 'আমার শৈশব কি রকম কাটল ?' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪১)। শুধু লেখা নয়, আবার নতুন করে শৈশব জীবনে ফিরে যাওয়ারও আশা করেন তিনি। এ জন্মে না হলে আগামী জন্মে। 'যে যাই ভাবুক আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি—শুধু বিশ্বাস বলে নয়—যেন দেখতেও পাই, হাজার হাজার বছর পরে ঐ আমার শৈশব-আনন্দ-ভরা ভিটার মত আর কোন দেশে জন্মে অপূর্ব আনন্দভরা শৈশব যাপন করব—পৃথিবী মায়ের বুকে নতুন হয়ে ফিরে আসব।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৯২)।

যতদিন পর্যন্ত না সেই ভাবী জন্মান্তরের শৈশব-নন্দনকাননে গিয়ে পেঁছিনো যাচ্ছে, ততদিন তো একেবারে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। তাই স্মৃতির রোমন্থন ছাড়াও নানা পথে তিনি শৈশবে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর শিশু চরিত্রগুলিতে প্রায় সর্বত্রই এই চেষ্টার ছাপ।

অনেকের কাছে শৈশব নিয়ে এত মাতামাতি অর্থহীন মনে হতে পারে। প্রশ্নটা বিভূতিভূষণ নিজে তুলে উত্তরও নিজেই দিয়েছেন। প্রশ্নটা 'এই রকম করে বলা যেতে পারে—শৈশব তো সকলেরই হয়—ওতে ভাববার কি আছে! এ আর নতুন কথা কি?' উত্তর দিচ্ছেন, 'তা নয়। এই ভেবে দেখাটাই আসল। না ভাবলে ভগবানের সৃষ্টি মিথ্যা হয়ে পড়ে। জগতে যে এত সৌন্দর্য তার সার্থকতা তখনি যখন মানুষ তাকে বুঝবে, গ্রহণ করবে, তা থেকে আনন্দ পাবে।' (স্মৃতির

রেখা, পৃঃ ৪৩)। আর এই সার্থকতা শুধু সৌন্দর্য-বস্তুর নয়, সৌন্দর্য ভোক্তারও। অস্তমান সূর্য, পাখীর গান, খোকাখুকির হাসি এই সবের 'আনন্দকে সে ভোগ করে নিয়ে নিজেও বড় হয়ে উঠল—আত্মাকে আর এক ধাপে উঠিয়ে দিলে।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪৩)।

আত্মার উন্নতির সহায়ক শিশুকে (এবং প্রকৃতিকে) বিভূতিভূষণ ক্রমে প্রায় দেবতার বা গুরুর আসনে বসিয়েছেন। 'অজস্র পাপ ক্ষুদ্রতা ও লোভে যে পৃথিবী ক্লেদাক্ত' তার অনেক উর্ধ্বে 'বিরাট বিশ্বযন্ত্রের লয়-সঙ্গতির একটা মনোমুগ্ধকর তান' এই শিশু। (ইছামতী, পৃঃ ৩০৭)। ঐ 'ইছামতীর'ই অন্যত্র বলেছেন, 'এই শিশু, এই নদীতীর সেই তত্ত্বেরই (অর্থাৎ ভগবৎ-তত্ত্ব) অন্তর্ভুক্ত জিনিষ। সে থেকে পৃথক নয়—সেই মহা-একের অংশ মাত্র।' (পৃঃ ৩৫৮)। 'চোখ থাকলে দেখা যাবে, ওই ফুলে, পাখীর ডাকে, ছেলেমানুষের হাসিতে তিনি রয়েছেন।' (পৃঃ ৩৭৪)

'ইছামতী'-তে কবিরাজ বল্লেন, 'তাহলি দাঁড়াচ্ছে এই খোকা আপনার এক গুরু।' ভবানী কথাটা প্রায় স্বীকার করে নিয়ে বল্লেন,—'যা বলেন।'

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির শিক্ষকতা-গুণের কথা বলেছেন। আর ছ' বছরের শিশুকে বলেছেন, 'mighty prophet, seer blest,।'

বিভূতিভূষণের শৈশব-প্রত্যাবর্তনের আকূতিও পূর্বসূরীদের চিন্তায় দুর্লক্ষ্য নয়। রুসো-উদ্বুদ্ধ রোমান্টিক আন্দোলন পর্যালোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক আরভিং ব্যাবিট্ এই বিষয়েরও উল্লেখ করেছেন। (দ্রষ্টব্য—Rousseau and Romanticism)। অধ্যাপক ব্যাবিট অবশ্য অনুরূপ চিন্তার সাদৃশ্য সন্ধানে দূর-অতীত পর্যন্ত গিয়েছেন। চীনের আদি তাও-বাদীদের জীবনাদর্শ প্রকৃতিমুখী ও শিশুমুখী। তারাও জীবনকে প্রকৃতি-লালিত শৈশব-সারল্য থেকে সুরু করতে চায়। তাও-বাদ "encourages a reversion to origins, to the state of nature and the simple life. (পৃঃ ২৯৭)। তাওবাদীদের মতে

চীনারা তাদের সরল জীবন থেকে কৃত্রিমতায় অধঃপতিত হয় পুরাণবর্ণিত 'পীত সম্রাট'-এর সময়। কিন্তু এখন ব্যক্তির সাধনা হওয়া উচিত সেই উৎসের শৈশব-সারল্য থেকে জীবন সুরু করা।

'The individual also should look back to beginnings and seek to be once more like the new-born child or, according to Chuang-tzu, like the new-born calf.' (পৃঃ ২৯৭)। প্রথমে ঐ 'new-born calf' কথাটায় একটা ধাক্কা লাগতে পারে আমাদের মনে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে নবজাত মনুষ্যশিশু ও নবজাত গো-বৎসের মধ্যে প্রকৃতির সন্তান হিসেবে কোন পার্থক্য নেই। উভয়েই তখন প্রকৃতি-স্তন্য-পুষ্ট জীবনানন্দে অবোধ গতিতে স্ফুটমান।

বিভূতিভূষণও অন্তত একটি গল্পে (বুধীর বাড়ী ফেরা, কিন্নরদল) গাভীর মনস্তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করেছেন; এই গল্পের সবটাই বুধীর দৃষ্টিকোণ থেকে বলা। (গল্পটা বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এর আগেও আমাদের গল্প লেখা হয়েছে, যেখানে মনুষ্যেতর প্রাণী প্রায় একটা চরিত্রের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু এদের কোনটাতেই প্রাণীটির অনুভূতির দিক থেকে গল্প বলা হয় নি। মানুষের সঙ্গে এদের সম্পর্কটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ—এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেখানে আসলে মানুষেরই সুখ-দুঃখ বর্ণিত। মহেশ বা আদরিণী বা সুভার গাভীটি তাদের মনিবদের জন্যে অথবা অন্য কিছুর জন্যে, ঠিক কী অনুভব করেছিল তা আমরা জানি না। 'বুধীর বাড়ী ফেরা'-তেবিভূতিভূষণ বুধীর মনের সঙ্গে নিজের মনকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন। পরে অবশ্য এ রকম গল্প লেখা হয়েছে। যথা, গোপাল হালদারের 'রাস্তার রাজা'।)

বিভূতিভূষণের শিশু-প্রীতির আর আর একটি কারণ আছে। তাঁর কৌতূহলী বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিরশিশু-মন শিশু-চরিত্রের মধ্যে সহজে একটি তৃপ্তিকর আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেত।

॥ দুই ॥

॥ অপু ॥

অপু বিভূতিভূষণের চরিত্র-রাজ্যের প্রতিভূ। লেখক তাঁর হৃদয়ের তিল তিল অনুভূতি আহরণ করে একে রচনা করেছেন—অতি নিষ্ঠা সহকারে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। অপু বিভূতিভূষণের প্রথম মানস-অপত্য, এবং প্রধানও। জ্যেষ্ঠ হিসেবে অপু বিভূতিভূষণের সামগ্রিক মানস-সম্পদের অধিকারী। বিভূতিভূষণ অবশ্য কনিষ্ঠদের ত্যাজ্য করেন নি, কিন্তু যে গভীর নিষ্ঠা নিয়ে তিনি অপুর জন্মের পূর্ব থেকে অতি-দীর্ঘকাল ধরে প্রতি পদক্ষেপে যে ভাবে তাকে লালন করেছেন, সেই পরিমাণ প্রযত্ন কনিষ্ঠদের ভাগ্যে জুটেছে কিনা সন্দেহ। অপু বিভূতিসাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

অপুর মনের চোখ ফুটছে—সেই চোখ-ফোটার ইতিহাস বলা হয়েছে অপুর শৈশব-কৈশোরের কাহিনীতে। যে দুটি চোখ মানুষমাত্রেরই দেহে সংলগ্ন, সে চোখ নয়, অপুর আছে আর এক 'তৃতীয় নেত্র, যেটা না খুলিলে বাহিরের চোখের দেখাটা নিস্ফল হইয়া যায়।' (অপরাজিত, পৃঃ ২৭০)। সাধারণ চোখের দৃষ্টি যে দিগন্ত-পরিধিতে বন্দী, অপুর তৃতীয় নেত্র সেখানে বাধা মানে না, বা ঐ দিগন্ত-অন্তর্ভূত বস্তুনিচয়ও নিছক বস্তুমাত্র না থেকে ঐ চোখের দৃষ্টিতে দিব্য এক রূপ পায়। এই সৌন্দর্যপিপাসু কল্পনাপ্রদীপ্ত দৃষ্টির স্নিগ্ধ আলোকে 'পথের পাচালী' ও 'অপরাজিত' রমণীয়। এই বিশেষ আলোক না থাকলে উপন্যাসদ্বয় একঘেয়ে কতগুলি দিনের সারসঙ্কলন বলে মনে হোতো। কাহিনীগৌরবে বা নাটকীয়তায় এই গ্রন্থ অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্তু সে দারিদ্র্য গ্রন্থকে হীন করে নি। হরিহরের

ঘরের দারিদ্র্য অপুকে মলিন ও অসুন্দর করতে পারে নি। প্রকৃতি-আশ্লিষ্ট গ্রামীণ মাটির স্তন্যরসে অপুর মন পুষ্ট হয়েছে, সেই মাতৃঋণ সে পরিশোধ করেছে এক বিচিত্র উপায়ে। তার দৃষ্টির আলোকে একান্ত-সাদা-মাটা দশের-এক-গ্রাম নিশিন্দিপুরকে সে 'স্বর্গাদপি' রমণীয় করে তুলেছে, 'পথের পাঁচালী' সেই রমণীয়তার আলেখ্য। উপন্যাসটিতে ঘটনার সংহতি নেই, সংখ্যানুপাতে বিশিষ্ট চরিত্রের আবির্ভাব স্বল্প। কতগুলি বিক্ষিপ্ত চিত্রের সমষ্টি যেন এ বই। কিন্তু এই ছড়ানো দিনগুলির কেন্দ্রে এক মনোরম দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে অপু, তার মধ্যে দিয়েই এই বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন দিনগুলি একটি সুষ্ঠু ঐক্যের মধ্যে বিধৃত। অপুর রসদৃষ্টির সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রে দিনগুলির মালা গাঁথা ; একটি মুহূর্তেও এই দৃষ্টি-শক্তি প্রত্যাহৃত হলে দিনগুলি আকস্মিকভাবে ছিটকে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে অর্থহীনভাবে মাথা ঠোকাঠুকি করত। সেই অপঘাত থেকে গ্রন্থকে বাঁচিয়েছে অপু, দিয়েছে সুষম রূপ। যথার্থ অর্থেই অপু এ গ্রন্থের নায়ক।

অপুর মন এই দিনগুলিকে বেঁধেছে এক ঐক্যসূত্রে, কিন্তু ঐ স্থান-কাল-সীমায় সে নিজে বাঁধা পড়ে নি। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বর্ণাঢ্য পদচিহ্নের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিসীমার যে-পৃথিবী নিত্য-নবীনতায় জাগ্রত, সেই পৃথিবী অপুর মনকে জাগিয়েছে ; আর অপুর জেগে-ওঠা মন আরো দূরে—আরো দূরে যাবার চেষ্টা করেছে। তার মনকে জাগিয়ে তোলে বলেই যাত্রা তার ভাল লাগে, একখানা বাঁকা লাঠি হাতে তার মন কল্পনার রথে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়ে। এই জন্যেই তার পাঠস্পৃহা—ভিন্ন জগতের বাণী বহন করে আনে বলে। ভ্রমণ-কাহিনী তাকে দেয় দূরদেশের বার্তা, জ্যোতির্বিদ্যা ডাকে নক্ষত্রলোকে, আর প্রকৃতিজগৎ শুধু স্নিগ্ধ প্রশান্তি মাত্র আনে না, সঙ্গে আনে সুদূরের বার্তা। পথের দেবতা প্রতি মুহূর্তে আহ্বান জানায়। সুদূরের

তৃষ্ণা অপুর আকণ্ঠ। এ-ও যেন 'ডাকঘরের' আর এক অমল। অমলের পায়ে শেকল পরিয়েছিল ব্যাধি; খাঁচার পাখীর মত ডানা ঝটপট করে ব্যর্থতার ব্যথাতুর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে সে। আর অপু অনেক স্বাধীন, তাকে বাতায়নের রৌদ্ররশ্মি-পানে তৃষ্ণা-নিবারণের চেষ্টা করতে হয় না, তার কাছে নিশ্চিন্দিপুর আকাশ মেলেছে। কিন্তু অপুর তৃষ্ণার তুলনায় নিশ্চিন্দিপুর কতটুকু! অপুর পায়েও শিকল আছে—সে যে ছোট। 'শুধু মনে হয়—বড় হইলেই সব হইবে, অগ্রসর হইলেই সকল সুযোগ সুবিধা পথের মাঝে কুড়াইয়া পাইবে...এখন শুধু বড় হইবার অপেক্ষা মাত্র। সে বড় হইলে সুযোগ পাইবে, দিক দিক হইতে তাহার সাদর আমন্ত্রণ আসিবে—সে জগৎ জানার, মানুষ চেনার দিগ্বিজয়ে যাইবে।' (পৃঃ ১৭২)। অনেক দেশের কথা অপুর মনে হয়, 'সে সব দেশে কোথায় কাহারা যেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।' (পৃঃ ১৭১)। 'পথের পাঁচালী'তে কাশীযাত্রায় অপুর পায়ের শিকল একটু আলগা হয়েছে, মা-এর মৃত্যুর পরে অপু সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছে, অপর্ণা তাকে মুহূর্তের জন্যে বাধা দিয়েছিল, তার পরে তার অবাধ-পদক্ষেপ। অমলের সঙ্গে এইখানে অপুর পার্থক্য। অমল ব্যর্থতায় করুণ, অপু বিশ্বের আনন্দ-মহোৎসবে যোগ দিয়ে নিজেকে ধন্য করেছে। আবার সাদৃশ্যও আছে অমলে অপুতে। অমলের প্রাণ মৃত্যুতে ব্যাহত না হয়ে মরণোত্তর এক সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-সৌন্দর্যলোকে তার যাত্রাপথের ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছে। অপুর মনেও এই অধ্যাত্মলোকের উষা-চেতনা অনুপস্থিত নয়।

এই সুদূর-তৃষ্ণা অপুর সংবেদনশীল মনকেও করেছে গৃহবিবাগী। সাধারণত স্পর্শকাতর মন আসক্তির বন্ধনে বাঁধা পড়ে—যত বেশী অনুভব করে, ততই নিজেকে জড়িয়ে ফেলে; কিন্তু অপুর মন স্পর্শকাতরতা সত্ত্বেও বাঁধা পড়তে চায় না; বেদনা পায়, কিন্তু আসক্তির জাল ছিন্ন করে অগ্রসর হয়। নিশ্চিন্দিপুরের আকাশ-

বাতাস সম্পর্কে বালক-অপুর মমতা কম নয়, কিন্তু কাশীর কল্পনা তার ডানায় জাগায় চঞ্চলতা। মাকে সে ভালবাসে, কিন্তু সে-ভালবাসা আবার তার কাছে বন্ধনও; তাই মার মৃত্যু তার স্পর্শকাতর মনে বেদনা জাগিয়েছে। আবার তার মুক্তিপিয়াসী মন বন্ধনছেদনের আনন্দও পেয়েছে। দু-দিনের পরিচিত ছোট্ট গুলকীর জন্যে, আরো কত অসংখ্য মানুষের জন্যে তার মমতার ও প্রীতির অন্ত নেই। কিন্তু কোথাও আবদ্ধ হতে চায় না সে। সুদূরলোকের এক আনন্দ-যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রয়েছে তার—সেখানে যাওয়ার পথে থেমে থাকলে চলবে না। তাই তার জীবন নিয়ে যে-কাহিনী রচিত, তার নাম 'পথের পাঁচালী' ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয়। গৃহের কথাও আছে এ-গ্রন্থে, বিশদ ভাবেই আছে, তবু অপুর কাছে তা পান্থনিবাস। সেই পান্থনিবাসের মানুষদের সে ভালবাসে, কিন্তু সেখানে চিরটা কাল থাকবার জন্যে সে পৃথিবীতে আসে নি। সে যাত্রাপথের কোন আশ্রয় বা কোন ব্যক্তিকে তুচ্ছ করে দেখে নি, দু' দণ্ড দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কও পাতিয়েছে, কিন্তু দৃষ্টি ছিল পথের দিকে। আরো, আরো দূরে যেতে হবে তাকে। ছোটবেলাতেই অপু ঘর ও পথের পরস্পরবিরুদ্ধ সম্পর্কের খবর জেনেছিল। আর এ ক্ষেত্রে তার অভীপ্সা কোন দিকে, তাও তার অজ্ঞাত ছিল না। বালক বয়সেই 'ঘরে থাকিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা হয় না।'

তবে তার সবচেয়ে কাম্য কি? 'ভারি মজা হয় যদি তারা তাহাকে বলে—খোকা তুমি শুধু পথে পথে বেড়িয়ে বেড়াও—তাহা হইলে এইরকম বনফুল-ঝুলানো ছায়াছন্ন-ঝোপের তলা দিয়া ঘুঘু-ডাকা দূর বনের দিকে চোখ রাখিয়া এই রকম মাটির পথটি বাহিয়া শুধুই হাঁটে—শুধুই হাঁটে।' (পৃঃ ১৭৩)। বাবার কাছে এ অনুমতি পাওয়া যায় নি বটে, কিন্তু উত্তরজীবনে অপুর জীবন দেবতা তাকে এ আহ্বান জানিয়েছিল। আর অপুও সাড়া দিয়েছিল নিখুঁতভাবে।

'পথের পাঁচালী'তে পথযাত্রা তেমনভাবে সুরু হয় নি। অপুর দীক্ষাপর্ব এ গ্রন্থ। নিশ্চিন্দিপুর সেই দীক্ষার তীর্থক্ষেত্র। পথের দেবতা তার কানে মন্ত্র উচ্চারণ করেছে, '...পথ তো আমার শেষ হয় নি, পথ আমার চলে, গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে, দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে,...সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলকতোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি। চল এগিয়ে যাই।' (পৃঃ ২৩৪)।

পথের প্রব্রজ্যা তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে গৃহ, যা কিছু গার্হস্থ্য। অর্থ, যশ, কাম কোন কিছুর জন্যই তার আকাঙ্খা নেই। অর্থাভাব আছে হরিহরের ঘরে, কিন্তু সে দারিদ্র্য অপুকে বিশেষ পীড়া দেয় না। উত্তর-জীবনেও নিজের আর্থিক অবস্থা ভাল করবার কোন বিশেষ চেষ্টা সে করে নি। চোখের আর মনের ক্ষুধাটাই তার সব, উদর তার কাছে সমস্যাই নয়—এ কালের পক্ষে নিশ্চয়ই অদ্ভুত।

অপু যখন পরিণত বয়সে আবার দীক্ষাতীর্থ নিশ্চিন্দিপুরে ফিরেছে, তখন পুরাতন সৌন্দর্যের বিশেষ ক্ষয় ক্ষতি বা পরিবর্তন দেখা দেয় নি তার চোখে। যে-ক্ষুয়িষ্ণু পল্লী-ব্যবস্থায় পেটের দায়ে হরিহরকে বাস্তুত্যাগী হ'তে হয়েছিল পঁচিশ বছর আগে, পঁচিশ বছর পরে সে ভাঙ্গন পল্লীর আরো কত দরজায় হানা দিচ্ছিল, সে-হিসেব অপু নেয় নি। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সে তার স্মৃতি-সুন্দর দৃশ্যাবলীর মধ্যে চোখ ডুবিয়ে দিয়েছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, এই পঁচিশ বছরের কালের কোন চিহ্ন সে নিশ্চিন্দিপুরের মুখে দেখে নি, তার প্রিয় সমান তারুণ্যে, সুন্দর প্রিয়জন প্রতীক্ষায় অভিসার-সজ্জায় মধুর, মহাকাল তার মুখে কোন দাগ ফেলে নি। আসলে, ইতিহাস বলে যে মহাকাল দাগ ফেলেছে নিশ্চিন্দিপুরের মুখে, কিন্তু অপু তার মনের অপূর্ব প্রসাধনে সে-মুখকে সুন্দর করে রেখেছে, এই পরিবর্তন লক্ষ্য করবার মত দৃষ্টি অপুর কোন সময়েই আসে নি।

॥ তিন ॥

॥ অপু ও নিসর্গজগৎ ॥

অপুর চরিত্রে সবচেয়ে বড় হ'য়ে রয়েছে তার প্রকৃতিপ্রীতি। এটাকে অবশ্য 'প্রীতি' মাত্র বললে সবটা বলা হয় না। শৈশবেই তার জীবনকে অনেকটা পরিমাণে গড়ে দিয়েছে এই নিসর্গ-জগৎ। 'অপুর শৈশব কাটিতেছিল এই প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে।...ইহাদের সহিত এই ঘনিষ্ঠ যোগ সে ভালবাসে, ইহাদের ছাড়া সে জীবন কল্পনা করিতে পারে না। এই বিরাট অপরূপ ছবি চোখের উপরে রাখিয়া সে মানুষ হইতেছিল।...অপুর স্ফুটনোম্মুখ কৈশোরের সতেজ আগ্রহভরা অনাবিল মনে ইহাদের অপূর্ব বিশাল সৌন্দর্য চিরস্থায়ী ছাপ মারিয়া দিয়াছিল, কান্তিরসের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল, চুপি চুপি তাহার কানে অমৃতের দীক্ষামন্ত্র শুনাইয়াছিল।— অপু কখনো জীবনে এ শিক্ষা বিস্মৃত হয় নাই। চিরজীবন সৌন্দর্যের পূজারী হইবার ব্রত, নিজের অলক্ষিতে মুক্তরূপা প্রকৃতি তাহাকে তাহা ধীরে ধীরে গ্রহণ করাইতেছিলেন।' (পৃঃ ১৭৩)। (লক্ষণীয়, প্রকৃতি শব্দের বিশেষণটি—'মুক্তরূপা'। প্রকৃতির এই মুক্ত রূপই তাকে ঘরের বন্ধনের বাইরে নিয়ত আকর্ষণ করত।)

অপু দ্বিজ। * প্রথম জন্ম তার সর্বজয়ার কোলে, দ্বিতীয় জন্ম প্রকৃতির কোলে। প্রকৃতি তার কানে অমৃতের দীক্ষামন্ত্র

---

* "দ্বিজত্ব" কথাটা "দৃষ্টিপ্রদীপে" বিভূতিভূষণই ব্যবহার করেছেন জিতু সম্পর্কে : 'আমার সকল ইন্দ্রিয় একটা অনুভূতির কেন্দ্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে—একবার চাই শালিকের ছানাগুলো খাদ্যকণা খুঁটে খাচ্ছে যেদিকে, তাদের অসহায় পক্ষভঙ্গিতে কি যেন লেখা আছে। একবার চাই তিমির ফুলের রঙের আকাশের পানে ঝলমল প্রভাতের সূর্যকিরণের পানে, শস্যশ্যামল পৃথিবীর পানে—কি রূপ।—এই আনন্দের মধ্যে দিয়ে আমার দ্বিজত্ব, 'এক গৌরবসমুদ্ধ, পবিত্র নবজন্ম।(পৃঃ ১২৯)

শুনিয়েছিল—সেই তার উপনয়ন। বিদ্যাশিক্ষার জন্য বালককে আচার্যসমীপে আনার নামই তো উপনয়ন। নিশ্চিন্দিপুরের পাখী-ডাকা। বুজ দিনগুলো অপুর শিক্ষালয়, গুরুগৃহ। গুরু জ্ঞাননেত্র উন্মোচন করেন। অপুর মধ্যে জ্ঞানের দৃষ্টি ফোটে নি, ফুটেছে এক সবিস্ময় সানন্দ কল্পদৃষ্টি—তার তৃতীয় নেত্র। উপনীত অপুর মনকে আর প্রকৃতিজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। প্রথম জন্মে তার দেহের রক্তেমাংসে সর্বজয়ার উত্তরাধিকার ঘোষিত, দ্বিতীয় জন্মে তার মনের রক্তমাংসে গ্রামজননীর উত্তরস্বত্ব আমৃত্যু উচ্চারিত। অপু তাই 'অর্ধেক মানব আর অর্ধেক প্রকৃতি।' (প্রমথনাথ বিশী, বাঙ্গালী ও বাঙ্গলা সাহিত্য)।

অপুর এই বৈশিষ্ট্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কপালকুণ্ডলা ও লুসিকে। তিনটি চরিত্রই স্বকীয়তায় ও পারিপার্শ্বিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু সকলের মধ্যে সাদৃশ্যের একটি দৃঢ় সূত্র বর্তমান: সকলেই প্রকৃতি-লালিত-সত্তা, সকলেই অর্ধেক মানব ও অর্ধেক প্রকৃতি।

কপালকুণ্ডলা প্রকৃতি-বিরহিত আবহাওয়ায় নিশ্বাস নিতে কষ্ট বোধ করে—জলের বাইরে মাছের মত। এ পরীক্ষা লুসির জীবনে এলে প্রতিক্রিয়া একই প্রকার হতো। অপুও ছাত্রজীবনে দু'চার দিন গাছপালা না দেখতে পেলে অস্বস্তি বোধ করে এবং মানস-রাজ্যে বাধা অতিক্রমের চেষ্টা করে। সে খাতার পাতায় অগণ্য গাছপালার নাম লেখে ও পড়ে। (স্মরণীয়, বিভূতিভূষণও দুরধিগম্য 'বিচিত্র জগৎ' ও অনায়ত্ত 'চাঁদের পাহাড়ে'র উদ্দেশ্যে মানস-অভিসার করেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর অভিসার-কাহিনী বিক্ষিপ্ত-ভাবে নানা রচনায় ছড়িয়ে আছে। প্রকৃতি-মুখী চিত্ত-স্রোতে বাধা পড়লেই এ প্রয়াস ফেনিয়ে উঠত।)

প্রকৃতিজগতের প্রেরণাই কিশোর অপুকে উত্তরকালে শিল্পীতে

পরিণত করেছে। 'এই অল্প বয়সেই তাহার মনে বাংলার মাঠ, নদী, নিরালা বনপ্রান্তরের সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রির যে মায়ারূপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার উত্তরকালের শিল্পীজীবনের কল্পনামুহূর্তগুলি মাধুর্যে ও প্রেরণায় ভরিয়া তুলিবার তাহাই ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান। (পৃঃ ১৮৫)। এই ভাবী শিল্পীর মনোলোককে বিভূতিভূষণ নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন। তার প্রকৃতি-প্রেরণা কল্পনাপ্রসার ও অনুভূতিশক্তি অন্ধ আঁধারলোক থেকে যাত্রা সুরু ক'রে অস্ফুট আবছা উষালোককে অতিক্রম ক'রে আলোকতীর্থে যাত্রা করেছে। গ্রামপ্রকৃতি, পুরাণকথা, যাত্রার নাটক, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী সবই তার আত্মাকে উদ্দীপ্ত করেছে। কিশোর অপুর এই শিল্পীসত্তার একদিকে প্রকাশকামনা, অন্যদিকে সংকোচ। তার অপরিণত শিল্পসম্ভারকে সে মানুষের কাছে রাখতেও চায়, আবার এই গোপন হৃদয়ের মমতা-লালিত কল্পনাসৃষ্টি পাছে অন্যের কাছে উপহাস বা আঘাত পায় এই ভয়ে দ্বিধারও তার অন্ত নেই। যাত্রার দলের নায়করূপে যখন সে বাঁকা লাঠিখানা ঘুরিয়ে কল্পনার স্বর্গ-রাজ্যে চলে যায়, তখন দুর্গার মুখোমুখি হয়ে গেলে সে সংকোচে কুঁকড়ে যায়। তারা যে অপুর এই মানসজগৎকে বোঝে না। অনুভব করতে পারে না, স্নেহ করে যারা তারাও বলে, 'পাগল!' এই সঙ্কোচকে ক্রমে অবশ্য সে কাটিয়ে উঠেছে। এমন কি লেখা ছাপার জন্য হরিহরের কাছে টাকাও সে চেয়েছে।

সহমর্মী লোক পেলে অবশ্য তার মুখ খুলে যায়। কিংবা মুগ্ধ-হৃদয় সপ্রশংস কোন শ্রোতা পেলে তাকে মুগ্ধতর করে তার 'অনাবিল আত্মম্ভরিতা' বেশ আনন্দ পায়। তখন সে নিজের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলবেই না। 'তাহার একটা মহৎ দোষ এই যে, নিজের বিষয়ে কথা একবার পাড়িলে সে আর ছাড়িতে চায় না— অপরেও যে নিজেদের সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা করিতে পারে, তরুণ

বয়সের অনাবিল আত্মম্ভরিতা ও আত্মপ্রত্যয় সে বিষয়ে তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখে।' (অপরাজিত, পৃঃ ১০৩)। এই 'আত্মম্ভরিতার' চিত্র বিভূতিভূষণের অন্য কয়েকটি নায়ক চরিত্রেও পাওয়া যায়। যথা, জিতু।

আসলে অপু নিজেকে বড় ভালবাসে। নিজের ভাবনা-কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা তার মনকে সম্পূর্ণ ছেয়ে রেখেছে।

অবশ্য এই আত্মপ্রীতি তার আত্মিক আনন্দের জন্যে, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়। অর্থোপার্জন, বা সাংসারিক জগতের কোন ambition তার মনকে স্পর্শ করতে পারে না। '...চাকরি, অর্থোপার্জন—এসব কথা সে কোনদিন ভাবে নাই, তাহার মাথার মধ্যে কোনদিন এসব সাংসারিক কথা ঢোকে নাই—সে চায় এই অজানার রোমান্স—এই বিচিত্র ভাবধারার সহিত আরও ঘনিষ্ট সংস্পর্শ।' (অপরাজিত, পৃঃ ৮৪)। যখন সে উদার নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় দাঁড়ায়, তখন 'শহরে বা লোকালয়ে যে-মন আত্মসমস্যা লইয়া ব্যাপৃত থাকে, ambition লইয়া ব্যস্ত থাকে, তা তার কাছে অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর' মনে হয়। (অপরাজিত, পৃঃ ২৮১)। অনিলকে অপু একদিন বলেছিল, 'কখ্খনো কেরানীগিরি করব না, পয়সা পয়সা করব না কখনোও—সামান্য জিনিষে ভুলব না কখনও—'

তার ambition জাগতিক নয়, সাংসারিক নয়, আত্মিক। তার সেই আত্মিক মহৎ-কামনা পূরণ করে বলেই প্রকৃতিজগৎ তার এত কাম্য। এই প্রকৃতির স্পর্শ মনে কি ধরণের অনুভূতি জাগায় তাও অপু এক জায়গায় বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছে : 'একটা Mystery, একটা uplift-এর ভাব—ছেলেমানুষ তখন, সে-সব বুঝতাম না, কিন্তু সেই থেকে যখনই মনে দুঃখ হয়েছে, কি কোনও ছোট কাজে মন গিয়েছে, তখনই আকাশের নক্ষত্রদের দিকে চাইলেই আবার ছেলেবেলার সেই uplift-এর ভাবটা, একটা joy...একটা অদ্ভুত Transcendental joy—'(অপরাজিত, পৃঃ ১৩০)।

॥ চার ॥

॥ অ-সাধারণ সাধারণ ॥

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চরিত্রগুলিতে দেখা যায়, তারা যেন অতিরিক্ত মাত্রায় ভাবাত্মক। যথা, লুসি। সে একটা বিশুদ্ধ ভাবসত্তা মাত্র, রক্তমাংসের বাস্তবতাকে ছেঁকে বাদ দিয়ে সূক্ষ্ম একটি অ্যাবষ্ট্রাক্ট মূর্তি রচিত হয়েছে লুসি-তে। বাস্তবের স্থূল সম্পূর্ণ বর্জন করে এই চরিত্র যেন লঘুপক্ষ-সঞ্চরণে সদা আকাশচারী।

অপুর মধ্যেও এই আশঙ্কা ছিল। লুসি গীতিকবিতার চরিত্র, তার ভাবাত্মক রূপায়ণ ত্রুটির নয়। কিন্তু উপন্যাসের দাবী বাস্তবতা, সে দিক থেকে অপুর ভাবাত্মক রূপায়ণ ত্রুটির হোতো। অপুর প্রকৃতি-লালিত সত্তা, তার সুদূর-তৃষ্ণা, তার অতিরিক্ত কল্পনা-বিস্তার—এইগুলি রোমান্‌সের একটি আকাশচারী লোকে অপুকে তুলে নিয়েছে। কিন্তু কল্পনার লঘুপক্ষের উর্ধ্বগ শক্তিকেই একমাত্র করে রাখেন নি বিভূতিভূষণ অপুর চরিত্রে। বিপরীত পাল্লায় আমাদের অতি-পরিচিত জলমাটির মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে বসিয়ে নিপুণভাবে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন লেখক। এইটা না থাকলে অপুর ভাবমূর্তি বহু সাধারণ পাঠকের মানস-সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হোতো।

কিন্তু তা হয় নি, কারণ লেখক অপুর মনোজীবনের অ-সাধারণত্বকেই মাত্র দেখান নি, তার দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারত্বকেও খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন। এই সাধারণত্বই অপুর কল্পনা-প্রধান চরিত্রের ধমনীতে প্রাণরক্তের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রেখেছে। অপুর রোমান্স-পিপাসা তাকে

যত দূর-আকাশেই নিয়ে যাক না কেন, তার মধ্যে একটি অতি-নিকট সরল শিশু বা কিশোর কোন সময়েই দুর্লক্ষ্য নয়। অপুর পান্‌সে পায়স খাওয়ার অবোধ আনন্দ, তাজবিবির ছবি দেখবার আগ্রহ, বাবার অনুপস্থিতি মাত্র গুলি খেলতে বেরোনো, এমন কি হরিহরের অসুখের সময়ও এর ব্যত্যয় না হওয়া, বন্ধুদের কাছে হরিহরের আর্থিক অবস্থাকে বাড়িয়ে দেখাবার আগ্রহ—এই সবই একটি যে-কোন ছেলেমানুষের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। লেখক এই দিকটাকে যথেষ্ট details-সহকারে দেখিয়েছেন। আর এর ফলেই অপুর অ-সাধারণত্বের আবহাওয়া আমাদের মনে একটা অনুরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করেও অপুকে দূর বা অনাত্মীয় ক'রে দেয় না।

॥ পাঁচ

॥ অপু ও সমসাময়িক নায়ক

অপু এক যাযাবর, দূরের টানে ঘরের শিকড় ছিঁড়ে তার অবিরাম যাত্রা। 'পথের দেবতা' তার কপালে জয়তিলক পরিয়ে এ সংসারে এনেছেন। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ তিলক একা অপুর ললাটেই নেই। সমসাময়িক একাধিক লেখকের নায়কের ললাট অনুরূপ তিলকে চিহ্নিত।

বরং সামান্য একটু আগে থেকেই এর সুরু। শরৎচন্দ্রের প্রায় সকল নায়কই যাযাবর। তাঁর 'শ্রীকান্ত' তো নিজেকে অজস্র বার 'ভবঘুরে' বলে স্বয়ং চিহ্নিত করেছে। এই ভবঘুরে বৃত্তি তিরিশের যুগের প্রায় সকল লেখকের মজ্জাগত। 'কল্লোলীয়'দের নায়করা (অনেক ক্ষেত্রে নয়িকারাও) ভবঘুরে। এমন কি তারাশঙ্কর-মাণিকের প্রথম যুগের নায়করাও এ বৃত্তি থেকে মুক্ত নয়।

বিংশ শতকের গোড়া থেকেই বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের অবক্ষয় প্রকট হচ্ছিল; যে-প্রতিকূলতা তাকে অবরুদ্ধ করছিল তাকে ভেদ করে এগোবার পথ সে পাচ্ছিল না। বিশ শতকের একেবারে সুরুতে বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলনই বোধহয় বাংলাদেশের উনিশ-শতকী জাগরণের শেষ তরঙ্গ। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের আঘাত, সেটা প্রত্যক্ষত লেগেছিল ইংরেজের গায়ে; কিন্তু তখন ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের গাঁটছড়া বাঁধা, তার সংকট আমাদের রেহাই দিত না। কারণ ইংরেজের সংকটের বোঝা নামাবার জায়গা ছিল তার সাম্রাজ্য। ১৯২১ ও

১৯৩০-এর আন্দোলন মধ্যবিত্তের জীবনের ওপর ব্যাপক আলোর রশ্মি তুলে ধরতে পারে নি, ধরা সম্ভব ছিল না। সুতরাং এক প্রতিকূলতার অবরোধে ক্ষীয়মান বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত বহির্জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজেকে তেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্যম হারাচ্ছিল। যে-উদ্যম ঊনবিংশ শতকের বাঙ্গালীর রক্তে প্রবলভাবে প্রবাহিত হয়েছিল, তা স্তিমিত হয়ে গেল। আত্মবিশ্বাসী, জীবন সম্পর্কে আস্থাবান, লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন উনিশ-শতকী সৈনিকদের উত্তর-পুরুষ নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিতে লাগল। তার রোমাণ্টিক-বৃত্তি বর্হিজীবনের রঙ্গভূমির রোমান্স হারিয়ে ফেলে আত্ম-কণ্ডুয়ন আরম্ভ করল। উনিশ-শতকী সমাজ-দায়িত্ববোধের প্রাবল্য সেকালের মানুষকে সমাজভূমিতে দৃঢ়মূল প্রোথিত হয়ে জীবন সাধনার শিক্ষা দিয়েছিল। একালে তাদের উত্তরপুরুষ শেকড়-ছেঁড়া ভাসমান এক একটি দ্বীপখণ্ডে পরিণত হল। এই ভাসমানতাকে তারা রোমান্সের দৃষ্টিতে রঙ্গীন করে দেখত। সে আমলের সাহিত্যের নায়কদের এক ধরণের রোমাণ্টিক বোহেমিয়ানিজমের মূল এইখানে। তাদের উদ্দেশ্যহীন উদ্যমহীন দায়িত্বভীত চেতনা পথকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে বলেছিল—ঘর নেই আমার, পথই আমার সব। কিন্তু এই পথ-যাত্রা ইয়োরোপীয় রেনেসাঁস-কালের দুঃসাহসী নাবিকের বিশ্বজয়ী অভিযান নয়। সে-প্রেরণা সে-শক্তি এদের ছিল না। সমগ্র জাতির উদ্যম ঐ নাবিকদের মধ্যে সঞ্চারিত ছিল, আর এঁরা এক একটি স্বতন্ত্র দ্বীপখণ্ডের কল্পনাচর জীব। এদের ভ্রাম্যমানতা প্রবল জীবনধর্মের সঙ্গে ততটা যুক্ত নয়। এঁরা নিরুদ্দেশ যাত্রায় অথবা মানসভ্রমণে পটু।

একটু পরের দিকে এই ধারার মোড় ঘুরিয়েছেন তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি। সমাজ-জীবনে দৃঢ়মূল ব্যক্তিত্বের সন্ধান তাঁরা করেছেন। যদিও তাঁদের প্রথম দিককার সাহিত্য পূর্বোক্ত ধারার আওতার সম্পূর্ণ বাইরে নয়।

শরৎচন্দ্রেই এই ধারাটা সর্বপ্রথম স্পষ্ট করে দেখা দেয়। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : 'গত শতাব্দীতে ধর্মসাধনায়, রাষ্ট্রসাধনায়, শিল্পে এবং সাহিত্যে বাঙালী যে নৈপুণ্য ও দিগদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিল সে ক্ষমতা যেন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল—সে যেন মনের মধ্যে অপরাহ্ণের ক্লান্তি-জনিত একটা নৈরাশ্যের ভাব অনুভব করিতে সুরু করিয়াছিল। সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় ঠিক এই সময়টাতে। তাঁহাও স্পষ্ট সাহিত্য পারদযন্ত্রের মত বাঙ্গালীসমাজের মানসিক গতিবিধিকে, তাহার মানসিক উত্তাপকে, অর্থাৎ উত্তাপের হ্রাসকে সুনিপুণ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ পুরুষচরিত্র উক্ত ভাবের প্রতীক। শরৎ-সাহিত্যের পুরুষগণের অধিকাংশই বহুল পরিমাণে নিষ্ক্রিয়, উদ্যমহীন, লক্ষ্য সম্বন্ধে অচেতন; ঘটনার তাড়নাতে ভাসিয়া যাওয়াই যেন তাহাদের ধর্ম। বুদ্ধিতে তাহারা ক্ষীণ নহে, ধীশক্তিও তাহাদের প্রচুর—কেবল যে উদ্যম থাকিলে, উদ্দেশ্য থাকিলে, লক্ষ্য সম্বন্ধে চৈতন্য থাকিলে জীবন সার্থক হইয়া ওঠে তাহারই অভাব।' (বাংলা সাহিত্যের নরনারী, পৃঃ ১৩৯)।

শ্রীবিশী আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে শেষের যুগের রবীন্দ্রনাথকেও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চান। 'নূতন যুগের দ্বারা পূর্ববর্তী যুগের মানুষ রবীন্দ্রনাথও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অমিত রায় নূতন যুগের মানুষ।' তারও বিদ্যাবুদ্ধি আছে, কিন্তু জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে অচেতন। যে-কথা সে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে তাও সে সীরিয়াসলি বলে কি না সন্দেহ। সেও এক ভাসমান রোমান্স-সন্ধানী। কোন ক্ষেত্রেই কোন আদর্শ নিয়ে সে দৃঢ়ভাবে কর্মতৎপর হয় না—না কর্মক্ষেত্রে, না প্রেমক্ষেত্রে। শরৎচন্দ্রীয় বা বিভূতিভূষণীয় নায়কদের সঙ্গে পার্থক্য এইমাত্র : অমিত কথা বলে উচ্চকণ্ঠে, অপরকে শোনায় সে; আর অপুরা কথা বলে মনে-মনে, নিজেকেই মাত্র শোনায়।

॥ ছয় ॥

॥ হরিহর ও অপু ॥

বিভূতিভূষণের 'স্বর্গীয় পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কথক ছিলেন।' ('উপেক্ষিত গ্রামতীর্থ—জাহেদ আলী, স্বাধীনতা, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৬৪) বিভূতিভূষণ তাঁর ডায়রীতে (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪৫) 'বাবার দেশভ্রমণের বাতিক'এর কথা উল্লেখ করেছেন। এই বৃত্তি ও বাতিক দুটোই হরিহরে বর্তমান। খুব সম্ভবত মহানন্দকে দেখেই বিভূতিভূষণ হরিহর চরিত্র অঙ্কনের প্রেরণা পেয়েছিলেন।

আরো দুটো গুণ হরিহরে প্রবল। এক, আত্মসম্মানবোধ; দুই, Micawber-সুলভ আশাবাদ।

অপু উত্তরাধিকার-সূত্রে হরিহরের এই স বিশিষ্টগুলিই পেয়ে হরিহর সাংসারিক জীবনে ব্যর্থ, কোন অর্থ সম্পদ সে রেখে যেতে পারে নি অপুর জন্যে। হরিহরের মনোবৃত্তিগুলিই অপুর পৈতৃক সম্পত্তি। সার্থকভাবেই হরিহর অপুর জনক। অপুও কৃতী সন্তানের মত এই সম্পত্তিকে আরও বাড়িয়েছে। অপুর মধ্যে ঐ মনোবৈশিষ্টগুলি আরো পরিস্ফুট হয়েছে, আরো উজ্জ্বল হয়েছে। অপু হরিহরের সম্পূর্ণতর রূপ।

হরিহরও বোধহয় এটা বুঝত। কাশীর ঘাটে অপু হরিহরের কথকতা শুনতে যেত বলে সে খুশী হয়েছিল। আর দরিদ্র ও অসুস্থ হরিহরের কাছে অপু যখন লেখা ছাপার জন্যে টাকা চেয়েছে, তখন সর্বজয়াকে লুকিয়ে সে-টাকা দিয়ে হরিহর এক আশ্চর্য তৃপ্তি লাভ করেছে। অপু লেখে এ খবর শুনে সে রীতিমত খুশী। এটা শুধু

স্নেহমাত্র নয়। হরিহরের মধ্যেও একটা শিল্পিমন ছিল; তার কথকবৃত্তি, তার গ্রন্থ-সংগ্রহের প্রবণতা সেই দিকেই ইঙ্গিত করে। তার মধ্যেও একটা সুদূর তৃষ্ণা ও রোমান্স-পিপাসা ছিল যার জন্যে সে বিবাহোত্তর দশটি বছর নিরুদ্দেশে কাটিয়েছে। হরিহর বুঝতে পেরেছিল, অতৃপ্ত পিপাসা অপুর মধ্যে দিয়ে এক বিস্ময়কর তৃপ্তির পথ খুঁজছে, তাই নিদারুণ দারিদ্র্য ও অসুস্থতা সত্ত্বেও চারটি টাকা সে অপুর হাতে তুলে দিয়েছে।

অপুও যত বড় হয়েছে, হরিহরের এই রূপকে সে তত ভাল করে উপলব্ধি করেছে। হরিহরের জীবন সংগ্রামে পরাজিত মূর্তি, অপুর মনে কোন বিশেষ ছাপ রাখে নি। বাবা যে তাকে অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে যায় নি, এ জন্য তার কোন ক্ষোভ ছিল না, কারণ অর্থে সে অতৃষ্ণ। বাবার কথক-শিল্পী রূপই তার মনে সাড়া জাগিয়েছে। হরিহরের মৃত্যুর পর তার সৎকার-অন্তে অপু ভেবেছে, 'যে বাবাকে সকলে মিলিয়া আজ মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করিতে আনিয়াছিল,—রোগে জীবনের যুদ্ধে পরাজিত সে বাবা স্বপ্ন মাত্র—অপু তাহাকে চেনে না, জানে না—তাহার চিরদিনের একান্ত নির্ভরতার পাত্র, সুপরিচিত, হাসিমুখ বাবা জ্ঞান হইয়া অবধি পরিচিত সহজ সুরে সুকণ্ঠে প্রতিদিনের মত কোথায় বসিয়া যেন উদাস পূরবীর সুরে আশীর্বচন গান করিতেছে—কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ…' (পথের পাঁচালী, পৃঃ ২০৭)।*

অপু তার প্রকৃতি-প্রীতি ও রোমান্স-পিপাসারও মূল অনুসন্ধান করেছে উত্তরাধিকারেঃ 'নিরাবরণ মুক্ত প্রকৃতির এ আহ্বান, রোমান্সের আহ্বান—তার রক্তে মেশানো, এ আসিয়াছে তাহার বাবার নিকট

---

* বিভূতিভূষণ তাঁর পিতার মৃত্যু-দৃশ্য বর্ণনা করেছেন তাঁর ডায়রীতে এইভাবে: 'বাবা আড়ংঘাটা থেকে ঘোর জ্বরে অভিভূত হয়ে বাড়ী ফিরে দাওয়ায় উঠেই প্রথম কথা বলেছিলেন—খোকা কৈ, খোকা? অথচ তিনি জানতেন আমি বোর্ডিং-এ আছি। সেই অসুখ থেকে আর তিনি ওঠেন নি। জীবনের সেই প্রথম শোক। সে কি অপূর্ব অনুভূতির দিনগুলো—তার কি তুলনা আছে? হাজার বছর বাঁচলেও কি সে সব দিনের কথা ভুলবো কখনও!' (তৃণাঙ্কুর, পৃঃ ৫৭)। —

হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে—বন্ধনমুক্ত হইয়া ছুটিয়া বাহির হওয়া, মন কি চায় না বুঝিয়াই তাহার পিছু পিছু দৌড়ানো…’

হরিহরের আছে অক্ষয় আশাবাদ। নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও তার আশা মরে না। প্রতিদিনই সে আশা করে—এইবার একটা কিছু হয়ে যাবে; এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে ওঠে। এই আশার প্রলোভনেই হরিহর নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ করে একদিন কাশীযাত্রা করেছিল।

অপুর মধ্যেও এই অক্ষয় আশাবাদ অত্যন্ত সক্রিয়। মা-র দারিদ্র্য ও দুঃখ ঘোচাবার জন্য সে কত অসম্ভব আশাই পোষণ করে। পাঁজি-বিক্রী, ঘুড়ির দোকানে চাকরি প্রভৃতি নানারকমের কর্ম-কল্পনা তার। সর্বজয়া সব শোনে, পুত্রের অনভিজ্ঞ তরুণ মনের উল্লাসকে পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার চাপে শ্বাসরোধ করে মারতে তার মায়া হয়, তাই কিছু বলে না। কিন্তু অপুর আশাদীপ্ত চোখ দুটি দেখে তার মনে পড়ে হরিহরের কথা: ‘এ আশার দৃষ্টি, এ হাসি, এ সব জিনিষ সর্বজয়ার অপরিচিত নয়। দেশে নিশ্চিন্দিপুরের ভিটাতে থাকিতে কতদিন, দীর্ঘ পনেরো ষোল বৎসর ধরিয়া মাঝে মাঝে কতবার স্বামীর মুখে এই ধরণের কথা সে শুনিয়াছে! এইবার একটা কিছু লাগিয়া যাইবে—এইবার ঘটিল, অল্পই দেরী। নিশ্চিন্দিপুরের যথা-সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া পথে বাহির হওয়ার মূলেও সেই সুরেরই মোহ।’ (অপরাজিত, পৃঃ ৪)।

অপু কলেজ-জীবনে নিরন্ন দিন কাটিয়েও আত্মসম্মানবোধে ও সঙ্কোচে কারুর কাছে হাত পাততে পারে না; ভিক্ষার মতন অশ্রদ্ধাভরে দেওয়া মুদ্রাটির দিকে তাকিয়ে অবিনীত প্রৌঢ় দাতাকে হরিহরও একদিন বলেছিল, ‘আজ্ঞে, ও আপনি রাখুন, আমি এমনি কারুর কাছে নিইনে—আমি শাস্ত্র পাঠ-টাট করি—তা ছাড়া কারুর কাছে —আচ্ছা থাক।’ (পথের পাঁচালী, পৃঃ ১৫৪)।

॥ সাত ॥

॥ অপুর উত্তরপুরুষ ॥

বিভূতিভূষণ শেষ জীবনে হয়তো তাঁর চরিত্রগুলির বৈচিত্র্যহীনতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। 'বিভূতীয়' নায়কের ব্যতিক্রম হিসেবেই বোধহয় তিনি বিপিনকে (বিপিনের সংসার) সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। লেখক যেন যথেষ্ট সচেষ্টভাবেই তাকে 'অ-বিভূতীয়' রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি একাধিকবার উল্লেখ করেছেন যে বিপিন তাড়িখোর, লম্পট, দেহবুভুক্ষু, যা বিভূতিভূষণের অন্য কোন নায়কই নয়। কিন্তু লেখক নিজমুখেই বারবার ঐ ছাপগুলো মেরেছেন বিপিনের গায়ে, বিপিনের আচরণের ভেতর থেকে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে ওঠে নি। লেখকের দেওয়া বিশেষণগুলো বরং মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে তার আচার-ব্যবহারে। বিপিনের মধ্যে পানাসক্তি, লাম্পট্য বা দেহবুভুক্ষা কিছুরই তেমন প্রমাণ মেলে না। বরং বিপিনও বিভূতি-ভূষণের অন্য সব নায়কের সঙ্গে এক পর্যায়ে দাঁড়ায় ; প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্ময় ও প্রীতিবোধ, পূর্বস্মৃতি রোমন্থনের ঈষৎ বিষাদ-মিশ্রিত আনন্দ. আবছা একটা দার্শনিকতা, বৈদেহী প্রেম সম্পর্কে সূক্ষ্ম ধারণা— এ সবই বিপিনের মধ্যে বর্তমান। এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলিই বিপিনকে বিভূতিভূষণের অন্য নায়কের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড় করিয়েছে। বিপিন দাঁড়িয়েছে এসে অপুর পাশে। সে অপুরই রক্তে চিহ্নিত তার উত্তরপুরুষ। এদিক থেকে বলা যায়, বিভূতিভূষণের সচেতন প্রয়াস সফল হয় নি, তাঁর আত্মভাবপরায়ণতা বিপিনকে রেহাই দেয় নি।

॥ আট ॥

॥ সর্বজয়া ও অপু ॥

বিভূতিভূষণের গতানুগতিক নারীচরিত্র থেকে সামান্য স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে 'বল্লালী বালাই' পর্বের সর্বজয়া—ইন্দির ঠাকরুণের সঙ্গে তার নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য। কিন্তু এই ইন্দির-বিরূপতার কারণও তার অতিরিক্ত স্নেহশীলতা। যে-দারিদ্র্যে পুত্রকন্যারা প্রায় অভুক্ত থাকে, সেখানে 'কোথাকার কে তার ঠিকানা নাই, কি তাহার সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজিয়া মেলে না, বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিতেছে!' (পৃঃ ৪)। দারিদ্র্য ছাড়াও বিরূপতার কারণ সর্বজয়ার আছে—এটা তীব্র বাৎসল্য-বোধেরই এক ঈর্ষাদিগ্ধ প্রতিক্রিয়া। সর্বজয়া ইন্দিরকে সহ্য করতে পারে না, কারণ 'আজকাল তাহার আরও মনে হয় যে ঐ বুড়ী ডাইনী সাতকুলখাগীটাকে তাহার মেয়ে যেন তাহার চেয়েও ভালবাসে। হিংসা তো হয়ই, রাগও হয়। পেটের মেয়েকে পর করিয়া দিতেছে।' (পৃঃ ১৬)। সর্বজায়ার নিষ্ঠুরতার মূলে তার এই মাতৃত্ববোধ।

অবশ্য 'বল্লালী বালাই' পর্ব পার হওয়া মাত্র সর্বজয়া সম্পূর্ণ ভাবে দলে মিশে গেছে। ইন্দির-বিরূপতার জন্য প্রচ্ছন্ন একটা অনুতাপও যেন শেষ জীবনে তার মনে এসেছে।

'বল্লালী বালাই' শেষ হবার পর সর্বজয়ার বাৎসল্য আগের মত তির্যক ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করে নি, করবার দরকার হয় নি। তখন উজ্জ্বল আশার সময়ে, বা কারও অভিশাপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, কিংবা বেদনাহত মুহূর্তে সর্বপ্রথম তার মনে হয়েছে তার সন্তানদের

কথা। হরিহর যেদিন বড়লোকের বাড়ীতে মন্ত্রদানের আহ্বান পায়, সর্বজয়া তক্ষুনি অতি-আগ্রহের সঙ্গে সে-আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বলে, কারণ 'ছেলেটার কাপড় নেই—দু'তিন যায়গায় সেলাই, বাছা আমার তাই পরে হাসিমুখে নেচে নেচে বেড়ায়—আমার এমন হয়েচে যে একদিকে বেরিয়ে যাই—'। বেলোয়ারী কাচে হীরকখণ্ড ভ্রম ক'রে সর্বজয়া মনে মনে বলে, 'এই কষ্ট যাচ্চে সংসারের—বাছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিও—দোহাই ঠাকুর।' (পৃঃ ৫০) একটি নারকেলের জন্যে যখন সেজঠাকরুণ শাপ-শাপান্ত সুরু করেন তখন সর্বজয়া পিঁড়ে উঠে তুলসীতলায় প্রণাম জানায় আর বলে, 'দোহাই ঠাকুর, ওদের তুমি বাঁচিয়ে বর্তে রেখো ঠাকুর। ওদের তুমি মঙ্গল কোরো। তুমি ওদের মুখের দিকে চেও।' (পৃঃ ৫৯)। যেদিন বড়বাবু 'দামী বেত' দিয়ে অপুকে 'সুশিক্ষা' দিলেন, সেদিন 'রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে সর্বজয়ার গা ঝিমঝিম করিতে লাগিল,··· তাহার অপুর গায়ে হাত !···তাহার কি কোনো বুদ্ধি আছে? কত লাগিয়াছিল, কে তাহাকে বুঝিয়াছে সেখানে, কে শুনিয়াছে তাহার কান্না?' (পৃঃ ২২৯)

কিন্তু এত মমতা দিয়ে যাকে সর্বজয়া বড় করে তুলল, একদিন তার সঙ্গেই লাগল বিরোধ। সর্বজয়া অপুকে স্নেহবশে যে-গণ্ডীর মধ্যে রাখতে চায় সে-খাঁচাকে অস্বীকার করে মুক্তপক্ষে বেরিয়ে পড়ার বাসনা অপুর।

মার কাছে ছেলের জন্ম হয় দু'বার। এক, তার প্রথম জন্ম, যেদিন সন্তান মার দেহমনের ভিতর-আশ্রয় ত্যাগ করে ভূমিকে স্পর্শ করে। কিন্তু তখনও সন্তান মাতৃনির্ভর, মার দেহমনের বাহির-আশ্রয় তার অবলম্বন। মা দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েও বাহুর বন্ধনে তাকে বেঁধে রাখে। কিন্তু একদিন বাহুর বন্ধন ছিন্ন করবারও সময় আসে, সন্তান অনন্যনির্ভর হতে চায়, সাবালকত্বের দিকে পা বাড়ায়।

এইটাই মার কাছে সন্তানের দ্বিতীয় জন্ম। এই দ্বিজত্বপ্রাপ্ত সন্তান পাখায় ভর দিয়ে বাইরের আকাশের আস্বাদ পেতে চায়, মার দেহমন তখন তার নাগাল পায় না। নব-উদ্বোধিত ব্যক্তিত্বের আলোক সর্বাঙ্গে জড়িয়ে সন্তান মার কাছে অপরিচিত হয়ে যেতে সুরু করে। দু'টি জন্মের দিনই মার কাছে বেদনার; প্রথম জন্মে দৈহিক, দ্বিতীয় জন্মে মানসিক। ছেলে যখন একটু বড় হয় তখন সব মা-ছেলের সম্পর্কের মধ্যেই এই সূক্ষ্ম বিরোধের পালা অভিনীত হয়।

সাধারণ মা-ছেলের তুলনায় সর্বজয়া অপুর মধ্যে এই বিরোধ অনেক বেশী তীব্র। তার কারণ এদের উভয়ের চরিত্রের মধ্যে নিহিত। সর্বজয়ার সারা জীবনের স্বপ্ন—একটি স্বচ্ছল সংসার, একটি সুন্দর ঘর। আর অপুর প্রাণমন বহির্জগতের জন্য অতি-তৃষার্ত। সর্বজয়া ঘরকে গুছিয়ে তুলতে চায়; অপু বাইরে ছড়িয়ে পড়তে চায়। সর্বজয়ার স্বপ্ন ঃ 'বেশ তো সংসার গুছাইয়া উঠিতেছে। আর বছর কয়েক পরে ছেলের বিবাহ—তারপরই একঘর মানুষের মত মানুষ।' (অপরাজিত, পৃঃ ২০)।

মনসাপোতায় এসে 'সর্বজয়ার স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে।'

'কিন্তু অপুর তাহা হয় নাই।'—এ কথাটা সর্বজয়ার স্নেহার্ত হৃদয় বুঝতে চায় না। অপু ঠাকুর পূজা ছেড়ে দুই ক্রোশ দূরের আড়বোয়াল স্কুলে যেতে চায়, এবং তার স্বপ্ন-পরিধি ঐ দুই ক্রোশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আরও দূরতর দিগন্তে তার যাত্রা-প্রয়াস। সর্বজয়ার সস্নেহ সংসারী মন আশা করেছিল, 'হয়তো ছেলে শেষ পর্যন্ত বিদেশে যাইবার মত করিবে না।' কিন্তু 'অপু যে পিছনের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। সে যে এত খাটিয়া, একে-ওকে বলিয়া কহিয়া তাহার সাধ্যমত যতটা কুলায়, ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনের অবলম্বন একটা খাড়া করিয়া দিয়াছিল—ছেলে তাহা পায়ে দলিয়া যাইতেছে—কি জানি কিসের টানে! কোথায়? তাহার স্নেহদুর্বল

দৃষ্টি তাহাকে দেখিতে দিতেছিল না যে, ছেলের ডাক আসিয়াছে বাহিরের জগৎ হইতে। সে জগৎটা তাহার দাবী আদায় করিতে তো ছাড়িবে না—সাধ্য কি সর্বজয়ার যে চিরকাল ছেলেকে আঁচলে লুকাইয়া রাখে?' (পৃঃ ২৮)।

মা-ছেলের এই বিরোধের বেদনা অপুর চেয়ে অনেক বেশী অনুভব করেছে সর্বজয়া—বোধহয় সব মা-ই তাই করে। অপুর অভাবে সর্বজয়ার মন হু-হু করে, 'যেন কেহ কোথাও নাই, একটা অসহায় ভাব, মনের উদাস ভাব।' (পৃঃ ১৫৩)।

আর অপু বহির্জগতের রূপরস-পানের নেশায় মত্ত হয়েছে। সময় সময় মার জন্য তার মন উতলা হয় সন্দেহ নেই কিন্তু যতই বয়স বেড়েছে ততই মা-কে তার একটি বন্ধন-বিশেষ মনে হয়েছে। সর্বজয়ার মৃত্যু তাই তাকে যতটা বেদনা দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী দিয়েছে বন্ধন-মুক্তির আনন্দ।

যে-সর্বজয়া ছেলেমেয়ের জন্য 'চুরিই যে কত করিয়াছে তাহার কি ঠিক আছে?', যে 'ছেলেমেয়েকে খাওয়াইতে অমুকের গাছের কলার কাঁদিটা, অমুকের গাছের শসাটা লুকাইয়া রাখিত তক্তপোষের তলায়,' যে-সর্বজয়া ছেলেমেয়েদের খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করবার জন্য 'সারাজীবন ধরিয়া শুধু দুঃখ ও অপমান' সয়েছে (পৃঃ ১৫৪), তার মৃত্যুতে অপুর অনুভূতির 'প্রথম অংশটা আনন্দ-মিশ্রিত।' অপুর মনে 'একটা যেন মুক্তির নিশ্বাস, একটা বাঁধন-ছেঁড়ার উল্লাস—অতি অল্পক্ষণের জন্য—নিজের অজ্ঞাতসারে।' তারপরেই এ জন্যে তার দুঃখ ও আতঙ্ক হয়েছে। 'এ কি! সে চায় কি! মা যে নিজেকে একেবারে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার সুবিধার জন্য! মা কি তাহার জীবনপথের বাধা? কেমন করিয়া সে এমন নিষ্ঠুর এমন হৃদয়হীন...! তবুও সত্যকে সে অস্বীকার করিতে পারিল না। মাকে এত ভালবাসিত তো, কিন্তু মায়ের মৃত্যুসংবাদটা

প্রথমে যে একটা উল্লাসের স্পর্শ মনে আনিয়াছিল—ইহা সত্য—সত্য—তাহাকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই।' (পৃঃ ১৫৬)।

একবার অপুর বয়স যখন তিন বৎসর, তখন সে হারিয়ে গিয়েছিল। পাড়ার সব লোক জড় হয়ে অক্রুর মাঝিকে দিয়ে যখন ডোবা-তে জাল ফেলবার উদ্যোগ করছে, তখন দুর্গা অপুকে খুঁজে এনে হাজির করল। অপু সোনাডাঙ্গার মাঠের দিকে হনহন করে হাঁটছিল। সর্বজয়া পুত্রের এই বহির্মুখিতা দেখে স্বামীকে বলেছিল, 'ও কখ্‌খনো সংসারে মন দেবে না, তোমাকে ব'লে দিলাম—এ আমার কপালেই লেখা আছে।' (অপরাজিত, পৃঃ ৫৮)। সর্বজয়ার এই আশঙ্কা বেশ কিছুটা পরিমাণে সত্য হয়েছিল।

মা-ছেলের এই বিচিত্র সম্পর্কের উপকরণ বিভূতিভূষণ সংগ্রহ করেছেন তাঁর নিজেরই জীবন থেকে। তিনি তাঁর ডায়রীতে এর পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন ঃ 'হরি রায়ের জমিটুকু নেবার কথা মা যখন সইমাকে অনুরোধ ক'রেছিলেন, তখন তিনি জানতেন না যে ছেলে তাঁর ঘর-কুনো গেরস্ত গোছের ছাপোষা গেঁয়ো মানুষ হবে না। সে দেশে দেশে বহু দূরে বহু সমাজে পাহাড়ে পর্বতে ঘোড়ায় ষ্টিমারে ট্রেণে—সারা জগতের অধিবাসী হয়ে বেড়াবে। জীবনের যাত্রাপথের সে হবে উৎসাহী উন্মত্ত পথিক—পথের নেশাতেই ভোর। মা ছিলেন গৃহলক্ষ্মী, ঐ দরিদ্র ঘরে বিবাহ হওয়া পর্যন্ত এসে অল্প সাজিয়ে গুছিয়ে চালিয়ে গিয়েছেন। সেই চাল ভাজা—সেই সব। ঘরকন্না সাজাবার বুদ্ধি যেমন মেয়েদের থাকে, তার বেশী তারা কিছু জানে না, বোঝেও না। মাও ছিলেন তেমনি। মা চিরদিন ঐ বাঁশবনের ঘাটে, তেঁতুলতলায় শান্ত জীবন-যাত্রা, সঙ্কীর্ণ ছোট গণ্ডীর মধ্যেই কাটিয়ে গিয়েছেন—সে জীবনের বাইরে তিনি অন্য কোনো জীবনের সন্ধানও জানতেন না। তাই তাঁর সজনে গাছ পোঁতা হরি রায়ের জমি নেবার পরামর্শ, বিয়ে না করতে চাওয়ায় সংসার উলটে গেল এই

ভাবে কান্না—যেন সত্যই তাঁর সংসার উলটেই গেল— ; তাঁর সংসার —আমার সংসার নয়। মাথার উপরের নক্ষত্রজগতের দিকে চেয়ে দেখলাম, এই জীবন ঐ পর্যন্ত বিস্তৃত। কত এরকম জ্যোৎস্না রাত্রি, কত এরকম যাওয়া আসা, কত জীবনানন্দ।...আমায় দূরে যেতে হবে—বহুদূর।' (স্মৃতির রেখা। ক্যালকাটা পাবলিশার্স সংস্করণ, পৃঃ ৯১—৯২)।

'তৃণাঙ্কুরে' বিভূতিভূষণ স্পষ্টভাবেই বলেছেন, 'সর্বজয়ার একটা অস্পষ্ট ভিত্তি আছে—আমার মা।' সঙ্গে অবশ্য যোগ করেছেন, 'কিন্তু যারা আমার মাকে জানে, তারাই জানে সর্বজয়ার সবখানি আমার মা নন।' (পৃঃ ৬৭)। সব লেখকের সব মডেল সম্পর্কেই বোধহয় শেষের কথাটি প্রযোজ্য।

॥ নয় ॥

॥ দুর্গা ও অপু ॥

বিভূতিভূষণের কোন জীবনী আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে নেই। সে-অভাব তিনি নিজেই অংশত পূরণ করে দিয়ে গিয়েছেন তাঁর ড়ায়রীগুলিতে। সেখানে পিসিমার (ইন্দির-ঠাকরুণ ?) কথা আছে, 'দেশভ্রমণের বাতিক'-গ্রস্ত বাবার উল্লেখ আছে (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪৫), মা-র কথা তো আছেই, আর আছে অতি-সংক্ষিপ্তভাবে দিদির উল্লেখ।

স্মৃতির রেখার এক জায়গায় (পৃঃ ৪৮) বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'এই সব জ্যোৎস্নায় যে কার মুখ মনে পড়ে। এই মৃদু হাওয়ায় তার স্পর্শ আছে···ছেলেবেলাকার সেই নবীন শিশিরসিক্ত প্রভাতগুলি দিদির মুখের হাসি মাখানো, মায়ের হাসি মাখানো।'

আর একটি যায়গায় (পৃঃ১০৪) দিদি ও দুর্গা এক হয়ে মিশে গিয়েছে ঃ 'সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি অনেকদূরের আমার গ্রামের চড়কতলার মেলা থেকে হাসিমুখে ছেলেমেয়েরা মেলা দেখে ফিরে যাচ্ছে—কারুর হাতে বাঁশের বাঁশী, কারুর হাতে মাটির রং করা ছোরা, মাটির পাল্কী।...আজকের নিস্পাপ অবোধ দায়িত্বহীন জীবন কোরক-গুলোর পঁচিশ বৎসরের ভবিষ্যত জীবনের ছবি কল্পনা করতে বড় ভাল লাগে। * দিদি দুর্গা যেন রুক্ষ চুলে হাসিমুখে আঁচলে কদমা বেঁধে নিয়ে মুচকুন্দ-চাঁপার অন্ধকার তলাটা দিয়ে বাড়ি ফিরছে—।—অপু—ও অপু—তোর জন্যে কত খাবার এনেছি দ্যাখরে,—ও অপু। পঁচিশ বৎসরের পার থেকে ডাক আসে।' +

---

* চড়কতলার মেলার ঠিক এই বর্ণনা 'অপরাজিত'-তে আছে।

\+ 'তৃণাঙ্কুরে' অবশ্য দুর্গাকে 'কল্পনাসৃষ্ট' বলেছেন। তবে অপু যে তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গে জড়ানো তা তাঁর নিজ মুখের স্বীকৃতি লাভ করেছে এখানে : অপুকে জন্ম থেকে ৩৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি কলমের ডগায় সৃষ্টি করেচি। তাকে ছাড়তে সত্যিকার বেদনা অনুভব করচি--তবে সে ছিল অনেকখানিই আমার নিজের সঙ্গে জড়ানো—'(পৃঃ ৬৮)।

এই চরিত্রটি শুধু দুর্গা রূপে নয় আরো অনেক রূপে বিভূতি সাহিত্যে দেখা দিয়েছে। যেমন, 'পুঁইমাচা' নামক বিখ্যাত গল্পের নায়িকা ক্ষেন্তি, কিংবা 'গায়ে হলুদ' গল্পের পুঁটি। ক্ষেন্তি দুর্গারই মত তৈলাভাবে চুল-রুক্ষ, দরিদ্র খাদ্য-লোভী পাড়া-বেড়ানী তলা-কুড়ুনী মেয়ে। সামান্য একটু-আধটু চুরিও এরা দুজনেই করেছে। অবশ্য চুরি করলেও, ঐ সর্বজয়ার মতোই, চরিত্রের গভীরে এরা কেউ অসৎ নয়। 'দুর্গার উঁচু নজর নাই' (পৃঃ ১৫৩), বন-বাদাড় ঘেঁটে নানা খাদ্য ও অখাদ্য সে সংগ্রহ করে, হরিহরকে খুব বেশী হলে আনতে বলে একখানা সবুজ হাওয়াই কাপড়, আর একপাতা ভাল আলতা। আর ক্ষেন্তি মেটে আলু আর পুঁই পাতাতেই সন্তুষ্ট। উভয়েরই সজীব, বাড়ন্ত, কিশোরপ্রাণ অকালমৃত্যুর দ্বারা খণ্ডিত। মৃত্যুর পরে একজনের ছোট লোভটুকু মাটির কলসীতে লুকোনো সোনার কৌটোর মধ্যে দম আটকে বন্দী হয়ে রইল, আর একজনের ছোট লোভটুকু মাটির স্নেহে বর্ষার জলে ও কার্তিক মাসের শিশিরে প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপূর হয়ে উঠল। আর ঐ লোভটুকুর ওপর নির্ভর করেই উভয়ের জীবন-কারুণ্য মৃত্যুকে অতিক্রম করে গেল।

'গায়ে হলুদে'র পুঁটির সঙ্গে দুর্গার সাদৃশ্য এত ব্যাপক নয়। নীরেন সম্পর্কে দুর্গার অপরিণত মনে যে অস্ফুট কোমল অনুভূতি উদয় হয়েছিল, সেই অনুভূতির ক্ষেত্রেই এদের মিল। দুজনেরই স্বপ্নানন্দে ব্যাঘাত ঘটেছে বাস্তবের আঘাতে।

দুর্গার এই অস্ফুট প্রেমবাসনাকে বিভূতিভূষণ অবশ্য তেমন বিশদ করে দেখান নি। যেমন অপুর বেলায়, তেমনি দুর্গার বেলাতেও প্রেমচেতনা ছাড়া অন্যান্য চেতনার বিকাশগুলির দিকে লেখকের লক্ষ্য বেশী। প্রেমিকা দুর্গা 'পথের পাঁচালী'তে একেবারেই গৌণ। মুখ্য ভূমিকা তার কন্যা ও দিদি হিসেবে, পিসিমা ও সঙ্গিনীদের

সান্নিধ্যে এক গ্রামীণ বালিকা হিসেবে।

দুর্গার চরিত্রে অদ্ভুত একটা জীবনীশক্তি আছে। খেলা, ঝগড়া, লোভ, চুরি ও দুরন্তপনার মধ্য দিয়ে এই জীবনীশক্তি সারাগ্রামে পরিব্যাপ্ত। এইটেকেই বার বার শাসনে সংযত করতে গিয়ে নাজেহাল হয়েছে সর্বজয়া।

সর্বজয়া হয়তো ততটা জানতো না যে দুর্গার জীবনীশক্তি আর একটা সূক্ষ্মপথেও বিকাশলাভ করছিল। যে সস্নেহ মাতৃমন বিভূতিভূষণের নারীদের বিশিষ্টতা, তা অবাধ্য অবয়স্ক মেয়েটির মধ্যেও দেখা যাচ্ছিল। ইন্দির ঠাকরুণ যখন মুঠোর পর মুঠো উঠিয়ে পাত্র নিঃশেষ করে ফেলে দুর্গাকে বলে—ওমা তোর জন্যে দুটো রেখে দেলাম না, তখন ছ' বছরের লোভী মেয়েটা বলে—তা হোক পিতি, তুই খা—। এই অতি-বৃদ্ধ লোভার্ত অসহায় শিশুটিকে ঘিরে দুর্গার মাতৃমনের প্রথম অস্ফুট প্রকাশ। তার ছোট বুকখানা দিয়েই যেন সে ইন্দির ঠাকরুণকে সর্বজয়ার ক্রোধদৃষ্টির আড়ালে রাখতে চায়। কিন্তু তার সামর্থ্য অতি-অল্প। সর্বজয়ার প্রবল আঘাতে সে অসহায় বোধ করে, এবং আড়ালে চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। যখন তার বয়স বাড়ে, তখন অসহায় নির্বোধ ও অভিমানী ভাইটিকে অবলম্বন ক'রে তার মাতৃমন একটা পরিণতির দিকে যাচ্ছিল। মধ্যপথেই 'জননীর প্রতিনিধি'র জীবন খণ্ডিত হয়ে গেছে। এই পথে দুর্গা বিভূতিভূষণের অন্যান্য নারীর পাশে এসে দাঁড়াচ্ছিল। অনেকটা কাছে এসেও গিয়েছিল। যতটুকু ব্যবধান ছিল তা মূলত বয়সের, মৌলিক চরিত্রের নয়। এই বয়সের ব্যবধানটুকু অবশ্য দুর্গা কোনদিনই আর অতিক্রম করতে পারল না, তেরো বছরেই বিভূতিভূষণ তাকে আমাদের কাছে থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

এইখানে একটা প্রশ্ন আছে। উপন্যাসের দিক থেকে দুর্গার মৃত্যুর উপযোগিতা কি? এই মৃত্যু কি কাহিনীর অপরিহার্য দাবী? যদি সে দাবী থাকে, তা কোথায় এবং কিভাবে?

দুর্গা তার জীবনীশক্তির বলে এত সজীব ও সক্রিয় একটা ভূমিকা নিয়েছে যে সে হয়ে যাচ্ছিল বইয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র। পাঠকের দৃষ্টি তার ওপরেই পড়ছে প্রধানত। শিশু অপু তার মানস-জগৎ নিয়ে যেন আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। 'পথের পাঁচালী'র প্রথমার্ধের মুখ্য চরিত্র দুর্গা। তাকে সরিয়ে এই মুখ্য স্থানটা অপুকে দেওয়ার জন্যই কি এই মৃত্যু-আয়োজন ? কিন্তু সে-প্রয়োজন তো অন্য অনেক উপায়েই মেটানো যেত ; দুর্গাকে বিয়ে দিয়ে দূরদেশে পাঠিয়ে দিলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হত। এই মর্মান্তিক জীবনাবসানের কী দরকার ছিল ?

বিভূতিভূষণ কি তাহলে বইয়ের ঢিমে-তেতালা গতি এবং ঘটনা-বিরলতা দেখে পাঠক-জনপ্রিয়তা সম্পর্কে হতাশ হয়ে আকস্মিক একটা মৃত্যু ঘটিয়ে দিলেন ? অপুর সূক্ষ্ম মানস-বিকাশের ওপর তিনি পূরো আস্থা রাখতে পারেন নি ? পাঠক-আকর্ষণের জন্য অহেতুক করুণরস সৃষ্টি করলেন ?

উপন্যাসের দুর্গার একটা বড় প্রয়োজন ছিল। অপুকে হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে সে বনাঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিল। (অবশ্য অপু যে পরিবেশে মানুষ তাতে সে একা অনন্যানির্ভর প্রকৃতি জীবনের পরিচয় তার কোন সন্দেহ নেই। তবু অতি ছোটবেলায় দিদির নেতৃত্বে সে অগ্রসর হয়েছিল, সে-কথা স্বীকার্য। দুর্গা সন্ধান করেছিল খাদ্য-ফল-মূল, অপু অন্য কিছু।) আর এই পর্বের জীবনমাধুর্য দুর্গার সান্নিধ্য ব্যতীত বোধহয় সম্পূর্ণ প্রকাশ করাও যেত না। এই কাজ শেষ হবার পর যেন দুর্গার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। কিন্তু প্রয়োজন মেটা মাত্রই কি লেখক একটা মৃত্যু ঘটিয়ে দিতে পারেন ? সেই চরিত্র ও কাহিনীর মধ্যে থেকে মৃত্যুটা কি স্বভাবতই হয়ে উঠল ?

শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বের অতি-প্রধান চরিত্র ইন্দ্রনাথের আকস্মিক অবলুপ্তির যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু

সমালোচকরা দেখিয়েছিলেন যে ইন্দ্রনাথ চরিত্রের আসক্তিহীনতা ও স্বভাব-ঔদাসীন্য থেকেই ঐ ঘটনাটি উদ্ভূত, রাহুগ্রস্ত নায়ক শ্রীকান্তকে উদ্ধার করবার জন্য ঘটনাটি লেখক কর্তৃক আরোপিত নয়। দুর্গার মৃত্যুরও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

লেখকের স্বপক্ষে হয়তো এই ধরণের একটা কথা বলা যায়ঃ এ উপন্যাস অন্যভাবে লেখা, সাধারণ উপন্যাসে ঘটনাগুলি কার্য-কারণশৃংখলে গ্রথিত এবং কেন্দ্রীয় বিষয়ের প্রয়োজনানুসারে নির্বাচিত ও বিন্যস্ত। 'পথের পাঁচালী'-তে তা নয়। এখানে জীবনকে তার স্বভাব-নিয়মে চলতে দেওয়া হয়েছে, ছাঁটাই-বাছাই করা হয় নি সে-জীবনধারার। এর মধ্যে থেকেই অপুর মনের বিকাশ ঘটছে। অপুর মনোবিকাশের দিক থেকে সব ঘটনা সমান তাৎপর্যপূর্ণ নয়। কোনটার গুরুত্ব বেশী, কোনটার কম, কোনটা প্রায়-তাৎপর্যহীন ও অপ্রাসঙ্গিক। এই সামগ্রিক স্বভাবজীবনের প্রেক্ষাপটে অপুর জীবন রেখাকে অঙ্কিত করাই লেখকের উদ্দেশ্য।

এই ব্যাখ্যা সকলের কাছে গ্রহণীয় হবে না। ইদানীং কালের উপন্যাসে স্বভাবজীবনের অঙ্কন এক দল ঔপন্যাসিকের উপজীব্য, ব্যাখ্যাটা এই কারণে মাত্র উল্লেখ্য।

বিভূতিভূষণের মানসপ্রবণতার ইঙ্গিত অনুসরণ করলে আরো কিছু দূর হয়তো অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

অপু একাধারে বিভূতিভূষণ স্বয়ং এবং বিভূতিভূষণ মানসআদর্শ। বিভূতিভূষণের জীবনের ওপরই অপুর ভিত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন মানুষ হিসেবে তাঁর যা কিছু বাস্তব বাধা সেগুলিকে কল্পজগতে অতিক্রম করেছেন তিনি অপুরই মাধ্যমে। তাই অপু বিভূতিভূষণের জীবন-কাঠামোর মধ্যে থেকেও তাঁর আত্মার আদর্শ-দ্যুতিতে ভাস্বর। বাস্তব-জীবনের বহু স্থূল বাধা যেখানে বিভূতিভূষণের পক্ষে অনতিক্রম্য, সেখানে তিনি অপু-মাধ্যমে তাঁর আদর্শ-ভূমিতে উত্তরণ করেছেন।

বিভূতিভূষণের মনে একটা প্রবল তৃষ্ণা আছে সুদূরের জন্য। কোন মানুষের জীবনেই এ তৃষ্ণার নিবারণ সম্পূর্ণত হতে পারে না, অংশত খণ্ডিত হবেই। কারণ এই তৃষ্ণার বিরুদ্ধতা করবে মানুষের স্থূল জৈবিক সত্তা। এই নিয়তি-নির্দিষ্ট বিড়ম্বনাকে বিভূতিভূষণ অপুর মধ্যে দিয়ে বহু সময়ে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। বহু বন্ধন, যা বাস্তব জীবনে সম্পূর্ণ ছেদন করা নানা কারণে দুরূহ, কল্পলোকে তা ছিন্ন করে মুক্তপক্ষ আকাশ-চারণ তাঁর সাধ্যায়ত্ত; এবং সেই কল্পায়ত্ত পথে তিনি বাস্তবের স্থূল শৃঙ্খলকে বহুলাংশে মোচন করেছেন।

দুর্গা অপুকে ঘর থেকে বাইরে এনে বহির্জগতের স্বাদ দিয়েছিল, তৃষ্ণা জাগিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে অপুর চঞ্চল ডানাকে স্নেহভালবাসার বাঁধনে বেঁধেও রাখছিল। অন্য তেমন লেখকের হাতে এই বিষয়বস্তু পড়লে তিনি এই বন্ধন ও মুক্তিপ্রয়াসের দ্বন্দ্বকে, নীড় ও আকাশের বিরোধকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হয়ত দেখাতেন। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত চরিত্রে কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির বিচিত্র সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের পরিচয় আছে। কিন্তু আগেই উল্লেখ করেছি বিভূতিভূষণের ঝোঁক দ্বন্দ্বকে এড়ানোর দিকে। বিষয়টা পরিস্ফুট দ্বন্দ্বের আকারে আসবার আগেই তিনি একটা পক্ষের মূল-উৎপাটন করেছেন। দুর্গার মৃত্যু ঘটেছে সেইজন্যে, অপুর বহির্যাত্রার প্রথম পদক্ষেপের সঙ্কেত এই মৃত্যু। নিশ্চিন্দিপুরের পৈতৃক বাস তুলে দেওয়ার মূলে তো দুর্গার অকালমৃত্যু। দারিদ্র্যও হয়তো একটা কারণ, কিন্তু দারিদ্র্য তো সর্বজয়ার সংসারে চিরকালই ছিল। 'দুর্গার মৃত্যুর পর হইতেই সর্বজয়া অনবরত স্বামীকে এ গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য তাগিদ দিয়া আসিতেছিল, হরিহরও নানাস্থানে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই।' (পৃঃ১৫৬)।

চেষ্টা শীঘ্রই সফল হল, আর অপু প্রথম পা বাড়াল গ্রামের বাইরে। ক্রোশ তিনেক দূরের গঙ্গানন্দপুরে সংক্ষিপ্ত একটি প্রস্তাবনা সেরে অনেক ক্রোশ দূরের কাশীতে এসে উঠল সে। 'অপরাজিত' অপুর

প্রথম বিজয় ঘোষিত হল, অপরাজিত কথাটায় লেখক মানুষের অন্য কোন অপরাজেয় বৃত্তির আলোচনা করেন নি, শুধু যে আবেগ ও আনন্দের গতি জীবনকে পরিচালিত ও পরিস্ফুটিত করেছে তারই হিসেবে মানুষের জয়-পরাজয়ের মীমাংসা করেছেন লেখক। সাধারণত মানুষের জীবন-সংগ্রাম বলতে যা বোঝায়, সে জীবন-সংগ্রামের জয়কে দ্যোতিত করতে চান নি তিনি। সকল বাধা-বন্ধনকে জয় করে ক্রমাগত চলমান অপরাজিত অপু। 'অপরাজিত' 'পথের পাঁচালীর'ই উত্তরখণ্ড। একটিতে যাত্রার সূচনা, আর একটিতে বিস্তার। পথের দেবতা পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক অপুর ললাটে পরিয়ে তাকে ঘরছাড়া করেছেন। সেখানে দুর্গা বা অন্য কারুর জন্যেই দাঁড়াবার সময় নেই। পথের দেবতাই যেন দুর্গাকে পাঠিয়েছিলেন অপুকে ঘরের দোরে আকাশের আলোয় দাঁড় করিয়ে দেবার জন্য। যে-মুহূর্তে সে আলোক-সুধা পান করে নেশা ধরে গেল অপুর, সেই মুহূর্তেই দুর্গা পথের বাধা হয়ে দাঁড়াল। পথের দেবতা—বিভূতিভূষণের মানস-আদর্শের পরিচালিকা শক্তি—নির্মমভাবে তাকে পথ থেকে সরিয়ে দিলেন। বাস্তবজীবনে হয়তো অনেক সময় বিভূতিভূষণের দূর-যাত্রা ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু অপুকে তিনি বাধাগ্রস্ত.বন্ধনাক্রান্ত হ'তে দেবেন না।

যদি শুধু এই একটি মৃত্যুই ঘটত সারা উপন্যাসে, তাহলে আমাদের এ সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে কিছুটা দুর্বল হ'য়ে যেত। কিন্তু এর স্বপক্ষের সাক্ষী রয়েছে আরো অনেকগুলি মৃত্যু। এই উপন্যাস পথের বাধাকে ছিন্ন করে এগোবার কাহিনী। এই ছিন্নবাধা গতির একদিকে চলমানতা অন্যদিকে বাধা। কিন্তু এই দুয়ের সংঘাত তীব্র হবার আগেই বাধার মূলোচ্ছেদ লেখকের কাম্য। এক দুর্গাতেই এই উচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়নি, একটা বাধা অপসারিত হয়ে প্রথম পদক্ষেপের সহায়তা করেছে মাত্র। দুর্গা যতটুকু মুক্তি দিল, সে মুক্তিরও তো সীমা আছে। সে-অগ্রগতিও তো একটা, যায়গায় গিয়ে আটকায়। বাধা তো মাত্র

একটি নয়, বহু। তাই এই উপন্যাসে মৃত্যুও বহু। দুর্গা, হরিহর, সর্বজয়া, অনিল, অর্পণা, লীলা—ভালবাসার নিগূঢ় নাগপাশ যাদের হাতে ছিল তাদের সবাইকে সরে যেতে হয়েছে। অপুর ক্ষেত্রে চাকরীগুলি যেমন একের পর এক বর্জিত, মানুষগুলিও তেমনি। সর্বজয়ার মৃত্যুতে অপুর যে উল্লাস, তার মধ্যে দিয়েই এই মৃত্যুগুলিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। প্রশ্ন উঠতে পারে অপর্ণা সম্পর্কে। যদি সরিয়ে নেওয়াটাই উদ্দেশ্য হয়, তবে অপর্ণাকে আকস্মিকভাবে আনা হল কেন। আর প্রশ্ন থাকে কাজল সম্পর্কে।

অপুর মনের ক্রমবিকাশ দেখাবার সময় লেখক তার প্রেমচেতনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন। একটা মনের এত সর্বাঙ্গীন পরিচয় দিতে গিয়ে বিষয়টাকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। সেটা করলে অপুর মানসিক অঙ্গহানি ঘটে। তাই অপর্ণাকে আনা হল। ঐ সূত্রে প্রেমের রোমান্স-রস পান করল অপু, (তথা বিভূতিভূষণ)। প্রকৃতিরাজ্যের রোমান্স-রসে ডুবে ছিল অপু, একবার চোখ তুলে নারীপ্রেমের রোমান্স-টার স্বাদ নিয়ে নিল। এই এক উদ্দেশ্য ছিল অপর্ণাকে আনবার; আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—কাজল। এই উদ্দেশ্য পূরণ হবার সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণাকে লেখক বিদায় দিয়েছেন; কাজলের জন্মের পর এক মুহূর্তও দেরী সয় নি তাঁর। অপর্ণার আবির্ভাব আকস্মিক, তিরোভাব তার চেয়েও অপ্রত্যাশিত।

অপর্ণা চলে গেল, রেখে গেল কাজলকে। এই শিশুকে আপাতদৃষ্টিতে বন্ধন বলে মন হতে পারে, কিন্তু তাকে সেভাবে দেখাটা ঠিক হবে না। বিভূতিভূষণের বিশেষ আনন্দ পূর্বস্মৃতিরোমন্থনে। বিশেষত বাল্যস্মৃতি তার মনের কাছে সুধাবৎ। তাঁর মনের একটা পা যেমন সুদূরের দিকে, অন্য পা তেমনি বাল্যের দিকে। একটা পা ভবিষ্যতের দিকে, অন্য পা অতীতের দিকে। এই বাল্যজীবন-তৃষা তাঁর দূর-তৃষ্ণারই একটা প্রকারভেদ। মানুষের কাছে তার বাল্য-

জীবনটাও কম দূর নয়, বরং আরো বেশী দূর, কারণ অগম্য। আরো বেশী মনোরম, কারণ স্মৃতির ও বিস্মৃতির তুলিতে রঙ্গীন। বর্ত্তমানের কাছ থেকে ভবিষ্যৎ যতদূর, অতীত তার চেয়ে বেশী দূর। কারণ প্রতিটি মুহূর্ত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে দেয় আর অতীতের কাছ থেকে সরিয়ে আনে। অথচ লেখকের কাছে অতীতের বাল্যজীবন স্মৃতি ও কল্পনার রঙে-রসে এক বিচিত্র-সুন্দর রূপকথার রাজ্য। সে-রাজ্যের সবটুকু অমৃত যেন ঐ বয়সে পান করা সম্ভব হয় নি, এখন একবার সেখানে যেতে পারলে সোনার কাঠি সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসত। কিন্তু বাল্যে ফেরার ত কোন পথ নেই। পথের ওপর প্রাচীর উঠেছে বলেই সেটা টপকাবার আগ্রহও বেশী বিভূতিভূষণের। কিন্তু এ প্রাচীরের মাথা আকাশে, পা মাটিতে। এ প্রাচীর ডিঙ্গোনো যায় না। অথচ প্রাচীরের ওপারে সেই স্বর্গোপম রাজ্য। তাই অভিসার তার বাল্যের দিকে, এবং A Door in the Wall-এর সন্ধান। কাজলই সেই door, পাঁচিলের গায়ে দরজা, অবরোধ-গাত্রে খচিত সেই চতুষ্কোণ অবকাশ। H. G. Wells দরজাটা দেখেছিলেন, খুলতে পারেন নি। বাহির-দুয়ারে কপাট লেগে থাকে, ভিতর-দুয়ারই খুলতে হয়, তা জানতেন বিভূতিভূষণ। খুলেওছিলেন তিনি। কাজল তাঁর সেই দ্বার। কাজলের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ (ও অপু) বাল্যস্বর্গের স্মৃতিসুধা আবার পান করেছেন। বাল্যস্মৃতির রসপানে তাঁর অরুচি নেই।

অপু চব্বিশ বৎসরের ব্যবধানে এসেও নিশ্চিন্দপুরকে নতুন কোন রূপে দেখে না, কারণ 'চব্বিশ বৎসরের অনুপস্থিতির পর অবোধ বালক অপু আবার নিশ্চিন্দপুরে ফিরিয়া আসিয়াছে।' (অপরাজিত পৃঃ ৪০৮)। অর্থাৎ কাজল অপুর (তথা লেখকের) সত্তারই একটা অংশ। কাজল দূরযাত্রায় পিছুটান নয়, বরং অতীত-সুদূরের অভিসারে সারথি। বন্ধন নয় সে,·বরং এক ধরণের মানস-মুক্তি।

রাণী নদীর ঘাট থেকে ফেরবার মুখে প্রথম দিন কাজলকে দেখে

থতমত খেয়ে গিয়েছিল—সেই অপু না—ছেলেবেলার সেই অপু! পরে জানল—না, অপু নয়, অপুর ছেলে। আরো পরে কাজলকে দেখে আবার সে ভেবেছিল, চব্বিশ বৎসর অনুপস্থিতির পর অবোধ বালক অপু আবার নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে এসেছে।

অপু নিজেও তার শৈশব-জীবনে প্রত্যাবর্তনের আকৃতিকে স্পষ্ট করেই প্রকাশ করেছে। নিশ্চিন্দিপুরের বনদেবী বিশালাক্ষী যদি অপুকে দেখা দেন তবে দেবী-অপু সংলাপটা এইরকম হওয়া তার কাম্য :

—তুমি কে ?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভাল ছেলে। তুমি কি বর চাও ?

—অন্য কিছুই চাইনে ; এ গাঁয়ের বনঝোপ, নদী, মাঠ, বাঁশ-বাগানের ছায়ায় অবোধ, উদগ্রীব, স্বপ্নময় আমার সেই যে দশবৎসর বয়সের শৈশবটি—তাকে আর একটিবার ফিরিয়ে দেবে, দেবী ?

—"You enter it by the Ancient Way
Through Ivory Gate and Golden,"

(অপরাজিত, পৃঃ ৪০৬)।

অপুর মন যখন ফিজি ও সামোয়ার অভিসারী, তখনও সে ভাবে : 'আমিই তো বড় হয়ে জীবনে কত জায়গায় গেলুম, কিন্তু জীবনের ঊষার মুক্তির প্রথম আস্বাদের সে-পাগল-করা আনন্দের সাক্ষাৎ আর পাই নি—তাই রেবাতটের সেই বেতস তরুতলেই অবুঝ মন বার বার ছুটে ছুটে যায়ই যদি, তাকে দোষ দিতে পারি কৈ ?' (অপরাজিত, পৃঃ ৩১৬)

শৈশবভূমি তো এখন তার কাছে একটা দেশ মাত্র নয়, তার সঙ্গে আরো বড় কিছু। দেশভূমির স্মৃতি-আরতি করতে করতে অপুর 'রাখালের বাঁশীর সুরের ওপারের যে দেশটি অনন্ত তার কথাই মনে ওঠে।' (অপরাজিত, পৃঃ ৩৯৭)।

অপুর মনের আলো সারা শৈশব-ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে এক মোহময় সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। মৃত দুর্গার শ্মশানভূমিও এই কল্প-আলোকে নবজীবন লাভ করেছে। ছাতিমতলার শ্মশানে যেখানে দুর্গা শুয়ে আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে অপুর মনে হয়েছেঃ 'আজ চব্বিশ বৎসর ধরিয়া সাঁঝ-সকালে তার আশ্রয় স্থানটিতে সোনার সূর্য-কিরণ পড়ে। বর্ষাকালের নিশীথে মেঘ ঝর-ঝর জল ঢালে, ফাগুন দিনে ঘেঁটুফুল, হেমন্তদিনে ছাতিমফুল ফোটে। জ্যোৎস্না উঠে। কত পাখী গান গায়। সে এ সবই ভালবাসিত। এ সব ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই কোথাও।' (অপরাজিত, পৃঃ ৩৯৩)।

অথচ বাস্তব দুর্গার কিন্তু প্রকৃতিপ্রীতির এত বিশদ পরিচয় আমরা পাই নি। শ্রীকুমারবাবুর ভাষায় 'দুর্গা অপুর ন্যায় প্রকৃতির সঙ্গে কোন নিবিড় একাত্মতা অনুভব করে নাই; বন্য ফল ও উজ্জ্বল লতা-পাতা অপেক্ষা কোন নিগূঢ়তর উপহার সে প্রকৃতি দেবীর প্রসারিত হস্তে দেখিতে পায় নাই।...বহিরঙ্গণে দুটা তুচ্ছ ফল-ফুল আহরণে ব্যস্ত রহিয়াছে।'

শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে অপু বাস্তবের এই দুর্গাকে দেখে নি। নিজের মনের আলোয় সে তাকে নতুন ক'রে দেখেছে, যে-রূপ দুর্গার ছিল না সেই রূপে তাতে সাজিয়েছে। পরিবর্তনটা এত বেশী যে দুর্গা আর দুর্গা নেই, অনেকটা যেন অপু হয়ে গিয়েছে। দুর্গার জীবন-কাঠামোকে অপুর শিল্পীমানস তার মনের মত করে সৃজন করেছে।

সাহিত্য সৃষ্টিতে বিভূতিভূষণ বাস্তবজগৎ অপেক্ষা নিজের মানস-জগতের গুরুত্ব কত বেশী দিয়ে থাকেন, এই অসঙ্গতি তার খুব বড় প্রমাণ।

॥ দশ ॥

॥ 'পরিচয়'-'বিচিত্রা'-সংবাদ ॥

'বিচিত্রা'-র সঙ্গে বিভূতিভূষণের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। 'পথের পাঁচালী' এখানেই প্রকাশিত হয়। পূর্বোল্লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের দান' প্রবন্ধটিও তিনি লেখেন এখানে। 'বিচিত্রজগৎ'-এর স্বাদও কিছুটা তিনি গ্রহণ করেন 'বিচিত্রা'-র পাতায়; এখানে প্রায় নিয়মিতভাবে এই 'ফীচার'-টি তিনি লিখতেন।

আর 'পরিচয়' ছিল তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচনার পত্র। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসেবে এটি আত্মপ্রকাশ করে ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে। (অর্থাৎ 'বিচিত্রা'-র চার বছর পরে। 'বিচিত্রা'-র প্রথম প্রকাশ পয়লা আষাঢ়, ১৩৩৪) এর লেখকগোষ্ঠীতে অত্যন্ত কৃতী ব্যক্তিরা যোগদান করেন। 'পরিচয়'-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, "প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাবগঙ্গার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহাইয়া দেওয়া। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পরিচয়' বাঙালী পাঠককে উপহার দিতে অভিলাষী, কখনো মূলভাষার অনুসরণে আলোচনা করিয়া, কখনো বা ভাষান্তরের সাহায্য লইয়া, কখনো সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া, কখনো বা. মূলানুগ অনুবাদ করিয়া। এই সঙ্গে মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকেও পরিচয়' তাহার দৃষ্টি সদাজাগ্রত রাখিবে। কবিতা; কথা শিল্প, নাটক, কলানুশীলন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব —পরিশীলনের সকল বিভাগগুলিই যাহাতে উচ্চ আদর্শে

অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠে এ বিষয়ে 'পরিচয়' সাধ্যমত চেষ্টা করিবে।" *
(সম্পাদকীয়, প্রথম বর্ষ; প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৮)।

এই আদর্শ যে সর্বাংশে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে, তা নয়। কিন্তু পুস্তক সমালোচনার ক্ষেত্রে 'পরিচয়' একটি অত্যন্ত উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এইটি 'পরিচয়'-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। সম্পাদনায় 'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগটির অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হোতো। এই বিভগটির জন্য পৃষ্ঠার বরাদ্দ ছিল অবিশ্বাস্য রকমের বেশী, এবং সে পৃষ্ঠাগুলি অপব্যয়িত হয় নি, আলোচনার অধিকাংশগুলিতেই বিশিষ্টতা ও গভীরতা থাকত। আজও 'পরিচয়'-এর পুরাতন সংখ্যাগুলির পাতা উলটে গেলে এই বিভাগটির ঐশ্বর্যে বিস্মিত হতে হয়।

'পরিচয়'-এর পাতায় বিভূতিভূষণের একাধিক বইয়ের সমালোচনা হয়েছিল; সমালোচক ছিলেন বিশিষ্ট কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা। এ আলোচনাগুলির গুরুত্ব আছে। এর কোন কোন মতে 'বিচিত্রা'র লেখকদের কারো কারো আপত্তি ছিল। তাঁদের সে-আপত্তি 'বিচিত্রা'য় প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিতও হয়েছিল। এতে বিভূতিভূষণকে বোঝার পক্ষে উপকার হয়েছে। আজ সে-বিতর্কের উত্তাপটুকু অবসিত; আজ বিভিন্ন সমালোচকদের আলোচনার ফসল যুক্তির দ্বারা ঝাড়াই-বাছাই ক'রে তার সেরা অংশটুকুকে আমরা ঘরে তুলতে পারি।

'অপরাজিত'-র সমালোচনা করেন নীরেন্দ্রনাথ রায়। (পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৩৯)। এই লেখার কয়েকটি বক্তব্যে 'বিচিত্রা'র কারো কারো আপত্তি ছিল, এবং সে-আপত্তি তাঁদের একজন পরে প্রবন্ধাকারে

---

* ডাঃ সুকুমার সেন বাংলা সাময়িক পত্রের ধারায় 'পরিচয়'-এর স্থান নির্দেশ করেছেন এইভাবে: 'আমাদের সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'পরিচয়'-এর স্থান 'সবুজপত্রের' পরেই। তবে 'সবুজপত্রে'র আদর্শের সঙ্গে 'পরিচয়'-এর আদর্শের তফাৎ অনেকখানি।...

'...পরিচয়ে আর যাই থাক প্রবল প্রোপাগাণ্ডা ছিল না এবং যাহাকে বলে দলাদলি তাহাও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ হইতে কনিষ্ঠতম লেখক পর্যন্ত সকলেরই জন্য পরিচয়ের পাতা খোলা থাকিত।' (বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩২৩)

জানিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধগুলি এখন দুস্প্রাপ্য। তাই এখানে পর পর দীর্ঘ প্রবন্ধ দুটিরই মূল বিষয় অবিকৃতভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে দিয়ে দিচ্ছি। তাতে পাঠকদের নিজেদের মত স্থির করতেও সুবিধে হবে।

নীরেন্দ্রনাথের মতে, বিভূতিভূষণ অত্যন্ত 'সৌভাগ্যশালী লেখক', কারণ তাঁর প্রথম বই যে 'খ্যাতি ও স্তুতি' লাভ করেছে, তা বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের ভাগ্যে জোটে নি। সমসাময়িক প্রতিষ্ঠার অনেক স্থানেই কতগুলি সাময়িক কারণ থাকে। বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রেও তা কিছুটা আছে। কলকাতার নিয়ত-বর্ধমান প্রভাব সত্ত্বেও 'বাংলার সামাজিক জীবন প্রধানতঃ পল্লী কেন্দ্রিত।' সহরবাসী শিক্ষিতদেরও প্রায় সকলে পল্লী থেকে সদ্য-বিচ্ছিন্ন। সহুরে জীবনের নিন্দা এবং 'পল্লীজীবনের সহজ সরল অনাড়ম্বরতার গুণগানে' আমাদের স্কুল-কলেজ মুখরিত। তৃষ্ণা আছে আমাদের পল্লীর জন্য। 'বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত সামাজিক উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোট গল্প পল্লীজীবনকে অবলম্বন' করে গড়ে ওঠার ফলে এঁদের 'কবি-প্রতিভার জ্যোতিঃতে বাংলার পল্লীশ্রী আমাদের কল্পনানেত্রে ধরাধামে সুখস্বর্গের শোভায় বিরাজিত ছিল।' কিন্তু 'পল্লীসমাজ'-এর 'নিষ্করুণ' এবং 'অবিতর্কিত' চিত্র পূর্বস্বপ্নকে ভেঙ্গে পল্লীর দলাদলি, ম্যালেরিয়া, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতির রূঢ় রৌদ্র বিস্তার করল। সেই ধাক্কায় ও হয়তো আরো নানা কারণে বাংলা সাহিত্য অতিমাত্রায় সহরমুখী হয়ে পড়ল। তাছাড়া একদল 'পশ্চিমানুরক্ত' লেখক য়ুরোপীয় আধুনিকতার কোঠায় ওঠবার চেষ্টায় 'অনেকস্থলে মূলহীন ভাব ও অবাস্তব চরিত্রের প্রবর্তনে সাহিত্যক্ষেত্রে সমুদ্র-মন্থনের কোলাহল সৃষ্টি করিলেন, যাহা হইতে কেহ বলিলেন অমৃত উঠিতেছে, কেহ বলিলেন গরল।' * পল্লীগ্রামে নাড়ী-বাঁধা বাঙ্গালী পাঠক যখন এই বিপর্যয়ে আত্মহারা,

---

* 'পশ্চিমানুরক্ত' লেখক বলতে নীরেন্দ্রনাথ বোধহয় এখানে কল্লোল-গোষ্ঠির লেখকদের বোঝাতে চেয়েছেন।

তখন সঙ্কটত্রাণের বার্তা আনলেন বিভূতিভূষণ। বাঙ্গালী পাঠক তার 'একান্ত প্রিয় স্বদেশী বস্তু' পেয়ে পুলকিত হল।

কিন্তু এ প্রসঙ্গ বাদ দিলেও, বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যকে 'স্থায়ী' কিছু দিয়েছেন।

বিভূতিভূষণ সতর্কতার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এলাকার পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। তাঁর পল্লীচিত্র শরৎচন্দ্রের চিত্রকে সমর্থনও করে না, প্রতিবাদও করে না, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে। শরৎচন্দ্র এঁকেছেন পল্লীসমাজ, বিভূতিভূষণ এঁকেছেন পল্লীগৃহ, তাও সম্পূর্ণ নয়, সর্বজয়ার সংসারে হরিহরের অস্তিত্ব অত্যন্ত ক্ষীণ।

ইন্দির-ঠাকরুণের মৃত্যুর ঘটনাটিতে নীরেন্দ্রনাথের আপত্তি আছে। এ ঘটনা, তাঁর মতে, পল্লীগ্রামে প্রায় অসম্ভব। বাংলার পল্লীসমাজ যতই পাপদুষ্ট কলঙ্ক-জর্জরিত হোক, কিছু 'হিতবুদ্ধি ও ক্ষমতা'-ও তার আছে, যা মুমূর্ষুর সেবায় গৃহস্থকে বাধ্য করে। গ্রামের এক পাশে থাকলেই কোন পল্লী-পরিবার সমাজ-নিরপেক্ষ হয় না।

তবে নীরেন্দ্রনাথ পাঠকদের এই কথা মনে রাখতে বলছেন, 'কোন প্রকৃত পল্লীর অবিকৃত চিত্রাঙ্কন বিভূতিবাবুর মুল উদ্দেশ্য নহে; তিনি চাহিয়াছেন, বাংলার বাঁশবনে-ঘেরা ঘন-শ্যামল পল্লীগ্রাম দুটি সদ্যজাগ্রত, গ্রহণশীল, উপভোগ-সমর্থ শিশুচিত্তের উপর কি ছাপ ফেলে, কোন প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে, তাহাই আঁকিয়া দেখাইতে। তাঁহার নিশ্চিন্দিপুরকে সাধারণ পরিণতমন মানুষের চোখ দিয়া দেখিলে চলিবে না, তাহাকে দেখিতে হইবে দুর্গা-অপুর বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখ দিয়া। বিস্ময়বোধ কাব্যানুভূতির উৎস ও বিভূতিভূষণ বিস্ময়বোধের কবি। শিশুচিত্ত বিস্ময়বোধের প্রথম ও প্রধান আধার; তাই 'পথের-পাঁচালী'র সুবৃহৎ আয়তন তিনি শিশুচিত্তের বিকাশের ইতিহাসে ভরাইয়া তুলিয়াছেন। এই দিকে তাঁহার শক্তি অনন্যসাধারণ, ও তাঁহার কীর্তি বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়। বিস্ময়বোধের ফলে, বস্তু-বিশ্ব

সম্বন্ধে তাঁহার চোখ-নাক-কান আশ্চর্য রকমে খোলা ও সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীগ্রামের তুচ্ছতম গাছ-গাছালির পাখ-পাখালির খুঁটিনাটিও তাঁহার লক্ষ্য এড়াইয়া যায় নাই।···বর্ণে গন্ধে স্বাদে শব্দে পল্লী-লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও যেরূপ প্রচুর, বিভূতিবাবুর বর্ণনাও সেইরূপ সমৃদ্ধ। বহিঃপ্রকৃতির সানুরাগ পর্যবেক্ষণ শক্তিতে তাঁহার আসন সুবিখ্যাত ডব্লিউ, এইচ, হাড্‌সন্‌-এর শ্রেণীতে অকুণ্ঠ অধিকার বলে বসানো যাইতে পারে, ইহার অতিরিক্ত প্রশংসা ভাবোচ্ছাস বলিয়া বোধ হয়।'

'অপরাজিত'-র পরিচয় প্রসঙ্গে অপরিহার্যবোধে 'পথের পাঁচালী'-র এই আলোচনা করে নিয়েছেন নীরেন্দ্রনাথ, কেননা 'অপরাজিত' স্বতন্ত্র উপন্যাস নয়, শেষোক্ত গ্রন্থেরই সম্প্রসারণ। তবে অপুর জীবন-কাহিনী হলেও 'অপরাজিত' ঠিক 'পথের পাঁচালী'র 'সমধর্মী রচনা নহে। যে ক্ষুদ্র পল্লী-বিশ্বের গণ্ডির ভিতর অপুর বাল্যজীবন কাটিয়াছে, বয়স বাড়ার সঙ্গে তাহাকে চিরদিন সেখানে আবদ্ধ রাখা সম্ভব হইল না। বলা যাইতে পারে, 'পথের পাঁচালী'-র প্রধান চরিত্রই হইয়াছে নিশ্চিন্দিপুর। 'অপরাজিত'-য় নিশ্চিন্দিপুর দূরে মিলাইয়া গিয়াছে, চোখের উপর হইতে মনের আড়ালে স্থান পাইয়াছে। যাহা প্রত্যক্ষ ছিল, তাহা হইয়া উঠিয়াছে স্মৃতি। গ্রীক পুরাণে বলে মিউজ-রা নিমোজিনী-র কন্যা, অর্থাৎ স্মৃতিই কবিতার জননী। বিভূতিভূষণ যে কবি, ও তাঁহার কবিত্ব সে স্মৃতিমূলক, তাহার প্রভূত নিদর্শন 'অপরাজিত'-য় পাওয়া যায়, যখন-তখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে নিশ্চিন্দিপুরের কথা অপুর মনে পড়িয়া যায়, ও কোন অদৃশ্য অঙ্গুলির পরিচালনায় স্মৃতির জলতরঙ্গ টুং-টাং করিয়া বাজিয়া ওঠে। সামান্য কয়টি কথার ভাবগর্ভ প্রয়োগে বাংলার পল্লীশোভা রূপ পরিগ্রহ করে। শুধু বাংলা দেশ কেন, প্রকৃতির অন্য দৃশ্যও যে বিভূতিভূষণের কবিত্বশক্তিকে উদ্বোধিত করিতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মধ্যপ্রদেশে বিন্ধ্যারণ্যের সুবিস্তৃত বর্ণনা। ভাষার লালিত্যে, ভাবের

ঘনত্বে, পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতায় তাহার তুলনা বাংলা ভাষায় দুর্লভ।'

নীরেন্দ্রনাথের আলোচনার এই অংশ পর্যন্ত 'বিচিত্রা'-গোষ্ঠীর বিশেষ আপত্তি নেই। আপত্তির কারণ পরবর্তী অংশে। সেই অংশটা বিস্তৃতভাবে তুলে দিচ্ছিঃ 'কিন্তু মানবমনের কারবার ত শুধু বস্তু-বিশ্বকে লইয়া নহে, বুদ্ধির জন্য, তৃপ্তির জন্য, আনন্দের জন্য তাহাকে মানবজগতেও চলাফেরা করিতে হয়। মানব জগতের বৈচিত্র্যের অবধি নাই, মানুষের সংস্পর্শে আমাদের অন্তর-লোক যে-বিকাশ লাভ করে তাহার রহস্যের আদি-অন্ত নাই। বিভূতিবাবু তাঁহার রচনায় এই মানবজগতকেও প্রতিবিম্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গতির পথে অগ্রসর হইতে গিয়া অপু যে কত বিভিন্ন ধরণের নর-নারীর জীবন-বৃত্তকে ছেদ করিয়া গেল, বিভূতিবাবু সযত্নে তাহাদের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়। তিনি জীবনকে ব্যাপকভাবে দেখিতে চাহিয়াছেন—মস্তিষ্ক-প্রসূত কোন মতামতের পরকলার ভিতর দিয়া নহে। অনেক তুচ্ছ ঘটনা ও অবহেলিত প্রাণী তাই তাঁহার অনুকম্পালাভে বঞ্চিত হয় নাই। তাঁহার চিত্রপট বিস্তৃতপরিসর ও চিত্রশালিকা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ। তবুও মনে হয়, মানবচরিত্র অঙ্কনে তাঁহার দৃষ্টি অগভীর, অভিজ্ঞতা স্বল্প, শক্তি ক্ষীণ, ও সাফল্য সঙ্কীর্ণ-সীমাবদ্ধ। ইহার কারণ, প্রাকৃতিক জগতে সামান্য তৃণগুচ্ছ হইতে বিরাট নীহারিকা-পুঞ্জ ও নাক্ষত্রিক আকাশের নিকট তিনি নিজেকে যেমন ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছেন, মানবজগতে তাহা পারেন নাই।...মানবজীবন সম্বন্ধে ...exploration-এর, অনুসন্ধানের আভাস বিভূতিবাবুর রচনায় পাওয়া যায় না। আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা অত্যন্ত ভাসা-ভাসা, সাদামাটা মামুলি স্তরের। তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি হয় মামুলি ধরণে ভাল, না হয় মামুলি ধরণে মন্দ, না হয় মামুলি ধরণেই প্রাণহীন জড় পদার্থ—এতই মামুলি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের সম্বন্ধে

আরো জানিতে কোন কৌতূহল হয় না। তিনি নিজে লিখিয়াছেন বটে সকল বড় সাহিত্যের মূলে আছে মানব-বেদনা, কিন্তু বোধহয় উপলব্ধি করেন নাই সে বেদনার অনন্তরূপ, স্বুধু দারিদ্র্যের সহিত সংঘর্ষই তো তাহার একমাত্র প্রকাশ নয়। দারিদ্র্যের সহিত অপুর বিরোধও অত্যন্ত মামুলি ধরণের—কখনও খাইয়া কখনও না খাইয়া, কখনও চাকরি করিয়া কখনও না করিয়া অপু দারিদ্র্যকে বহিয়া চলিয়াছে মাত্র। একটা সহজ জীবনানন্দ ও রোমান্স্-প্রিয়তার দোহাই দিয়া গ্রন্থকার অপুকে সর্ববিধ অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রলোভন, প্রেমাবেগ, ভাববিপ্লব, আদর্শবিভ্রাট ইত্যাদি হইতে সযত্নে দূরে রাখিয়াছেন। অথচ এই সব অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারাই বালক মানুষ হইয়া ওঠে, মানুষ অতি-মানুষ হইবার আশা রাখে। জীবনের জটিলতাকে জানিলে তবেই জীবনকে জয় করা সার্থক—যে তাহা জানিল না সে কিসে অপরাজিত? তাহার সারা জীবনই ত অপরিণত। এই অতিকায় উপন্যাসখানির কোথাও জীবনের কোন জটিলতার সম্মুখীন হইবার প্রয়াস দেখা যায় না। ইহারই মধ্যে সবচেয়ে জটিল চরিত্র লীলা; সেও অত্যন্ত মামুলিভাবে জটিল। বড়ঘরের রূপসী বিদুষী তরুণী এক বিলাতফেরৎ বদ্-মেজাজ চরিত্রহীন বড়লোক স্বামীর অত্যাচারে কুলত্যাগ করিয়া অন্য এক তরুণ ব্যারিষ্টারের হাতে গিয়া পড়িল, যে তাহার সঞ্চিত অর্থ নির্বিকারে ফাঁকি দিয়া ফুঁকিয়া দিল। পরে সে থাইসিস্-এ আক্রান্ত হইয়া একদিন হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়া বসিল—এ কাহিনী কি সর্বজন-পরিচিত নহে? অপুর সহিত লীলার স্বল্পব্যক্ত প্রণয়-সম্বন্ধের প্রকৃতি এমনই অবাস্তব, ভিত্তি এতই শিথিল, যে তাহার গভীরত্বে বিশ্বাস করা রমণী-মন-অনভিজ্ঞ অপরিণত বয়সের বাহিরে সম্ভব বলিয়া বোধ হয়না। গভীরতার ও জটিলতার অভাবে কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরম দুর্বলতাই উপন্যাসখানির প্রধান ব্যর্থতা। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরিয়া এই বিমুখীনতার তথ্যবহুল বিবরণ পড়া ক্লান্তিদায়ক হইয়া উঠে। ছদ্মবেশী আত্মচরিতের বিপদই বোধহয়

এই যে যে-ছোটো ঘটনা গ্রন্থকারের নিকট দ্যোতনাপূর্ণ, তাহা পাঠকসাধারণের নিকট ব্যর্থ হইতে পারে, এ-চেতনা সহজেই লোপ পায়। খুঁটিনাটির বিবরণেও মাঝে মাঝে ত্রুটি ঘটিয়াছে। ইতুপূজা কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে না হইয়া পৌষ মাসের পিছনে চলিয়া গিয়াছে; সরস্বতী পূজা কোনকালেই মাঘমাসের কয়েক মাস পরে হইতে পারে না; পূজার ছুটির ঠিক পূর্বেই কলিকাতায় হকি খেলিবার সীজ্‌ন্ নয়; ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ্ সায়েন্‌স্ এণ্ড টেকনলজির ঠিকানা বোধহয় কেমব্রিজে নয়, লণ্ডনে। ......উপন্যাসকার হিসাবে, মানব চরিত্রের বিবৃতিকার হিসাবে বিভূতিভূষণ বড় বই লিখিলেও বড় লেখক নহেন।'*

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় 'বিচিত্রা'-র প্রায় নিয়মিত লেখক ছিলেন সে-আমলে। তিনি যে বিভূতিভূষণের ভক্ত পাঠক ছিলেন তার উল্লেখ 'তৃণাঙ্কুরে'র একাধিক স্থানে রয়েছে। যথা, 'নীহারবাবু বল্লে, ওর কে একজন দাদা 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে বলেচেন, অমন বই আর হবে না।' (পৃঃ ৬০)। আরো কয়েক পাতা পরে বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'একদিন নীহার রায়ের ওখানে গেলাম, সেখানে তার অনেক বন্ধুবান্ধব বসে আছে, 'অপরাজিত' সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হল। নীহার বল্লে—'অপরাজিত' একটা Great Book, আমি এঁদের সেই কথাই বলছিলাম, আপনি আসবার আগে।' (পৃঃ ৭৩)

নীরেনবাবুর প্রবন্ধের শেষাংশের সঙ্গে একমত না হওয়ার দরুণ ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বিচিত্রায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম 'অপরাজিত'। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ সালের কার্তিক সংখ্যায়, অর্থাৎ নীরেনবাবুর লেখাটি বেরোবার তিন মাসের মধ্যে। নীহারবাবু তাঁর প্রবন্ধের কোথায়ও নীরেন্দ্রনাথের আলোচনাটির নাম করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উক্ত আলোচনাটিই নীহারবাবুর

* মোহিতলালের উক্তি স্মরণীয়: 'তিনি (বিভূতিভূষণ) বড় ঔপন্যাসিক নহেন, একজন শক্তিমান সাহিত্যশিল্পী মাত্র।' (বর্তমান বাংলাসাহিত্য, সাহিত্যবিতান)

লক্ষ্য। তার প্রমাণ প্রবন্ধটির মধ্যেই আছে। অপু-চরিত্রের বিরুদ্ধ সমালোচনাটি নীহারবাবু যে ভাষায় উপস্থিত করেছেন, সেটা নীরেনবাবুর লেখারই প্রতিধ্বনি। গোড়াতেই নীহারবাবু বিরুদ্ধ সমালোচনাটি বর্ণনা করে নিয়েছেন এই ভাবে: 'অপুর জীবনে বৈচিত্র্য নেই, সে অপরাজিত নয়, অপরিণত—তার চরিত্র পরিণতি লাভ করে নি, তার চরিত্র চিত্রণের ভিতর অন্তর্দ্বন্দ্ব, আদর্শ-বিভ্রাট ইত্যাদি নেই, এবং বাইরেও তার যে দ্বন্দ্ব তা শুধু দারিদ্র্যের সঙ্গেই।'

এই বক্তব্যে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সায় নেই। তিনি বলেছেন, 'এ আপত্তি আমার মনেও এক সময় জেগেছিল। কিন্তু এখন মনে হয়, এর মুলে প্রমাণ খুব বেশী নেই। অপুর জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব কি? সেই নিশ্চিন্দিপুরের জীবন থেকে আরম্ভ করে তার জীবন কত বিচিত্র অবস্থা বিচিত্র ঘটনার ভিতর দিয়ে তো ক্রমে উত্তীর্ণ হলো—একটি অবস্থার সঙ্গে একটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে আর একটি অভিজ্ঞতার মিল কোথায়?'

বৈচিত্র্যহীনতার অভিযোগ সম্পর্কে নীহারবাবুর এইটুকুই বক্তব্য।

দ্বিতীয় বক্তব্য অপুর যৌনজীবন প্রসঙ্গে। এই প্রশ্নটি নীরেনবাবু তোলেন নি। নীহারবাবু প্রশ্নটি তুলে উত্তরও নিজেই দিচ্ছেন। প্রসঙ্গটা তুলেছেন এইভাবে, 'আমরা যে যুগে বাস করি, জানি এ যুগে প্রশ্ন উঠবে—পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর অপুর বয়স হলো, অপুর sex-life-এর কোনো পরিচয় আমরা পেলাম না!'

কিন্তু নীহারবাবু মনে করেন, 'এ প্রশ্ন করা অন্যায়—অপু লাজুক মুখচোরা, বড় হয়েও এ দোষ তার যায় নি—তার প্রকৃতিই romantic, আদর্শপ্রবণ, কল্পনাবিলাসী। তার nature-কে তো আমরা অস্বীকার করতে পারি নে, তা নিয়ে ঝগড়া করতে পারি নে—এটাকে আগে স্বীকার করে নিতে হবে, কারণ এটা আমাদের data, premise—তার প্রকৃতি অন্যভাবে গড়ে উঠল না কেন,

অন্যরকম হলো না কেন, এ তর্ক মিথ্যা, সাহিত্যবিচারের তর্ক এ নয়। তাছাড়া অপু যে আবেষ্টনের মধ্যে শৈশব কাটিয়েছে, যে আবেষ্টনে বড় হয়েছে, সে আবেষ্টন একটা সদা-জাগ্রত conscious sex-life বর্ধিত করার পক্ষে অনুকূল নয়।······ছেলেবেলায় এবং পরে বড় হয়ে অপুর সঙ্গে যে সব মেয়েদের পরিচয় হয়েছে তারা সকলেই একটা বিশেষ ধরণের মেয়ে···মঙ্গলরূপিনী······'

এর পরে, অপু অপরিণত—এই অভিযোগ খণ্ডন করতে সচেষ্ট হয়েছেন নীহারবাবু। এই বিষয়ে তাঁর মতটি প্রায় সম্পূর্ণই তুলে দিচ্ছি ঃ

"পথের পাঁচালীর অপু শিশু—'অপরাজিত'-র অপু ক্রমে ক্রমে বড় হয়েছে। কন্তু যৌবনোন্মেষের মধ্যে যে-অপুর পরিচয় সে-অপুর মধ্যে একটা শিশু-মন বরাবরই রয়েছে—এটাও অপুর প্রকৃতিগত এদিক দিয়ে অবশ্য বলা যায় অপুর চরিত্র পরিণতি লাভ করে নি, অপু অপরিণত—কিন্তু এই বিচার নিতান্তই বাইরের বিচার—ওপর-ওপর, ভাসা-ভাসা। যে-মনকে বললুম শিশুমন, সেটাকে শিশুমনের চেয়েও বলা উচিৎ বোধহয় চিরন্তন মন, যে-মন প্রকৃতির প্রত্যেক ভাষা ও ইঙ্গিতে সাড়া দেয়; কি শৈশবে, কি কৈশোরে, কি যৌবনে,—যে-মন আদর্শের স্বপ্নে বিভোর হয়, যে-মন কল্পনায় নৃত্য করে—সেই primitive unsophisticated mind। অপুর এই যে শিশু-চৈতন্য এ তো কোন বয়সের মধ্যে আবদ্ধ নয়—সে নিত্যকালের মধ্যে নিজেকে বিসর্পিত করেছে। পঁয়ত্রিশ বছরের অপু নিজেই বলে ঃ 'অন্য কিছু চাইনে, দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি—তাকে আর একটিবার ফিরিয়ে দেবে দেবী ?' (অপরাজিত)

"এদিক দিয়ে অপু সত্যই শিশু। কিন্তু তা বলে এ কথা বলা চলবে না যে অপুর চরিত্র পরিণতি লাভ করে নি, অপু অপরিণত। জীবন সম্বন্ধে অপুর যা philosophy, যা idealism সেটাকে যদি আমরা স্বীকার করি, তাহলে একথা আমরা বলতে পারি নে।···

"···নিশ্চিন্দিপুর আর মনসাপোতার অপু তো এক নয়—মনসাপোতার সেই পুরুতগিরি তো তাকে বাঁধতে পারে নি। ছুটে এলো স্কুলে পড়তে, সেখান থেকে কলকাতায় কলেজে—মন ক্রমে বড় হচ্ছে, তার স্বপ্নের পরিধি ক্রমে বাড়ছে, এখন সে সমস্ত পৃথিবীকে তার কল্পনার মধ্যে বেঁধেছে। এ কি অপরিণত মন? মন তার পরিণতি লাভ করেছে বলেই সেই শিশু অপু আর নেই বলেই তো ৩৫ বছর বয়সে অপু যখন নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে এলো, তখন—'সে নিশ্চিন্দিপুর আর নাই। এখন যদি সে এখানে আবার বাসও করে, সে অপূর্ব আনন্দ আর পাইবে না। এখন সে তুলনা করিতে শিখিয়াছে, সমালোচনা করিতে শিখিয়াছে, ছেলেবেলায় যারা ছিল সাথী—এখন তাদের সহিত আর অপুর কোন দিকেই মিশ খায় না—তাদের সঙ্গে কথা কহিয়া আর সে সুখ নাই, তারা লেখাপড়া শিখে নাই, এই পঁচিশ বৎসরে গ্রাম ছাড়িয়া অনেকেই কোথায়ও যায় নাই—সবারই পৈতৃক কিছু জমিজমা আছে, তাহাই হইয়াছে তাহাদের কাল। তাদের মন, তাদের দৃষ্টি পঁচিশ বৎসরের পূর্বের সেই বাল্যকালের কোঠায় আজও নিশ্চল।···কোন দিক হইতেই অপুর আর কোন যোগ নাই তাহাদের সহিত। বাল্যে কিন্তু এসব দৃষ্টি খোলে নাই।'

"অপরিণত যার মন সে এত বড় স্বপ্ন দেখতে পারে না, এত বড় আদর্শের পিছনে পাগল হয়ে ছুটতে পারে না; সে জীবনকে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে তারই আনন্দে নিজেকে মজিয়ে রাখে। কিন্তু যে অজানা অচেনা রহস্যের পিছনে নিশ্চিতের বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে যায়—তার মনকে অপরিণত বলবো কি করে? 'আজ যদি সে বিদেশে যায়, সমুদ্রপারে যায়—যে চোখ লইয়া সে যাইবে, নিশ্চিন্দিপুরে গত পঁচিশ বৎসর নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করিলে সে চোখ খুলিত না। একদিন নিশ্চিন্দিপুরকে যেমন সে সুখ দুঃখ দ্বারা

অর্জন করিয়াছিল—আজ তেমনি সুখ দুঃখ দিয়া সে বাহিরকে অর্জন করিয়াছে।' (অপরাজিত)

'তুচ্ছ জিনিষকে আঁকড়ে ধরে সে থাকে না, কোন কিছুতেই পরাজয় মানে না—এই অপু কি অপরিণত? একটা আদর্শপ্রবণতা একটা নিত্যকার অথচ স্পর্শকাতর শিশুমন, একটা সহজ সরল স্বচ্ছন্দ মন ও বিশ্বাস তার আছে বলেই অমরা যখন বলি সে অপরিণত, তখন আমরা কেবল আমাদেরই জীবনের পরিপ্রেক্ষণার পরিবর্তনের পরিচয় দিই; পরিণত জীবন সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান যুগের ধারণা দিয়েই অপুর বিচার করি। কিন্তু তা কি ঠিক? অপুরই জীবনকে দেখার ভঙ্গি দিয়ে অপুর বিচার করতে হবে। অপুর নিজস্ব যে প্রকৃতি, তার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—সেদিক দিয়ে সে পরিণতি লাভ করেছে কিনা সেটাই বিচার্য। আমার তো মনে হয় সেদিক দিয়ে অপুর চরিত্র যথাসম্ভব পরিণতি লাভ করেছে। তার মন, তার দৃষ্টি কোথাও নিশ্চল হয়ে নেই—তার পরিধি দিনের পর দিন বড় হয়ে হয়ে আজ সমস্ত পৃথিবীকে বেষ্টন করেছে। তবে এই যে পরিণতি, এটা একেবারেই চমক-লাগানো নয়—কোথাও তার প্রকাশ খুব নিবিড় হয়ে চমক লাগিয়ে পাঠকের চিত্তকে অধিকার করে না, খুব gripping interest তার মধ্যে নেই। তার একটা কারণ অপুর আদর্শবিহারী অসীম শিশুমন, তার romantic idealism, যার মধ্যে স্বভাবতই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অপুর চরিত্র অপরিণত। এ দৃষ্টি সত্যদৃষ্টি নয়, এ অভিযোগ মিথ্যা, তবে অপুর চরিত্রের পরিণতি একটু একঘেয়ে।'

নীহারবাবুর চতুর্থ বক্তব্য অপুর অন্তর্দ্বন্দ্বহীনতার অভিযোগ সম্পর্কে। এ ক্ষেত্রেও তিনি বলেন, 'অপুর চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, আদর্শবিভ্রাট নেই, এবং বাইরেও যা দ্বন্দ্ব তা শুধু দারিদ্র্যের সঙ্গেই, চরিত্রে বৈচিত্র্য নেই—এ অভিযোগ সত্য বলে আমার মনে হয় না।'

নীহারবাবুর যা মনে হয় তা এই।

"অপুর জীবনের যা idealism তা নিয়ে দ্বন্দ্ব, আদর্শবিভ্রাট তার জীবনে অনেকবারই ঘটেছে। দ্বন্দ্ব শুধু তার দারিদ্র্যের সঙ্গেই নয়, সে অভিজ্ঞতাই তার একমাত্র অভিজ্ঞতা নয়। সেই যে অপর্ণার মৃত্যুর পর কোথায় এক গ্রামে নিতান্ত ইতর এক সমাজের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল স্কুল মাষ্টার হয়ে—সেখানে তার আত্মার তার আদর্শের চরম মৃত্যু ও অপমান যা হয়েছিল—কি যে সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব, আদর্শের সঙ্গে বিরোধ। সেখান থেকে তো নিজেই নিজকে সে উদ্ধার করল। তারপর সেই যে একবার কোথায় ষ্ট্রাইকের সময় চাকরী নিয়েছিল নিতান্ত দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে—তারপর যখন মনে হল সে একজনের আদর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে তার মুখের অন্ন কেড়ে নিচ্ছে, তখন তার মনে আদর্শের সঙ্গে বিরোধ জেগেছিল বই কি! এরকম...ঘটনার তো অভাবই নেই। আর অন্তর্দ্বন্দ্বের কথাই যদি বলতে হয়, তাহলে সবচেয়ে যা বড় দুঃখ, বড় দ্বন্দ্ব, বড় অভাব—সেই যে অন্তরাত্মার নিঃসঙ্গতা—বন্ধু নেই, বান্ধব নেই, আপনার বলতে কেউ নেই, তার আদর্শের সমর্থক নেই, নেই সহায়ক—এই যে ভীষণ একাকীত্ব-বোধ এর দুঃখকষ্ট যে দারিদ্র্যের চেয়েও ভীষণ এবং এই অন্তরাত্মার নিঃসঙ্গতার দুঃখ, তাকে যে কি রকম পীড়ন করেছে, এবং তার অভিজ্ঞতা অপুর যে কি নিদারুণ, তা যদি কারুর উপলব্ধিকে, সহানুভূতিকে স্পর্শ করে না থাকে, তবে তার সাহিত্যালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। এর চেয়ে নিষ্করুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব আর কি আছে?"

এইখানেই নীহারবাবুর অভিযোগ-খণ্ডন পর্ব শেষ।

এর পরে তিনি নিজে কয়েকটি আপত্তি পেশ করেছেন।

প্রথম আপত্তি: "দুটি বইতেই (পথের পাঁচালী ও অপরাজিত) প্রাকৃতিক বর্ণনার পুনরুক্তি...আছে।...বর্ণনার ভাষা ও imagery

প্রায় সর্বত্রই কতকটা একই প্রকার।...তাছাড়া, সেই দূর অজানা রহস্যময় ভবিষ্যতের কথাও বিভূতিবাবু যেখানে যেখানে তাঁর অপূর্ব মোহময় সৌন্দর্যময় ভাষায় প্রকাশ করেছেন, সেখানেও imagery ও কল্পনার বর্ণনা কতকটা এক প্রকারের। এই দুটি বইতেই প্রাকৃতিক বর্ণনা যত যায়গায় আছে তার মধ্যে বৈচিত্র্য কম...। যদিও অমরকণ্টকের বর্ণনা classical—তুলনা নেই তার।"

দ্বিতীয়ত, "...অপুর জন্যে অন্য সব চরিত্রগুলির প্রতি কতকটা অবহেলা করা হয়েছে। অনেক চরিত্রের অবতারণা বিভূতিবাবু করেছেন, কিন্তু তাদের অত্যন্ত নির্মমভাবে একে একে গল্পের মালাটি থেকে বিচ্যুত করেছেন—তারা সুন্দর সুস্পষ্ট হয়ে ফোটবার আগেই। এর জবাব দেওয়া যেতে পারে যে অপুকে প্রকাশ করবার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন তাদের ছিল, সেটুকু শেষ হবার পর তাদের বর্জন না করে আর উপায় কি? কিন্তু আমার মনে হয়, সবগুলো গৌণ চরিত্রকে অবহেলা করাতে অপুর চরিত্রের interest কতকটা কমে যেতে বাধ্য হয়েছে। অপুর পাশে পাশে আরো দু'তিনটে চরিত্রকে বাড়তে দিয়ে তাদের সঙ্গে অপুকে জড়িত করে দিলে অপুর চরিত্রের interest আরো নিবিড় হতে পারতো। লীলা-অধ্যায়ের সম্ভাব্যতা আরও বেশী ছিল—অপুর মনোজীবনের উদ্‌ঘাটনের পক্ষেই এর দরকার ছিল।

তৃতীয় আপত্তি—'এতগুলো মৃত্যু সম্বন্ধে।...এতগুলো মৃত্যু হলো অপুর জীবনে, এটা বিভূতিভূষণের bid-out plot—একটা কৌশল। একথা মনে হয়, এদের মৃত্যু না হলে অপুর আদর্শের, idealism-এর জয় হোতো না; এক একটা জীবন যেন তার আদর্শের পথে বাধা, এক একটা মৃত্যুতে যেন সহজ হল সুগম হল। গ্রন্থকার যেন ইচ্ছে করেই এক একটি করে সমস্ত বন্ধন মুক্ত করে দিলেন, নইলে অপু অপরাজিত হতে পারে না।.. সর্বজয়া তাকে পিছনে টানে

সর্বজয়ার মৃত্যু হল ;···অপর্ণাও মারা গেল।···লীলাও বেঁচে রইল না। এ প্রশ্ন মনে জাগে, অপর্ণাকে, লীলাকে বাঁচিয়ে রেখে লীলার সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে এতটা নিরাসক্ত না করে, সে সম্বন্ধের সম্ভাবনাটাকে আরো এগুতে দিয়ে অপুকে কি অপরাজিত রাখা যেত না ?"

এইখানে নীহারবাবুর অভিযোগ-পর্ব শেষ।

প্রবন্ধের উপসংহারে নীহারবাবু বলেছেন যে তিনি বই দুটিকে "অপূর্ব সৃষ্টি" মনে করেন—কারণ—

"এই বই দু'খানির মধ্যে পাই একটা sense of space, একটা উদার উন্মুক্ত বিশালতার আভাস। আজকাল এই যুগের গল্প-উপন্যাসে তার চতুরতায়, লিপিকৌশলে, মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম জটিল বিশ্লেষণে আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু যতক্ষণ এসব বই পড়ি, সর্বক্ষণই যেন মনে হয় চাপা বদ্ধ গলি, Lanes and alleys-এর মধ্যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।···বিভূতিবাবুতে গলিখন্দ পেরিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে এলুম।···মনে হল যেন এইবার হাত পা ছড়ান যায়। উপন্যাসের ভাবের আদর্শের ও আখ্যানের মধ্যে যে এই বিশালতা, এই বিরাটত্বের আভাস, এই creative freedom, এটা বিভূতি-বাবুর একটা খুব বড় সৃষ্টি।···কোথাও এরকম 'অপরিমাণ প্রেমের' বিরাট উপলব্ধি আমি পাই নি। বৃহতের জন্যে, বিরাটের জন্যে, উদার স্বচ্ছন্দ মুক্তির জন্যে মানুষের মনের চিরন্তন আকূতি—এর অনেকখানি শান্তি বিভূতিবাবুর উপন্যাসে পাওয়া যায়। মানব-চরিত্রের বিচিত্র জটিলতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হয়তো এতে নেই, হয়ত তিনি তার চেষ্টাও করেন নি। তিনি মানুষকে বুঝেছেন ও জেনেছেন, যেখানে মানুষ সহজ ও স্বচ্ছন্দ, যেখানে-সে একটা সুবৃহৎ পরিসরের মধ্যে নিজেকে মুক্ত করে দিয়েছে, যেখানে সে অসীম বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত, সীমাহীন প্রকৃতির আত্মীয়, এবং আদি-

অন্তহীন শাশ্বত কালের সঙ্গে সে নিজেকে এক করে অনুভব করেছে। এই উপলব্ধির কোন সীমা নেই।...অপু তো আমাদের এই বর্তমান কালের লোকেদের নিন্দা করেছে—আমরা বৃহত্তর জীবনসৃষ্টির আর্ট জানি নে।...সে মনে করে·· 'কতবার যেন সে আসিয়াছে···জন্ম হইতে জন্মান্তরে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুর মধ্য দিয়া বহু বহু দূর অতীতে ও ভবিষ্যতে বিস্তৃত···জীবনের জন্মমৃত্যুর বীথিপথ বাহিয়া ক্লান্ত ও আনন্দিত আত্মার সে কি অপরূপ অভিযান···পৃথিবীর জীবনটুকু যার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।···তার মনে হইল, সে দীন নয়, দুঃখী নয়, তুচ্ছ নয়—এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়, সে জন্ম-জন্মান্তরের পথিক আত্মা···।'

"শুধু এই বর্ণনার মধ্যেই নয়, বইটির সমস্ত atmosphere-এর মধ্যে এই যে space-এর আভাস, এই creative freedom-এর আভাস শুধু অপুর জীবনের আদর্শের মধ্যে নয়, উন্মুক্ত প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যে নয়, অপুর জীবনকাব্যের মধ্যে নয়—বিভূতিবাবুর নিজস্ব যে লিপিকৌশল, যে technique তার মধ্যে এর পরিচয় আছে। তিনি জানেন স্মৃতির সাহায্যে কল্পনার সাহায্যে কি করে বর্তমানকে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে বিসর্পিত করে আদিঅন্তহীন কালের সঙ্গে যুক্ত করে একটা চিরন্তনের বিশালতার আভাস সৃষ্টি করা যায়।

"...আমরা এই বর্তমান যুগে জীবনকে অত্যন্ত খণ্ড খণ্ড করেই দেখি—খণ্ড জীবনের জটিলতাকে জটিলতর করে নিজেদের কল্পনা ও বুদ্ধিকে তার মধ্যেই বিহার করতে দিই—সমগ্রতার মধ্যে আমাদের দৃষ্টি মুক্তি পায় না; জীবনকে আমরা সমগ্র দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টাও করিনে। বিভূতিবাবু এই সমগ্র দৃষ্টিতে একটি জীবনকে দেখতে চেষ্টা করেছেন—সৃষ্টির যাবতীয় বিচিত্রতার সঙ্গে তাকে যুক্ত করে দেখতে চেষ্টা করেছেন এবং তাতে সফল হয়েছেন। বিভূতিবাবুর কল্পনা কিছু ব্যাস দ্বারা ব্যাহত হয়নি। ...এই সমগ্রভাবে দেখা—এইটাই

সত্যকার দৃষ্টি।…যাঁরা epic লিখেছেন, যাঁরা সুবিশাল কক্ষের দেয়ালের পর দেয়াল জুড়ে বড় বড় frescoes এঁকেছেন—মনের জগতে বিভূতিবাবু তাঁদের আত্মীয়।...Tree of life এঁকেছেন নরওয়ের অজ্ঞাতনাম আর্টিষ্ট Gustave Vigeland, ভাস্কর্য জগতের অপূর্ব সৃষ্টি। অপুর জীবনও অমনি একটা ক্রমবর্ধমান tree of life."

নীহারবাবুর মতামত যে 'পরিচয়ে'র লেখকদের কাছে সম্পূর্ণ গ্রাহ্য হয়েছিল এমন মনে হয় না। বিশেষত, নীহারবাবুর মত ('অপরিণত' ইত্যাদি), এবং নীহারবাবুর খণ্ডন-প্রয়াস—এই দুই বিপরীত কোটির মধ্যে মীমাংসার কোন মধ্যপথ উন্মুক্ত হয়েছিল কি না সন্দেহ।

'পরিচয়ে' এর পরে গিরিজাপতি ভট্টাচার্য ('পরিচয়'-এর বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক—গোড়ার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত) বিভূতিভূষণের 'মৌরীফুলে'র একটি সমালোচনা লেখেন 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে। এটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ সালের মাঘ মাসে, অর্থাৎ নীহারবাবুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার দু'মাস পরে। (তখন 'পরিচয়' ত্রৈমাসিক ছিল। কার্ত্তিক সংখ্যার পরে বেরিয়েছিল মাঘ সংখ্যা। ঐ কার্তিকেই নীহারবাবুর প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, অর্থাৎ 'বিচিত্রা'য় এটি বেরুবার পরে 'পরিচয়ে'-র পরবর্তী সংখ্যা মাঘেরটি। সেই মাঘের সংখ্যাটিতেই বিভূতি-প্রসঙ্গ আবারউঠল।)

"এখন বিভূতিবাবুর উপন্যাস সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্ক স্তিমিত হয়েছে," এই অবসরে গিরিজাপতি ভট্টাচার্য বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের পরিচয় নিতে বসলেন তাঁর "দ্বিতীয় গল্পের বই মৌরীফুল"কে অবলম্বন করে। ('মেঘমল্লার' এর আগে বেরিয়েছে)।

"মৌরীফুলের উপাদান সংগ্রহ হয়েছে পল্লীগ্রাম ও আমাদের জীবনের সামান্য অনাড়ম্বর ঘটনা-সমাবেশ ক্ষেত্র থেকে। অথচ অনাড়ম্বর ঘটনা সন্ধানের চেষ্টায় মাঝে মাঝে একটু বেশী করেই

আড়ম্বর এসে পড়েছে—মেঘমল্লারেও এটুকু বাদ যায় নি। যা হোক, 'মৌরীফুল'-এর পল্লীগ্রাম বিভূতিবাবুর হাতের গড়ন পেয়েছে। একদিকে গ্রাম্যতা, অজ্ঞতা, নির্মমতা প্রভৃতির সঙ্গে সরলতা, আতিথ্য, সৌহার্দ্য, প্রীতির অপরূপ সমন্বয়, আর একদিকে উদার গ্রাম্য প্রকৃতির অকুণ্ঠিত সুসার ও অসার দান, গ্রামের এই রমণীয় পরিচয় বিভূতিবাবুর গল্পে বিফল হয় নি।"

এর পরে গল্পগুলি সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছেন। 'মৌরীফুল' গল্পটিতে 'চরিত্রগত দ্বন্দ্ব উজ্জ্বল'। অবশ্য 'সুশীলার অপমৃত্যু অত্যন্ত অস্বাভাবিক'। 'রোমান্স্' গল্পটিও 'অনেককে মুগ্ধ করবে।' 'রাক্ষসগণ' গল্পে 'সেবাপরায়ণ রেণু নিঃস্বার্থ রমণীসুলভ অন্তরঙ্গতার চিত্র…।—রেণুর অকাল-বৈধব্য-ফল থেকে নিজে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য নায়কের উল্লাস সার্থক নয়।' এই তিনটি গল্প ছাড়া বাকী সাতটি গল্পের-'কোনটি উল্লেখযোগ্য নয়। জলসত্র, খুঁটিদেবতা, প্রত্নতত্ত্ব, গ্রহের ফের প্রভৃতি হয় অতি-কল্পিত, নয় গল্পের উপযুক্ত উপাদানের অভাবে নিরর্থক পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়েছে।'

উপসংহারে গিরিজাবাবু বিভূতিভূষণ সম্পর্কে একটা 'হিসাব-নিষ্পত্তি' করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয়েছে বিভূতিবাবুর পল্লীজীবন বা আমাদের অবান্তর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জীবনাবলীর চিত্র খুব নিখুঁত, রমণীয়, কিন্তু অনতিগভীর,—surface deep। যদি শরৎবাবুর লেখার সঙ্গে তুলনা ক্ষমার্হ হয় তবে বলা চলে যেখানে বিভূতিবাবু নম্র সুষমাময় ও অনতিগভীর, সেখানে শরৎবাবু কত সতেজ কত জীবন্ত কত বিশিষ্ট কত গভীর হতেও গভীরতর।'

অনতিগভীরতার অভিযোগ এখানে প্রত্যক্ষভাবে বিভূতিভূষণ সম্পর্কে। নীরেনবাবু 'অপরিণত' বলেছিলেন অপুকে। কিন্তু উভয়ের দোষগুণই উভয়ে বেশ খানিকটা বর্তায়। কারণ, আগেই বলেছি, বিভূতিবাবু ও অপুর সম্পর্ক নিছক লেখক-নায়ক সম্পর্ক নয়, অপু

বিভূতিভূষণেরই কছুটা আদর্শায়িত রূপ। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, নীহারবাবুর সুদীর্ঘ প্রবন্ধের পরেও গিরিজাবাবুর মত নীরেনবাবুর সদৃশ।

অনেক দিন বাদে 'পরিচয়ে' শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় বিভূতিভূষণ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানেও তিনি বলেন, 'অপুর মানসিক বৃত্তির সমস্তটা বিকশিত হতে পারে নি।' (পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৫৯)।

'পরিচয়ে'র বাইরেও একজন বিশিষ্ট সমালোচক, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অপুর 'ভাবগভীরতার' অভাব সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন। তার কারণও ভাববার চেষ্টা করেছেন: অপুর জীবন 'বৃহৎ হইতে বৃহত্তর পরিধিতে প্রসারিত,' এবং 'বোধহয় গভীরতা ও প্রসারের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক-বিরোধ আছে।'

অপু বিভূতি-সাহিত্যের সর্বপ্রধান চরিত্র। তার গুরুত্ব আরো বেড়েছে এই কারণে যে, বিভূতিভূষণের সমগ্র ব্যক্তিত্ব ছেনে নিয়ে এ চরিত্র গড়া। আগেই উল্লেখ করেছি, অপু একাধারে বিভূতিভূষণ স্বয়ং এবং বিভূতিভূষণের মানস-আদর্শ। অন্যত্র লেখক-নায়ক স্বতন্ত্র ব্যক্তি, এখানে প্রায় অভিন্ন।

নীহারবাবুর প্রবন্ধ থেকে দেখা যাচ্ছে যে মতান্তর প্রধানত চারটি প্রসঙ্গে। এ বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের মতামত বিক্ষিপ্ত আকারে নানাস্থানে আগেই বলেছি। সুতরাং এখানে বিশদ আলোচনা না করে সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের বক্তব্য রাখছি।

অপুর যৌন-প্রসঙ্গ নীরেনবাবু আনেন নি। শুধু বলেছেন, অপুকে 'প্রেমাবেগ' থেকে দূরে রাখা হয়েছে। এ কথাটায় আপত্তি করবার কোন কারণ নেই। যৌন-বিষয়ে বিভূতিভূষণের অনীহা আছে। তাঁর রোমান্টিক-সুন্দর-সন্ধানী মন যৌন বিষয়কে অসুন্দর মনে করে। ঘটনা নির্বাচনে লেখকের নিশ্চয়ই স্বাধীনতা আছে। কিন্তু অপুর চেতনার

উষা কাল থেকে বয়স্ক যৌবন পর্যন্ত মনোবিকাশের প্রতিটি খুঁটিনাটি এত বিশদভাবে দেখানো হয়েছে যে সেই বিস্তৃত মানস-ইতিহাসের কৈশোরে তার যৌবন-অভ্যাগমের দৃশ্যের অনুপস্থিতি একটু অস্বাভাবিক মনে হয়। রোমান্টিক শিল্পীদের অনেকে প্রকৃতি-লালিত সত্তার মাঝে আদর্শ এক মানুষকে প্রত্যক্ষ করেন। সৌন্দর্যের এই আদর্শ থেকে যৌন বিষয়কে ছেঁকে বাদ দিতে উৎসুক তাঁরা। যেমন, বঙ্কিমের প্রকৃতি-লালিত কপালকুণ্ডলা। সে পূরো এক বছর একটা যৌন সম্পর্কের মধ্যে বসবাস করেও ঐ চেতনার বাইরে রয়ে গেছে। অপুও লেখকের রোমান্টিক কল্পনায় আদর্শায়িত, তবে কপালকুণ্ডলার স্তরে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ নয়।

প্রধান বিতর্ক অপুর জীবনঘটনার বৈচিত্র্যহীনতা, অপরিণতি ও দ্বন্দ্বহীনতা সম্পর্কে। এ ক্ষেত্রে নীহারবাবুর মত মানা সম্ভব নয়। ঠিকই, অপু একাধিক স্থানে গিয়েছে, একাধিক দৃশ্য দেখেছে, একাধিক ঘটনায় তার জীবন-ইতিহাস রচিত। কিন্তু তার অতিরিক্ত আত্মমুখী দৃষ্টির জন্যে সে এক ভিন্ন অন্য দেখে নি। তার অভিজ্ঞতা সংখ্যায় অগণ্য, কিন্তু স্বাদে অভিন্ন। তার বহু আছে, বিচিত্র নেই। তার মনটাই এমন যে সে এক জাতীয় দৃশ্য, ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকেই মাত্র সে আহরণ করবে, অন্যজাতীয়ের প্রতি তার বিজাতীয় বিরাগ। এত একবগ্‌গা মনের ভার-সামঞ্জস্য ক্ষুন্ন হতে বাধ্য। অথচ পরিণত মনের একটা বড় লক্ষণই সুষম বিকাশ, balance। ব্যক্তিপ্রবণতা অবশ্যই গ্রাহ্য, কিন্তু একটি বিশেষ প্রবণতার অত্যুক্তি অন্যান্য বৃত্তির কণ্ঠকে সম্পূর্ণ রোধ যেন না করে। অন্যান্য বৃত্তির কিছুটা বিকাশ ঘটলে তার ওজন বিশেষ প্রবণতাকে আকাশচারী কাল্পনিকতা থেকে সংযত করে সংহত রূপ দিতে পারে। রবীন্দ্র-উদ্ধৃতির সাক্ষ্যে আগেই বলেছি, কাল্পনিকতা বিষয়টা অপরিণত, কল্পনা পরিণত।

অপু কৈশোর পর্যন্ত বেড়ে যেন থেমে গেছে। বুদ্ধি ও বোধ-

শক্তি থাকতে পারে একটি কিশোরের। কিন্তু নানা অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করে তার সাধারণীকৃত (generalised) সিদ্ধান্তের ভিত্তি-ভূমিতে দাঁড়িয়ে ব্যাপক ও গভীর প্রজ্ঞাদৃষ্টির অধিকারী নয় সে।

অভিজ্ঞতার পোড় খেতে খেতেই কৈশোরতরল মন সংহত হয়ে ওঠে। বহু ট্রায়ালের শিক্ষায় মানুষের মন পরিণত হয়। এইখানেই বিভূতিভূষণের সবচেয়ে বড় মানসিক বিরূপতা। তিনি বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করতে চান না। সমস্ত রকম জীবন-প্রয়াসের দিক থেকে তাঁর মুখ ফেরানো—সেখানকার সামান্য মলিনতাও তাঁর সহ্য হয় না। শুধু একটা বিশেষ ধরনের জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁর উপজীব্য—তার মধ্যে তিনি নিমজ্জিত থাকতে চান, থাকেন। বাইরের দিক থেকে তাঁর চোখ সম্পূর্ণ ফিরিয়ে নেন। ফলে তাঁর মনের সর্ব-অভিজ্ঞতা-আত্মসাৎকারী সমৃদ্ধি নেই। অ্যাডলেসেণ্ট পর্যায়ের পর আর তিনি বাড়তে চান নি। পরের পর্বে এগোলেই তাঁর কৈশোর স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে রূঢ়তা রুক্ষতা ও ক্লেদের আঘাতে—এই আতঙ্কে তিনি মনটাকে চিরকালের জন্য কিশোর-কল্পনার মোড়কে মুড়ে রেখে দিলেন। বাইরের জল-বাতাস বিশেষ তার গায়ে লাগতে দিলেন না। শিশু-কিশোরের জীবন আঁকতে যত তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, এমন আর কোথাও নয়। বয়স্ক মানুষ তাঁর সাহিত্যে নেই। শিশুর মন নিয়ে তারা সবাই আবির্ভূত, কারণ বয়স্কের মনকে তিনি জানেন না। তাঁর সমগ্র সাহিত্যের আবহাওয়াই কৈশোর স্মৃতি ও কল্পনার নিশ্বাসে অনুভাবিত। প্রমথনাথ বিশী তাই তাঁর সাহিত্যজগৎকে বলেছেন 'খেলাঘর'। শ্রীকুমারবাবু পথের পাঁচালীকে বলেছেন 'রূপকথার রাজ্য' আর 'আদর্শ হিন্দুহোটেল' সম্পর্কে বলেছেন 'রূপকথার লক্ষণান্বিত'। আসলে তাঁর সারা সাহিত্যেই রূপকথার আবহাওয়া। 'পথের পাঁচালী'তে তিনি এরই গুণে তাঁর সাহিত্যশক্তির তুঙ্গবিন্দুতে।

'অপরাজিত'-তে অপুর বয়সে বেড়েছে, মনে বাড়ে নি। পঁচিশ বছর পরেও অপু নিশ্চিন্দিপুরে বালক-মনেই এসেছে, এখানকার বিশেষ কোন পরিবর্তন তার চোখে পড়ে নি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'The Prelude', এবং রমাঁ রলাঁ্যার 'জাঁ ক্রিস্তফ' 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিতে'র মূলে প্রেরণা জুগিয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের নায়কদের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বয়স বেড়েছিল, অপুতে বিশেষ বাড়তে চায় নি। (এ বইয়ের একটা মূল্য অবশ্য ঐ স্মৃতির সোনার কাঠির স্পর্শে রূপকথাকে জাগানোয়। বর্তমানের জল-মাটি-বাতাসের মালমসলায় রূপকথার রচনাও নিঃসন্দেহে এক ধরণের শক্তির পরিচায়ক)।

অপু সুরেশ্বরকে একদিন বলেছিল, 'জানেন তো বলেছে—In each of us a child has lived and a child has died—a child of promise, who never grew up—' (অপরাজিত, পৃঃ ৩০৪)।

অপুর মধ্যে এই চিরশিশু জন্মেছে, বাস করেছে, কিন্তু কোনদিন বড় হয় নি, 'has died' কথাটা তার সম্পর্কে সত্য নয়। অপুর (তথা বিভূতিভূষণের) মধ্যেকার শিশুটি অক্ষয় কবচ নিয়ে জন্মেছিল।

অপু আর এক যায়গায় ভেবেছে, 'বিস্ময়কে যাহারা বলিয়াছেন Mother of philosophy তাঁহারা একটু কম বলেন। বিস্ময়ই আসল philosophy, বাকিটা তাহার অর্থসঙ্গিত মাত্র।' (অপরাজিত, পৃঃ ৯৩)। এই উক্তি থেকে দেখা যাচ্ছে যে সে বিস্ময় রসের সাধক, 'অর্থসঙ্গতি'র জন্য তার প্রচেষ্টা নেই। এই বিস্ময়রসে মুগ্ধ থাকবার প্রয়াস তাঁর এত প্রবল যে সে কোথাও বেশীক্ষণ দাঁড়াতে চায় না, 'শ্যাওলার মত' ক্রমাগত ভেসে ভেসে বেড়ায়। মানুষের পরিচয়ও তাঁর কাছে 'ভাসা-ভাসা।' গভীর পরিচয়ে বিস্ময় কমে যাওয়ার আশঙ্কা। তাই অপু সারাজীবন (এবং বিভূতিভূষণ তাঁর

সমগ্র সাহিত্য জীবনে) শুধুমাত্র বিস্মিত হয়ে রইল, অর্থসঙ্গতির চেষ্টা করল না। একটি শিশুমন যে বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে জগতের দিকে প্রথম তাকায় সেই বিস্ময়-মোহের অঞ্জন অপুর এবং বিভূতিভূষণের চোখ থেকে কোন দিন ঘোচে নি।

যদিও বিভূতিভূষণ উল্লেখ করেছেন যে অপু বড় হয়ে 'তুলনা করিতে শিখিয়াছে, সমালোচনা করিতে শিখিয়াছে।' কিন্তু এ বিবৃতি অপুর চরিত্রের মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে নি। বিভূতিভূষণ সম্পর্কে শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, যে তিনি 'আস্বাদনপন্থী, বিশ্লেষণপন্থী নন।' (সাহিত্য ও সাহিত্যিক, পৃঃ ৫)। অপু সম্পর্কেও এ কথা সত্য।

নীহারবাবুর মতে, জীবনে আমরা জটিলতা বেশী দেখি কারণ আমরা খণ্ড দৃষ্টির অধিকারী; বিভূতিবাবু 'সমগ্র দৃষ্টি'তে জীবনকে দেখেছেন—'বিচিত্রতার সঙ্গে তাকে যুক্ত করে' দেখেছেন, তাই জটিলতার ঊর্ধ্বে তিনি। এই 'সমগ্র দৃষ্টি'কেই নীহারবাবু বলেছেন 'সত্যকার দৃষ্টি।' এখানে নীহারবাবু ভুল করেছেন। রবীন্দ্রনাথের খণ্ড-অখণ্ড-বিষয়ক বক্তব্যকে অস্থানে আরোপ করা হয়েছে। শিশুর জগতের একটা সম্পূর্ণতা থাকে—তার আত্মজগতের সম্পূর্ণতা। কিন্তু সেটা তাকে যথার্থ 'সমগ্র দৃষ্টি'-র অধিকারী করে না। তা সময়-সাপেক্ষ, শ্রমসাধ্য। পথ তার কণ্টকাকীর্ণ। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাক: 'মানুষের জীবন এইরূপ—শিশু যে সরল স্বর্গে থাকে, তাহা সুন্দর, তাহা সম্পূর্ণ, কিন্তু ক্ষুদ্র। মধ্যবয়সের সমস্ত বিক্ষেপ ও বিক্ষোভ, সমস্ত অপরাধের আঘাত ও অনুতাপের দাহ জীবনের পূর্ণবিকাশের পক্ষে আবশ্যক। শিশুকালের শান্তির মধ্য হইতে বাহির হইয়া সংসারের বিরোধবিপ্লবের মধ্যে না পড়িলে পরিণত বয়সের পরিপূর্ণ শান্তির আশা বৃথা। প্রভাতের স্নিগ্ধতাকে মধ্যাহ্নতাপে দগ্ধ করিয়া তবেই সায়াহ্নের লোকলোকান্তরব্যাপী বিরাম। পাপে-অপরাধে ক্ষণভঙ্গুরকে ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং অনুতাপে বেদনায় চিরস্থায়ীকে

গড়িয়া তোলে।' (শকুন্তলা, প্রাচীন সাহিত্য)।

নীহারবাবু অপুর জীবনকে একটি তরুজীবনের সঙ্গে উপমিত করেছেন। কথাটা এই দিক থেকে সত্য যে প্রকৃতির স্বভাব-সহজ ভাবটা অপুতে আছে। কিন্তু মানুষের জীবন যে সত্যি এত সহজ নয়। সূর্যের আলো এসে পড়ল, মাটিতে রসের ধারা বইল, গাছ সবুজ আলোয় উজ্জ্বল হোলো, ফুল ফুটে উঠল তার সর্বাঙ্গে, পেল সে পরিণত স-ফলতা। মানুষের জীবনের সফল পরিণতি তো এত অক্লেশে হবার নয়। তার অনেক বাধা, অনেক প্রতিকূলতা, অনেক প্রলোভন, অনেক দ্বন্দ্ব। এগুলিকে এড়িয়ে পরিণতির চূড়ান্তে কোন মানুষ পৌঁছতে পারে না। কিন্তু অপু এ সবের মুখোমুখি কখনও দাঁড়ায় নি। দ্বন্দ্বের নমুনা হিসেবে নীহারবাবু যে দুটি উদাহরণ তুলেছেন, তা এত লঘু, এত ক্ষুদ্র যে সে-সম্পর্কে আলোচনা অনাবশ্যক। এমন কি, 'আত্মার নিঃসঙ্গতা'-ও তাঁর কাছে 'বড় দ্বন্দ্ব', নিষ্করুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব।'

অপু অপরাজিত কোথায়—এর পরিষ্কার ও সন্তোষজনক উত্তর নীহারবাবু দিতে পারেন নি। সমস্ত স্নেহ-বন্ধনকে অতিক্রম করবার মধ্যে অপুর এক ধরণের জয় আছে। কিন্তু সে-জয় অপু সংগ্রাম করে অর্জন করে নি। বিভূতিভূষণ স্বয়ং অপুর নিকট-জনের মৃত্যু ঘটিয়ে তার পায়ের বেড়ি খুলেছেন। এই মৃত্যুগুলিকে নীহারবাবু নিজেই 'bid-out Plot—একটা কৌশল' বলে স্বীকার করেছেন। নীহারবাবু জানেন 'এদের মৃত্যু না হলে অপুর আদর্শের···জয় হত না।' তাহলে এই অনর্জিত হাতে-তুলে-দেওয়া জয়কে জয় বলব কি করে?

নীহারবাবুর মনে প্রশ্ন জেগেছে, 'অপর্ণাকে লীলাকে বাঁচিয়ে রেখে লীলার সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে এতটা নিরাসক্ত না করে ..অপুকে কি অপরাজিত রাখা যেত না?' এর উত্তর—এদের রাখা মানেই পরস্পর-বিরুদ্ধ দুই শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে অপুকে ফেলা। সেটা

দ্বন্দ্বভীরু বিভূতিবাবু এড়াতে চান।

নীহারবাবু বলেছেন, 'যাঁরা epic লিখেছেন, মনের জগতে বিভূতিবাবু তাঁদের আত্মীয়।' গ্রন্থের আকার দেখে বোধহয় নীহারবাবু ভুলেছেন। গ্রন্থের প্রকৃতি-বিচারে বিভূতিভূষণ লিরিক-শিল্পীর আত্মীয়।

নীহারবাবু বইখানির মধ্যে 'একটা sense of space'-এর আভাস পেয়েছেন। এ কালের জটিলতার শ্বাসরোধী আবহাওয়া এ গ্রন্থে নেই, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। এর মধ্যে আছে গলি-ঘুঁজির নয়, প্রান্তরের স্বাদ। কিন্তু এই বিশালতাকে কস্‌মিক sense of space বলে মনে করবার কোন কারণ নেই।*

নীহারবাবুর পক্ষে তখন বিভূতিভূষণের সাহিত্যের সঠিক মূল্য নিরূপণের অসুবিধা ছিল। তিনি বিভূতিবাবুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, সেটা হয়তো নিরাসক্ত থাকতে দেয় নি তাঁকে। তাছাড়া, 'পথের পাঁচালী'-র প্রকাশে যে আলোড়ন হয়েছিল, তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমরা আজ অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে বিভূতি-সাহিত্যকে দেখছি। তখন নীহারবাবুর কাছে ছিল বিভূতিভূষণের মাত্র দু'খানি বই। আজ তাঁর সমগ্র সাহিত্য ও ডায়রীর আলোকে তাঁকে বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজ। নীহারবাবুও যদি আজ নতুন ক'রে ভাবেন, তাহলে হয়তো তাঁরও মত পালটাতে পারে।

---

* এই গ্রন্থ-প্রসঙ্গে Sense of Space কথাটি বোধহয় নীহারবাবু বিভূতিভূষণের কাছ থেকেই শুনেছিলেন। মোহিতলাল বিভূতিভূষণ কথিত অনুরূপ উক্তির উল্লেখ করেছেন: 'তিনি (বিভূতিভূষণ) বলেন, এই উপন্যাস-রচনার প্রেরণায় কোনও বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রের প্রতি পক্ষপাত নাই; সমস্ত বিবৃতি ও বর্ণনার মধ্য দিয়া তিনি যে ধারণাটিকে অনুভূতি-গোচর করিতে চাহিয়াছেন তাহা—vastness of space and passing time—'(দুইখানি উপন্যাস, সাহিত্য বিতান, দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ২৪৩)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ছোট গল্প

॥ এক ॥

॥ ভূমিকা ॥

জীবনের কোন খণ্ডাংশের মধ্যে একটা কিছু আবিস্কারের প্রতি ছোট গল্প তীক্ষ্ণ অঙ্গুলি নির্দেশ করে থাকে; বিভূতিভূষণের গল্পের প্রবণতা সে দিকে নয়। তারও আবিস্কার আছে। কিন্তু সে আবিস্কার তীক্ষ্ণ অঙ্গুলিনির্দেশ চিহ্নিত নয়। গল্পলেখকরা সাধারণ ঘটনা বলতে বলতে তার মধ্যেই অকস্মাৎ একটা অসাধারণের দ্যুতি ফুটিয়ে তোলেন। এই দ্যুতিটুকুই লক্ষ্য, আর সব কিছু উপলক্ষ ঐ লক্ষ্যে পৌঁছবার তাদের একাগ্র-দৃষ্টি ঐ দ্যুতিদ্বীপটির প্রতি, সমুদ্রকে তারা দ্রুততম সংক্ষিপ্ততম পথে পেরিয়ে ঐ দ্বীপবিন্দুশীর্ষে উঠে জীবনকে দেখে, দেখায়। কিন্তু বিভূতিভূষণের তা নয়। তিনি জানেন দ্যুতি-কণা ছড়িয়ে আছে আকাশের প্রতিটি সূর্যরশ্মিতে, মহাসমুদ্রের প্রতিটি জলবিন্দুতে। অতএব ধীরে চল, ঐ দ্যুতিকণাগুলো কুড়িয়ে নাও, ব্যস্ত হোয়ো না, ঐ প্রতিটি আলোককণাতেই নতুন আবিস্কারের বিস্ময় ও আনন্দ। কোন কোন পাঠকের কাছে এটা তুচ্ছ মনে হতে পারে, একঘেয়ে লাগতে পারে। বিভূতিভূষণ তাকে তখনই স্মরণ করিয়ে দেবেন—তুচ্ছ একঘেয়ে জীবনও রোমান্স, শুধু দেখার চোখটা চাই।

তাই অন্য লেখক যখন অপরিহার্যকে মাত্র নিয়ে নৌকো হালকা করেন, বিভূতিভূষণ তখন এটা-ওটা সেটা যথেচ্ছ নৌকায় তোলেন। প্রকৃতি-সৌন্দর্য, স্মৃতিচিত্র প্রভৃতি পেলে তো কথাই নেই, এমন কি নেহাৎ

অবান্তর কথাও যদি তাঁর মনে পড়ে, তবে সেটাও লিপিবদ্ধ করতে তিনি নির্দ্বিধ। একটা উদাহরণ দিই। 'মুক্তি' (গল্প পঞ্চাশৎ) গল্পে হরি যুগী মনোহারী জিনিষের ব্যবসা করে—রেশমী চুড়ি, 'কার' ইত্যাদি বিক্রি করে। এইটুকু বলেই বিভুতিভূষণের "প্রসঙ্গক্রমে মনে হল 'কার' মানে ফিতে বটে, কিন্তু 'কার' কি ভাষা ? ইংরিজিতে এমন কোন শব্দ নেই, হিন্দি বা উর্দুতে নেই, অথচ কার কথাটা ইংরিজি শব্দ বলে আমরা সকলেই ধরে নিয়ে থাকি।"

লেখকের এই ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা কিন্তু গল্পের পক্ষে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। এবং এরকম অপ্রাসঙ্গিকতার উদাহরণ বিভূতি-সাহিত্যে বিরল নয়।

বিভূতিভূষণের গল্পের কাহিনী-অংশ অত্যন্ত সরল। কোন খাঁজবাঁক নেই তার। যুগের জটিলতার কোন ছাপ নেই সেখানে। ঘটনা-বিন্যাসের কৌশলও অতি-সাধারণ, সরলমার্গী। বলার ধরণ শিথিল। ছোট গল্পে যেহেতু জীবনপথের একটি বিন্দুকে হঠাৎ চমকে তোলা হয়, সেইজন্যে সেখানে আলোকসম্পাতের কারিকুরি স্বাভাবিক, জীবনের বৃহৎ পটভূমিকায় যে সব বিষয় হয়তো খুব বড় করে নজরে পড়ে না, তারই কোন একটিকে লেখক "ক্লোজ-আপ" করে দেখান ছোটগল্পে ; লেখক সেইজন্য পাঠকের চোখকে উপযুক্ত দৃষ্টিকোণের একটি ফ্রেমে সীমাবদ্ধ করবার চেষ্টা করেন ; সুতরাং যে দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির তাৎপর্য সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, সেটিকে বেছে নিয়ে পাঠকের দু'চোখের ছড়ানো দৃষ্টিশক্তিকে সংহত ও তীক্ষ্ণ করে কেন্দ্রের উপর এনে ফেলা হয়। এ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু কলাকৌশল ভিন্ন সার্থক হয় না। যেমনভাবে ঘটনাটা পরপর ঘটে, ঠিক সেইভাবে বাঁধা পথে ঘটনাটা বিবৃত করলে সব সময় সেই উদ্দিষ্ট বিন্দুটি পাঠকের চোখের সামনে চমকে ওঠে না। যেমন চলচ্চিত্র তোলবার সময় যে কোন যায়গা থেকে যে কোন

গতিতে ক্যামেরাটা এগিয়ে দিলেই সঠিক ‘ক্লোজ-শট’ হয় না, তেমনি কালপরম্পরা ঘটনাটাকে যে কোন ভাবে বললেই ছোট গল্প হয় না। কতটা বলব, কতটা বাদ দেব, অর্থাৎ কতটা ঐ ফ্রেমের চতুঃসীমার মধ্যে আনব, কতটা বাইরে রাখব, এ বিচার যেমন আবশ্যক, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ গল্পের দৃষ্টিকোণ ও ঘটনা-বিন্যাস। গল্প লেখক নিজে বলতে পারেন, এক বা একাধিক পাত্রপাত্রীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত হতে পারে, গল্পের দাবী অনুযায়ী সেটি নির্ধারিত করতে হবে। ঘটনা সাজানোর ক্ষেত্রেও হয়তো তার কাল-পারম্পর্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে; ঐ উদ্দিষ্ট বিন্দুর দিকে লক্ষ্য রেখে হয়তো আগের ঘটনা পরে, পরের ঘটনা আগে আসতে পারে। এই সব কারণেই এ কালে ছোট গল্প বলার কলাকৌশলে নানান ধরণ এসেছে। এই রূপবৈচিত্র্যের বিশেষ কোন স্বাক্ষর বিভূতিভূষণে নেই।

আজকাল অধিকাংশ গল্পই আরম্ভ হয় প্রায় ক্লাইম্যাক্‌স্‌-এর অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে; দরকার মত ফ্লাশব্যাক, সংলাপ বা অন্য কোন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পূর্বকথা পরিমিতভাবে শোনানো হয়। গল্প লেখার এই নাটকীয় কৌশল ও কেন্দ্রসংহতি প্রায় সার্বজনিক। কিন্তু বিভূতিভূষণে এর উদাহরণও স্বল্প।

আরম্ভের মত সমাপ্তিও ছোট গল্পে আকস্মিক। বিভূতিভূষণে এই আকস্মিকতার ধাক্কা তেমন নেই। সমাপ্তিতে কোন চমক বা মোচড় দেওয়াও তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। ঘটনার মোচড় বা চমক দেওয়ার উদ্দেশ্য পাঠকের মনকে হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে বিষয়টার গুরুত্ব বোঝানো। বিভূতিভূষণ গুরুত্বকে ছড়িয়ে দেখেন গল্পের প্রায় সর্বাংশে, বিশেষ বিন্দুতে নয়, সেইজন্য এ ধরণের কৌশলের কথাও তাঁর মনে আসে না। যেখানে কোন গুরুত্বের দিকে শেষ মুহূর্তে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান, সেখানেও তাঁর পদ্ধতি আচমকা ধাক্কা মারা নয়, ধীর শান্ত আহ্বান।

বিভূতিভূষণের কতগুলি 'গল্পের' বৈশিষ্ট্য তাদের গল্পহীনতা। এই ধরণের লেখাগুলি গল্পসঙ্কলনে স্থান পেয়েছে, গল্প নামেই সাধারণত এর পরিচয়, কিন্তু এগুলি ঠিক গল্প নয়, বর্ণনা মাত্র। যেমন, 'দিবাবসান' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'প্রভাতী' (আচার্য কৃপালনী কলোনী)। এই অনুভূতি-লিপি স্বচ্ছন্দে তাঁর ডায়রীর অংশ হ'তে পারত বা 'বিচিত্র প্রবন্ধ' জাতীয় যদি তাঁর কোন গ্রন্থ থাকত তবে সেখানেও একে ঠাঁই দেওয়া চলত। * 'দিবাবসানে' তো কোন ঘটনা বা চরিত্রের আভাসমাত্রও নেই। দু'একটি লেখায় তার বিচ্ছিন্ন আভাস থাকলেও সেগুলি ছোটগল্পে দানা বেঁধে ওঠে নি। যেমন, 'ভুবন বোষ্টুমি' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'পার্থক্য' (গল্প-পঞ্চাশৎ) 'কুশল পাহাড়ী' ইত্যাদি। একটি লেখাকে তো লেখক নিজেই ছাপ মেরে দিয়েছেন 'গল্প নয়' বলে—যদিও সেটি গল্পপঞ্চাশৎ-এর (এবং জ্যোতিরিঙ্গন-এর) অন্তর্ভুক্ত। এটিকে গল্প-গোষ্ঠী থেকে জাতিচ্যুত করলে বিভূতিভূষণের আরো কিছু গল্প বাদ পড়বে, যার প্রতিটিতে তাঁর 'গল্প নয়' ছাপ মারা সম্ভব ছিল না। † অবশ্য লেখক এখানে 'গল্প নয়' বলতে এটিকে সত্য ঘটনাই বোঝাতে চেয়েছেন, সুতরাং এ কাহিনীর 'গল্প' হয়ে ওঠার দায় নেই। গল্প হিসেবে উঁচু শ্রেণীর মধ্যে না পড়লেও এতে লেখকের বিশেষ মানসভঙ্গির পরিচয় আছে; বিংশ শতকের কলুষের মধ্যে যেখানেই একটু আলোর রেখা দেখেছেন, সেইদিকে আগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

'একটি দিন'-ও (যাত্রাবদল) সেই গোত্রের 'গল্প', যেখানে কাহিনী-অংশ ও চরিত্রকথা প্রায় অনুপস্থিত; লেখকের বিশেষ মুড্-এর

---

* প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত 'রাজপথের কথা' আগে 'রাজপথ' নামে 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্ভুক্ত ছিল। (বিশী—রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, তথ্যপঞ্জী)

† 'গল্প নয়' নামে আর একটি লেখা আছে বিভূতিভূষণের, শেষ বয়সের রচনা এটি। 'কুশল পাহাড়ী' গ্রন্থে লেখাটি সঙ্কলিত। ক্ষীণ কাহিনীসূত্রে হরিনামের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে এই লেখাটিতে।

ক্ষীণ ঐক্যসূত্রকে অবলম্বন করে লেখাটি দাঁড়িয়ে আছে, এবং ঐ মুড-সর্বস্বতার জন্যেই এ লেখা অনেকটা গীতিধর্মী।

এই গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য যেমন ঘটনাহীনতা, তেমনি ঠিক বিপরীত ধরণের বিচ্যুতিও তাঁর গল্প-সাহিত্যে কম নয়। এই সব গল্প ঘটনার বাহুল্য দ্বারাই স্বধর্মচ্যুত। যেমন, 'ডানপিটে' (যাত্রাবদল), 'একটি কোঠাবাড়ির ইতিহাস' (গল্প-পঞ্চাশৎ) প্রভৃতিতে দীর্ঘ কাহিনী—দু'তিন পুরুষ ধরে তার বিস্তার, ছোট-গল্পের নিবিড় সংহতি এখানে ক্ষুন্ন। ভাব-ঐক্যের অভাব এগুলিকে গল্পের মর্যাদা দেয় নি, আবার যে সময় ও মনোযোগ দিলে এগুলি উপন্যাস হতে পারত তাও অনুপস্থিত। মাঝামাঝি ধরণের, দোআঁসলা সৃষ্টি এগুলি। বিষয়-বিচারে এগুলি উপন্যাসের সগোত্র, লিখনভঙ্গি ছোটগল্পের অভিমুখী।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য তাঁর উপন্যাসের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী। উপন্যাসে তিনি যে জগতে সীমাবদ্ধ তার বাইরে পদচারণার স্বাক্ষর তাঁর ছোট গল্পে বর্তমান। এর কারণ, কোন বিশেষ বিষয়ের স্বল্প-অভিজ্ঞতাতেও ছোট গল্প সম্ভব, উপন্যাসের দাবী বিশদ অভিজ্ঞতা। তাঁর উপন্যাসে সেই অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ পাই, যার মধ্যে তিনি দীর্ঘকাল-নিমজ্জিত; আর গল্পে এর ছাপ তো আছেই, উপরন্তু নানা টুকরো অভিজ্ঞতার স্বাদ-বৈচিত্র্যও মাঝে মাঝে উপস্থিত।

বিভূতিভূষণের বহু ছোট গল্পে কাহিনী বলা হয়েছে 'আমি'-র মারফৎ। অধিকাংশ গল্পই যেন লেখকের জীবনে ঘটেছে, অথবা তিনি শুনেছেন, এমনি ভঙ্গিতে বলা। এর ফলে গল্পগুলিতে বেশ একটা অন্তরঙ্গতার স্পর্শ আছে, এবং সুরটা এত ব্যক্তিগত যে বহু সময় ভুলে যেতে হয় যে গল্প পড়ছি। মনে হয় যেন লেখকের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুনছি। এটা একদিকে যেমন গুণের কথা, অন্যদিকে অতি-ব্যবহারে এর অসুবিধাও ঘটেছে। প্রথমতঃ, একই ভঙ্গির সব গল্প পড়তে শেষ পর্যন্ত একঘেয়ে লাগে; দ্বিতীয়ত, বহু

স্থানে গল্পের স্বাদের বদলে ডায়রীর স্বাদ পেতে হয়—গল্প পড়তে বসে অনেক পাঠক এটাকে লোকসান মনে করবে।

বিভূতিভূষণের গল্প-সাহিত্যটি অতিকায়। গল্পের সংখ্যা অনেক, কিন্তু সর্বত্র সেই অনুপাতে প্রতিটি রচনার মান রক্ষিত হয় নি। নিছক রসোত্তীর্ণ গল্পের কথা নয়—তার সংখ্যা যথেষ্টই আছে, নইলে এ আলোচনার প্রয়োজনই থাকত না। কিন্তু সমালোচকরা যখন বাংলা গল্পসাহিত্যকে বিশ্ব-দরবারের সমস্তরভুক্ত বলে মনে করতে সুরু করেছেন, তখন সেই স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে এমন গল্পের কথাও ভাবতে হবে আমাদের।

॥ দুই ॥

॥ মানসধারা ॥

যে সব লেখকের গল্পের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী, সেখানে আলোচনার সুবিধের জন্য শ্রেণীবিভাগের রীতি প্রচলিত। এ শ্রেণীবিভাগ নানা ধরণে হতে পারে, কিন্তু কোন সমালোচকই বোধ হয় এ দাবী করতে পারেন না যে তাঁর অনুসৃত পন্থাই রস-উপলব্ধির চরম পন্থা। বরং উলটো কথাটাই বোধ হয় বেশী সত্যি; যত ভাল করেই ছক কাটা যাক না কেন, সেই ছকের ছাঁকুনিতে রস তোলা দুস্কর। কারণ, সাহিত্য-রস বস্তুটাই যান্ত্রিক ছকের বিরোধী, এবং কোন লেখকই অনুরূপ যান্ত্রিক প্যাটার্নে গল্পগুলি সৃষ্টি করেন না।

আসলে শ্রেণীবিভাগটা সমালোচকের নিজের সুবিধের জন্যে, যে জন্যে একই লেখকের গল্পের নানা ধরণের শ্রেণীবিভাগ হয়ে থাকে বিভিন্ন সমালোচকেব হাতে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিভাগ। সে ক্ষেত্রটি নানা মুনি নানা রীতিতে ভাগ করেছেন।

এই সব বিড়ম্বনার কথা জানা থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য গল্পের সামনে দাঁড়িয়ে সমালোচক যখন বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় হয়ে পড়েন, তখন কয়েকটা ভাগ করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এতে তবু গল্পগুলিকে যেন হাতের মুঠোয় ধরা যায়।

এখানেও কয়েকটা মুঠোয় আমরা গল্পগুলোকে তুলে ধরে দেখতে চাই, এবং সে-দেখার মূল উদ্দেশ্যটা থাকবে বিভূতিভূষণের মনোলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয়-সাধন। ইতিপূর্বেই তাঁর যে সব বিভিন্ন মানসপ্রবণতা আমরা লক্ষ্য করেছি, প্রধানত তারই নিরিখে গল্পগুলিকে একটু সাজিয়ে নিতে চাই। তাতে লেখকের মানসলোক আরো একটু বেশী পরিস্ফুট হবার সম্ভাবনা। এর সাহায্যে কতগুলি

মানসপ্রবণতাকে যেমন আরো উজ্জ্বল আকৃতিতে দেখা যাবে; তেমনি উপন্যাসে-অনুপস্থিত কতগুলি নূতন সম্ভাবনারও ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, যে-সম্ভাবনা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ-পরিণত নয়, ব্যতিক্রম হিসেবেই মাত্র উল্লেখ্য।

লেখক হিসেবে বিভূতিভূষণের একটা বড় পরিচয় তাঁর প্রকৃতি-প্রীতিতে। কিন্তু 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক' প্রভৃতি তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলিতে এই প্রকৃতিমুখিতা যত প্রবল, গল্পগুলিতে তত নয়; বরং বলা যায়, ছোটগল্পে বিভূতিভূষণের প্রধান লক্ষ্য—মানুষ। প্রকৃতি সেখানে কিঞ্চিৎ পরোক্ষ। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছে'র মত 'জীবনের বর্ণনা প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন আবেষ্টনের মধ্যে দ্বীপের মতো জেগে-জেগে' * ওঠে নি বিভূতিভূষণের গল্পে। বরং ঐ 'জীবনের বর্ণনা'-কেই যেন লেখক লক্ষ্য বলে ভেবে নিয়েছেন তাঁর গল্পগুলিতে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রকৃতিবর্ণনা অবশ্যই আছে, কিন্তু তা খুব বেশী নয়। বা আরো কোন গভীর অর্থে প্রকৃতি গল্পগুলির অংশীদার নয়। মানুষ, বিশেষত গ্রামীণ মানুষ, এখানে পনেরো-আনার সরিক। তবে লেখক তো শেষ পর্যন্ত বিভূতিভূষণই, তাই 'কনে দেখা'-র (যাত্রাবদল) মত গল্পও তাঁর কাছে পাওয়া গেছে, যেখানে নায়ক হিমাংশু তার প্রিয় এরিকা পাম্ গাছটিকে মনুষ্য-সমতুল্যই ভাবে, এবং ভালবাসে। এরিকা পাম্-টি যখন অন্যের বাড়ীতে দুরবস্থা-গ্রস্ত, তখন হিমাংশু ওকে একদিন দেখতে গেল। সেখানে হিমাংশুর মনে হোলো, 'গাছটা যেন আমায় চিনতে পারলে।' তার আরও মনে হোলো, 'ও যেন বল্‌ছে, আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি তোমার কাছে গেলে হয় তো এখনও বাঁচবো। ছেড়ে যেও না এবার। আমায় বাঁচাও।'

* বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য, পৃঃ ৪৪।

রাত্রে হিমাংশুর ভাল ঘুম হোলো না, পরদিন এরিকা পাম্‌কে সে উদ্ধার করল এবং একে সংসারী করবার সাধ তার। হিমাংশু এরিকা পাম্‌-এর বিয়ে দেবে। 'তাই একটা ছোট-খাট অল্প বয়সের, দেখতে-ভাল পাম্‌ খুঁজছিলাম।' গল্পে হিমাংশুর শেষ উক্তিঃ 'হি-হি পাগল নয় হে, পাগল নয়, ভালবাসার জিনিষ হোত তো বুঝতে।' এ ভালবাসা বিভূতিভূষণের মত মানুষের পক্ষে বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজ সন্দেহ নেই।

'জাল' (কুশল পাহাড়ী) সূক্ষ্মভাবে 'আরণ্যক'-এর কথা মনে করিয়ে দেবে। রামলাল ব্রাহ্মণ দণ্ডক বনে এসেছে, এর অংশবিশেষ নির্মূল করে ভরহেচনগরের প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু রামলাল ভালবেসে ফেলেছে দণ্ডকবনকে। তুলসীদাসের এই দুটী লাইন তার প্রিয়ঃ

> শোভিত দণ্ডক বন কি রুচী বনী
> ডাঁতিন ডাঁতিন সুন্দর ঘনী—

'হু-হু বাতাস বইচে, সপ্তপর্ণ-পুষ্পের উগ্র সুবাস ভেসে আসচে বনের দিক থেকে, হৈমন্তী-জ্যোৎস্না-স্নাত এই বনান্তস্থলী স্বপ্নপুরীর মত মায়া বিস্তার করেচে ওই বৃদ্ধ রামলালের মনে, অনসূয়া বাঈয়ের মনে, সাবিত্রীর মনে···'

তাই ভরহেচনগর বাস্তবে রূপায়িত হয় না। দিন কাটে, কর্মহীনতা যখন বিবেক দংশন করে, তখন একটু নড়ে-চড়ে ওঠে রামলাল। এই রামলাল ব্রাহ্মণ 'আরণ্যক'-এর নায়ক তথা লেখকের সগোত্র। যুগের স্রোত তাদের টেনে নিয়ে চলেছে প্রকৃতি-ব্যাভিচারী সভ্যতার দিকে, আর হৃদয় এদের প্রকৃতি-সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ জীবনের জন্য তৃষ্ণার্ত।

এই রামলাল অনসূয়া সাবিত্রী, এরা মানুষ কেমন? না, 'ওদের মন কি সুন্দর! কত যায়গায় গেলাম, এদের মত মন কোথাও পেলাম না।'

এই মনকে পাওয়ার আগ্রহ যতটা তীব্র, বাস্তবের প্রতিস্পর্ধী স্রোতের তীব্রতা তার চেয়ে কম নয়, বরং বেশী। তাই 'অভিমানী'

(কুশল পাহাড়ী) গল্পের নায়ক গ্রামীণ সরল পবিত্র রাখনিকে বিয়ে করতে পারে না, অথচ তাকে ছেড়ে যেতেও তার দুঃখ কম নয়। ঠিক এই বেদনা 'উন্নতি'-র (কিন্নরদল) নায়ক গোকুলেরও আছে। গ্রামীণ মেয়ে বাল্যের সঙ্গী বীণার প্রতি তার প্রীতি কম নয়, আবার সে 'চায় যা নাগালের বাইরে তাকে হাতে আঁকড়ে ধরতে, চায় তার রূপ, চায় উন্নতি, ছোট চায় বড়কে আয়ত্ত করার আত্মপ্রসাদ…' 'খোসগল্প'-র (কিন্নরদল) বিষয়বস্তুও প্রায় এই।

'তেলিনীপোতা আবিষ্কার' (প্রেমেন্দ্র মিত্র) এবং 'যাদুঘর'-এর (সন্তোষ ঘোষ) নায়কেরও ইচ্ছা নায়িকার কাছে থাকবার, জীবনস্রোত তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ঐ কোমল দ্বীপখণ্ডের কাছ থেকে। কিন্তু এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বিভূতিভূষণের চেয়ে আলাদা। রূঢ় বাস্তববুদ্ধির আলোকে এ গল্প দুটির স্বাদ ভিন্ন, বিভূতিভূষণের গল্প স্নিগ্ধ, বেদনার্ত। প্রেমেন্দ্র-সন্তোষের নায়িকারা নায়কদের চূড়ান্ত ভাষণের সময়েও জানে তার বন্ধ্যাত্ব। তাদের বহু-পোড়-খাওয়া মন আশা করবার মত পুঁজিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। আর বিভূতিভূষণের নায়িকারা নিঃসঙ্গ দ্বীপখণ্ডের মত আকাশের দিকে চেয়ে আকাশ-কুসুম বোনে এবং ব্যর্থ প্রত্যাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে।*

পূর্বোক্ত 'জাল' গল্পের একটি উক্তি, 'মেয়েরা হচ্ছে আসলে মা, তার পরে অন্য কিছু।' প্রায় একই কথা 'অপরাজিত' গ্রন্থেও আছে। এই মাতৃরূপা স্নেহময়ী নারী বিভূতিভূষণের প্রিয়। উপন্যাসের মত গল্পেও এ রকম বহু নারীচরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

এই মা-র চমৎকার উদাহরণ 'আহ্বান'-এর (শ্রেষ্ঠ গল্প) বুড়ী। সকল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে যে মাতৃ-স্নেহ অকম্পিত দীপ্তিতে

---

* প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সন্তোষ ঘোষের গল্পের মূল ভাবটির সঙ্গে জন্ গলসওয়ার্দি-র 'দি অ্যাপল্-ট্রি'-র সাদৃশ্য আছে। অবশ্য প্রকাশকলায় সকলেই স্বতন্ত্র।

উজ্জ্বল তার প্রতীক যেন ঐ বুড়ী। এক মুসলমান বুড়ীর অতিরক্ত গায়ে-পড়া স্নেহ লেখককে প্রথমে প্রসন্ন করতে পারে নি, বরং বিরক্ত ও বিব্রত করেছে। বুড়ীর মৃত্যুদিনে লেখক ঐ মাতৃহৃদয়কে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন। আজ তিনি বিরক্ত নন। 'আমার মনে পড়লো বুড়ী বলেছিল সেই একদিন—আমি মরে গেলে তুই কাফনের কাপড় কিনে দিস্ বাবা। ওর স্নেহাতুর আত্মা বহুদূর বারাণসী থেকে আমায় কিভাবে আহ্বান করে এনেচে।...দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো—অ মোর গোপাল।'

আপাতদৃষ্টিতে বা সমাজদৃষ্টিতে যারা নীচ, হীন ও পতিত, তাদেরও স্নিগ্ধ উজ্জ্বল নারীরূপটি আবিষ্কার করতে তিনি অভ্যস্ত। বুধোর মা (বুধোর মায়ের গল্প—গল্প-পঞ্চাশৎ), কুসুম (হিঙের কচুরি—গল্পপঞ্চাশৎ), সুলোচনা (সুলোচনার কাহিনী * গল্পপঞ্চাশৎ), গিরিবালা (আচার্য কৃপালনী কলোনী)—এরা সবাই সমাজে হীন, কেউ কেউ বা গণিকা, কিন্তু সস্নেহ এক পবিত্র ব্যক্তিত্বকে তিনি *এ'দের* মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। (তাঁর উপন্যাসেও এ জাতীয় চরিত্রের অভাব নেই। গ্রন্থের অন্যত্র এ বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এই ধরণের চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বোধ হয় হাজু (বিপদ—শ্রেষ্ঠ গল্প)। সারল্য যার চরিত্রের সম্পদ, মালিন্য তাকে স্পর্শ করতে পারে না। ধূলোর মধ্যে বসে থাকলেও শিশু মলিন হয় না। বহতা নদী নির্মলা—সেটা গতির গুণ। গতির মত সারল্যের ঐ রকম একটা গুণ আছে, যাতে নদী সমলা হয় না। সত্যিকার সারল্যও একটা শক্তি, সে পাপের মাঝে থাকলেও পাপকে স্পর্শ করতে দেয় না। এই সারল্যের পবিত্রতার জন্যই পতিতা হাজু লেখকের সমর্থন আদায় করে নিয়েছে। আর দারিদ্র্য যাকে রেখেছিল

---

* বিভূতিভূষণ 'অপরাজিত'-এর প্রণব ছাড়া রাজনৈতিক কর্মীর চরিত্র বিশেষ আঁকেন নি। ওদিকটায় তাঁর প্রবণতা ছিল না। 'সুলোচনার কাহিনী'তে নায়ক একজন রাজনৈতিক কর্মী। সেই দিক থেকেও এই গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

পূর্ণ-বন্ধ্যা করে, তার একটা সাফল্যের ইঙ্গিত তো এর মধ্যে উচ্চারিত। সুতরাং লেখক নিন্দা করতে গিয়েও থেমে গিয়েছেন। অন্য যে কোন লেখকের হাতে পড়লে এই গল্পটি বিদ্রোহে অথবা ব্যঙ্গে প্রবল একটা রূপ নিত। কিন্তু বিভূতিভূষণের সবিস্ময় প্রশান্তি দেখে থমকে যেতে হয়। এই 'পাপ'-এর অনাড়ম্বর সমর্থন এত অনুত্তেজিতভাবে তিনি করলেন কি করে! ইচ্ছে ছিল তিরস্কার করবেন হাজুকে, কিন্তু 'ও উৎসাহ পাইয়া আমাকে ঘরের এ জিনিষ ও জিনিষ দেখাইতে আরম্ভ করিল! একখানা আয়না, একটা টুকনি ঘটি, একটা সুদৃশ্য কৌটা ইত্যাদি। এটা কেমন? ওটা কেমন? সে এসব কিনিয়াছে। তাহার খুসি ও আনন্দ দেখিয়া অতি তুচ্ছ জিনিষেরও প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। এতক্ষণ ভাবিতেছিলাম, ইহাকে এ পথে আসিবার জন্য তিরস্কার করি এবং কিছু সদুপদেশ দিয়া জ্যাঠামশায়ের কর্তব্য সমাপ্ত করি। কিন্তু হাজুর খুশি দেখিয়া ওসব মুখে আসিল না।'

এই সঙ্গে হাজু সম্পর্কে আরো একটা চিন্তা লেখকের মনে উদয় হয়েছে, 'যে কখনো ভোগ করে নাই, তাহাকে ত্যাগ করো যে বলে, সে পরমহিতৈষী সাধু হইতে পারে; কিন্তু সে জ্ঞানী নয়। কাল ও ছিল ভিখারিণী আজ এ পথে আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ি চাহিতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে, নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা পিরিচে—যার বাবাও কোনদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া ছোট করিয়া নিন্দা করিবার ভাষা আমার জোগাইল না।'

বিভূতিভূষণে নারীর মন দূরাভিসারী নয়। গৃহপ্রীতি তাদের মর্মমূলে। সংসারে-উপেক্ষিতা ব্যাধি-ক্লিষ্টা দ্রবময়ী (দ্রবময়ীর কাশীবাস

—শ্রেষ্ঠ গল্প) তাই সত্তর বছর বয়সেও তীর্থে তৃপ্তি পায় না। 'কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই—এই ভিটেই আমার গয়া কাশী।' বাড়ীতে ফিরে দ্রবময়ী দেখলেন, 'বেলা যায় যায়—আষাঢ়ান্ত সুদীর্ঘ দিনমানের শেষে সূর্য ঢলে পড়েচে পশ্চিম দিকের নিবিড় বাঁশবনের আড়ালে। ঘেঁটকোল ফুল কোথাও জঙ্গলে ফুটেচে, বাতাসে তার কটু উগ্র গন্ধ। দ্রব ঠাকরুণের মন শান্তিতে, আনন্দে উৎসাহে পূর্ণ হয়ে গেল।'

দূরাভিসারী মন বিভূতিভূষণের পুরুষদের। তাঁর দরিদ্র ছাপোষা মানুষও দূরের স্বপ্ন দেখে। শম্ভু ডাক্তার ও গোপীকৃষ্ণ (একটি ভ্রমণকাহিনী—শ্রেষ্ঠ গল্প) কত যায়গায় ভ্রমণের পরিকল্পনাই না করে। কিন্তু দারিদ্র্য ও গার্হস্থ্য ঝামেলা তাদের পায়ে চির-শৃঙ্খল পরিয়েছে। তারা শেষে একদিন যায় লাঙ্গলপোতা—বারাসাত থেকে দু মাইল দূর। ব্যঙ্গ করেননি লেখক এদের। কারণ এরা ঠকে নি। লাঙ্গলপোতা তো খারাপ যায়গা নয়। 'সত্যি বেশ যায়গা। অনেক কিছু দেখবার আছে। একটা পুরোনো শিবমন্দির। চৌধুরীদের বড় মজা দীঘি,...মেটে রাস্তা। ...হাট বসে—বেগুন-কুমড়ো-ঝিঙে-রাঙাআলু বিক্রী হয়। রামায়ণ গান হোল নবমীর রাত্রে। পরদিন হোল গ্রামের দলের কেষ্ট যাত্রা।'

দূরের একটু আভাস তো অন্তত তারা পেয়েছে। গ্রাম-প্রকৃতির একটু স্পর্শ লেগেছে তাদের গায়ে। তাই 'মালিপোতা গ্রামের মধ্যে বিখ্যাত ভ্রমণকারী' সিঁদুরচরণ, যে কেস্টনগরের দু' ইষ্টিশান ওদিকে গিয়েছিল তাকে ঠাট্টা করেন নি লেখক। 'পথের দেবতা'-র প্রসাদ-কণিকা পেয়েছে সে। সুতরাং লেখকের সতীর্থ।

সৎ সরল মনের দিকে বিভূতিভূষণের ঝোঁক। সততা ও সারল্য যেখানেই পেয়েছেন, সঞ্চয় করেছেন। তাঁর বহু গল্প এই সংগ্রহের আধার। আদিবাসীদের তিনি ভালবাসতেন তারা এই

মনের অধিকারী ব'লে। এদের নিয়ে তাঁর অনেকগুলি গল্প আছে। বাংলা-সাহিত্যে আদিবাসীদের এতখানি গুরুত্ব আর কোন লেখক দেন নি। 'কুশল পাহাড়ী' গ্রন্থের 'শিকারী' ও 'চাউল', গল্প-পঞ্চাশতের 'কয়লা-ভাঁটা' আদিবাসীদের সরল জীবনযাত্রার গল্প। 'বনে পাহাড়ে' এবং 'হে অরণ্য কথা কও' ডায়রী দুটীতেও লেখকের আদিবাসীপ্রীতির পরিচয় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। আর 'আরণ্যকে' এ পরিচয় সংহত মহিমা পেয়েছে।

বিলাতী সাহেবের প্রতি আমাদের মন রাজনৈতিক কারণে অপ্রসন্ন। তাদের অত্যাচারী মূর্তি দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু বিভূতিভূষণের 'থনটন কাকা' (গল্প-পঞ্চাশৎ) বা 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' * (আচার্য কৃপালনী কলোনী) তেমন লোক নন। ফালমন সাহেব তো বলতেন, 'এদেশেই জন্ম, এ দেশ ভালবাসি'। তাদের সরল আন্তরিকতার গুণেই তারা বিভূতিভূষণের এত প্রিয় হয়েছে।

বিভূতিভূষণ তাঁর ছোট গল্পে এমন অনেকগুলি মানুষ পাঠককে উপহার দিয়েছেন, যারা প্রলোভন সত্বেও অর্থলোভের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে তাদের সততাকে রক্ষা করেছে। 'দৈবাৎ' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'পড়ে পাওয়া' (আচার্য কৃপালনী কলোনী), 'হাজারি খুঁড়ির টাকা' (আচার্য কৃপালনী কলোনী) প্রভৃতি গল্প খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও লেখকের বিশেষ প্রবণতা-সূচক। বিশেষ ক'রে তাঁর শেষ জীবনে, যখন বিংশ শতাব্দীর আকাশ খুবই কালো, তখন তিনি সৎ ও সরল মানুষগুলিকে দীপবর্তিকার মত তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'ভিড়' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'গল্প

---

* গল্পটি সামান্য বাস্তব ভিত্তি আছে। 'সাহেবদের নীলকুঠির ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় বেড়িয়ে বেড়ালুম—কোথায় আজ সেই লালমুরা ফালমান সাহেবের দল...' 'হে অরণ্য কথা কও, পৃঃ ১৩৯।

ফালমন সাহেব ও তাঁর নীচজাতীয়া দাসীর সঙ্গে 'ইছামতী'-র বড় সাহেব ও গয়ামেমের সাদৃশ্য আছে।

নয়' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'আমার ছাত্র' (আচার্য কৃপালনী কলোনী) 'বেনিয়ম' (কুশল পাহাড়ী) প্রভৃতিতে এর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাবে। বিভূতিভূষণ এই যুগের লোভী স্বার্থপর রূপ দেখে এতদূর ক্লিষ্ট হয়েছিলেন যে গল্পের সীমা প্রায় অতিক্রম করে তাঁর উদ্দেশ্যকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে রেখেছিলেন এই গল্পগুলিতে। উদ্দেশ্য-জ্ঞাপক অন্তত একটা প্যারাগ্রাফ এই ধরণের প্রায় গল্পেই পাওয়া যাবে।

'গল্প নয়'-এ 'কুশ্রী কদাকার' একটি ছেলেকে নিয়ে এক বৃদ্ধ ট্রেণের কামরায় উঠল। বলা বাহুল্য, ছেলেটি গাড়ীর লোকজনের কাছ থেকে বিশেষ মধুর অভ্যর্থনা পেল না। ইতিমধ্যে দুটি স্ত্রীলোক এলো গাড়ীতে, যাদের 'একটি তরুণী বধূ, মলিন শাড়ী পরণে, রুক্ষ চুল, মুখশ্রী সুন্দর, চোখ দুটিতে পল্লীপ্রান্তের শান্ত অবসর', এবং 'চোখে—অদ্ভুত স্নেহঝরা দৃষ্টি।' এরা ছেলেটিকে আপন জ্ঞানে 'ঐ ছোট্ট রুগ্ন খোকার রোগ সম্বন্ধে, পথ্য সম্বন্ধে, ওর চিকিৎসা সম্বন্ধে' কত কথা জিজ্ঞেস করল মার মত দরদ-ভরা গলায়। এই ঘটনা দেখতে দেখতে 'আমি বিস্মিত হয়ে উঠেছি। এমন একটা ঘটনা যেন দেখছি যা শুধু এই বিংশ শতাব্দীর নয়, সর্বকালের, সর্বযুগের। মানুষের প্রতি মানুষের হিংসায়, শঠতায়, নিষ্ঠুরতায়, স্বার্থপরতায়, ঈর্ষায় যে বিংশ শতাব্দীর নভোমণ্ডল আজ ধূম-মলিন—যে বিংশ শতাব্দীতে আছে শুধু অর্থের আদর—সেখানে এই ময়লা-শাড়ি-পরণে দরিদ্রা পল্লীবধূটি ও তার করুণাময়ী সঙ্গিনী এক নতুন বার্তা শুনিয়ে দিলে। সে বার্তা নতুন হলেও হিমালয়ের মতই পুরনো।

'এই গাড়ির মধ্যে এত পুরুষমানুষ ছিল, কেউ ফিরেও চেয়ে দেখে নি ছেলেটার দিকে। সনাতনী মাতৃরূপা নারী দুটি এসে এই মাতৃহীন মৃত্যু-পথযাত্রী শিশুকে মাতৃস্নেহের বহু-পুরাতন অথচ চির-নূতন বাণী শুনিয়ে দিলে। সেদিন সে ট্রেণের মধ্যে গুটি-কয়েক ক্ষণের জন্য বিংশ-শতাব্দী ছিল না—সমাজদ্রোহী, কালোবাজার-পুষ্ট

লোভী বিংশ-শতাব্দী। ছিল সেই অমর মাতৃলোক, বিশ্বের সমগ্র জীবজগৎ যার করুণাধারায় বিধৌত।'

'ভিড়ে'ও * প্রায় ঐ রকম অংশ আছে। ট্রেণের ভীড়ে যখন 'মন নিষ্ঠুর নির্মম হয়ে উঠেছে···। অন্য কারও সুবিধা-অসুবিধা সে এখন বুঝতে রাজী নয়,' তখন পুত্রশোকাতুর লোকটা 'হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।' সঙ্গে সঙ্গেই 'গাড়ীর আবহাওয়া ওর কান্নার সুরে কি আশ্চর্যভাবেই বদলে গিয়েছে। এই নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, উগ্র স্বার্থবোধ, যা হাওড়া থেকে উঠে পর্যন্ত সমানে দেখে আসছি, যাতে শুধু মানুষের পশুত্বের ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল চোখের সামনে, ওই লুঙি-পরা লোকটির চোখের জলে সব যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মানুষের লজ্জা হল মানবতার অপমানে যেন। যেন সবাই সতর্ক হয়ে উঠল।'

'আমার ছাত্র' গল্পটি আরম্ভ হচ্ছে এই ভূমিকা করেঃ 'মানুষের প্রতি মানুষের এই যে হিংসা, এই যে উলঙ্গ বর্বরতা আচরিত হচ্ছে সভ্যতার নামে, শতবৎসরের শিক্ষা সংযম এক মুহূর্তে যাতে করে তৃণের মত উড়ে গেল, উদগ্র লোভ, হিংসা ও লালসার এই যে নগ্ন মূর্ত্তি দেখা গেল চোখে—তাতে দমে গেলে চলবে না। মানুষ আছে এখনও, মানবতা আছে, মনুষ্য সমাজ থেকে লজ্জায় মুখ ঢেকে বিদায় নেবার সময় ভগবান এদেরই দিকে ফিরে ক্ষীণ আশ্বাসের বাণী শুনতে পান, শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ান।'

গণেশদাদার কথা এতদিন বলবার যোগ্য বলেই ভাবেন নি, কিন্তু আজ তার ছবি লেখকের মনের পটে মস্ত বড় হয়ে ফুটে উঠেছে। তার একটা কারণ 'গণেশদাদা আমার ছাত্র'; আর দ্বিতীয় কারণ, 'কি বৈষয়িক উন্নতির দিক থেকে কি ইংরিজি শিক্ষার দিক থেকে

---

* 'ভিড়'ও 'গল্প নয়' দুটো প্রায় একই ঘটনা। এদের সঙ্গে একটি বিদেশী গল্পের দূর-সাদৃশ্য আছে।

গণেশদাদা সারা জীবন প্রথম সোপানের দিকেই রয়ে গেল বটে কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যার সাহায্যে ও সব সোপান অতিক্রম করে, আমাদের অনেককে অতিক্রম করে, অনেক উঁচুতে গিয়ে পৌঁছেছিল। তাই আজকের দিনে বার বার তার কথা মনে পড়ে।' *

গণেশদাদা সম্পর্কে লেখক এক যায়গায় বলেছেন, 'মনুষ্য সমাজ থেকে লজ্জায় মুখ ঢেকে বিদায় নেবার সময় ভগবান এদেরই দিকে ফিরে ক্ষীণ আশ্বাসের বাণী শুনতে পান, শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ান।'

লেখক যেন বলতে চান ঈশ্বরের বিশেষ করুণা আছে এই সৎ নির্লোভ সরল মানুষগুলোর ওপর, উভয়ের সান্নিধ্য ঘনিষ্ঠ ঐ সারল্যের গুণে, লেখক এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে এমন কয়েকটি চরিত্র এঁকেছেন যারা সারল্যকে পাথেয় করে একটা আধ্যাত্মিক স্তরে উঠে এসেছে। কুশল পাহাড়ী (কুশল পাহাড়ী) 'মড়িঘাটের মেলা'-র বুনো সাধু (আচার্য কৃপালনী কলোনী), গিরিবালা (আচার্য কৃপালনী কলোনী) এরা এই ধরণের চরিত্র।

'দুর্মতি' (গল্প-পঞ্চাশৎ) ও 'সঞ্চয়'-এর (গল্প-পঞ্চাশৎ) নায়করা সততা থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। লেখক তাদের অনুতাপের অনলে শুদ্ধ করে নিয়েছেন। গল্প দু'টি আসলে এক। উভয় ক্ষেত্রেই অসততার কারণ দারিদ্র্যের চাপ, বঞ্চনার পাত্র দু'যায়গাতেই স্ত্রী।

---

* 'আমার ছাত্র'-র সঙ্গে বনফুলের 'অর্জুন কাকা'র বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য উভয়ে দুস্তর। বিভূতিভূষণ গণেশ মুচিকে অনেক 'উঁচুতে' দেখছেন আর বনফুল সুদীর্ঘ কাহিনীতে বয়স্ক অর্জুন জেলের শিক্ষা সাধনার বিবরণ দিয়ে যখন আমাদের মনে তার একটা আসন প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন, তখন সিন্দুক-উপাখ্যানে তার নির্বুদ্ধিতা দেখিয়ে একটা তুড়িতে সে আসন ভেঙে দিলেন। যেন বনফুল বলতে চান, হাজার লেখাপড়া শিখলেও অর্জুন জেলে অর্জুন জেলেই।

বিংশ শতকের লোভ ও কলুষের বিরুদ্ধে বিপরীত চরিত্র হিসেবে যেন লেখক সরল নির্লোভ মানুষগুলিকে এঁকেছেন। কিন্তু এরা সকলেই নিষ্ক্রিয় ধরণের চরিত্র। এই কলুষের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল সক্রিয় রাজনৈতিক বা সামাজিক কর্মী তাঁর সাহিত্যে নেই। প্রণব (অপরাজিত) বা 'সুলোচনার কাহিনী'-র নায়কেরও রাজনৈতিক চিন্তা বা কর্মের কোন পরিচয় দেওয়া হয় নি।

সরকারী উদ্যোগে কোন সাহিত্য-সভা বা গ্রন্থসঙ্কলনের আয়োজন হলে তাতে রাজনৈতিক বিষয় আনয়নে তথা সরকারের গুণগান বর্ণনায় বহু সাহিত্যিক অনুপ্রাণিত হন। শ্রীজহরলাল নেহরুর ষষ্টিতম বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে প্রদত্ত 'নেহরু অভিনন্দন গ্রন্থে' বিভূতিভূষণের 'The Consolation' * নামে যে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে অনুরূপ অনুপ্রেরণা তিনি পান নি। গল্পটি পুরোপুরি তাঁর নিজের মনের সুরে বাঁধা। শুধু একটা যায়গায় মুহূর্তের চিত্তবিক্ষেপ বোধহয় তাঁর ঘটেছিল। অপ্রাসঙ্গিকভাবে সেখানে তিনি 'রামধুন' গেয়েছেন ঃ

'আজ মনে হচ্ছে অকূল সমুদ্রে সে কূলের আভাস দেখতে পাচ্ছে। সকলেই বলছে যে দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে তখন এবার সব দুঃখকষ্ট ঘুচল, ছেলেরা ভাল ভাল কাজ পাবে আর তাড়াতাড়ি উন্নতি হবে—সামান্য কটা টাকার জন্যে আর জীবনপাত করতে হবে না। স্বাধীন পৃথিবীতে আর কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে না—অনেক বড় বড় কাজ হবে—চারিদিকেই সভা-সমিতি ও বক্তৃতার ধূম পড়ে গেছে। কয়েক দিন আগেও সকলে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি ফুলের মালায় সাজিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সেদিন তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

---

* ইংরাজী ভাষায় গল্পটি ১৯৪৯ খৃঃ প্রকাশিত হয়। গল্পটির মূল বাংলা পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। বাংলায় অনুদিত করে এটি প্রকাশ করেন দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়। কথাসাহিত্য, কার্তিক, ১৩৬৫ দ্রষ্টব্য। উদ্ধৃত অংশটি দেবীদাসবাবুর অনুবাদ থেকে নেওয়া।

ছিল। মহাত্মা গান্ধীর খুব প্রিয় একটা গান, বোধহয় 'রামধুন' সেটা সুরেশ খুব ভাল গায়—

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম...'

বিভূতিভূষণের অনেকগুলি গল্প আছে শিক্ষক ও শিল্পীদের নিয়ে। এখানেও লেখক মুখ্যত সারল্য-সন্ধানী। তবে এদের সারল্যের সঙ্গে ভাবুকতা বা জ্ঞানসাধনা যুক্ত থাকায় বিভূতিভূষণ এই জাতীয় চরিত্রগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত প্রীতি বোধ করতেন। তাঁর বহু চরিত্র একাধারে শিল্পী ও শিক্ষক—ঠিক যেমন ছিলেন তিনি নিজে।

বিভূতিভূষণের শিল্পীরা প্রায়ই নির্লোভ, নিষ্কাম। * 'কুশল পাহাড়ী'তে দুটি গল্প আছে শিল্পী-বিষয়ক—'ঝড়ের রাতে' এবং 'আর্টিষ্ট'। 'আর্টিষ্ট' গল্পের নায়ক ভিখিরি অবাইদাস বোষ্টমের ছেলে অশ্বিনী, সে যাত্রা-দলের বড় পাখোয়াজ বাজিয়ে। এ ছাড়া বাকী প্রায় সব শিল্পীই সাহিত্যশিল্পী। 'কবি কুণ্ডু মশায়' (গল্প-পঞ্চাশৎ) এবং 'রামতারণ চাটুজ্যে, অথর' (গল্প-পঞ্চাশৎ), নামেই প্রকাশ, উভয়েই সাহিত্যিক। 'বন্দী'-র (গল্প-পঞ্চাশৎ) যুবক নায়কও উপন্যাস লেখে। বিভূতিভূষণ মনে করেন যে এই সব সাহিত্যিকদের 'প্রকৃত কবিমন, কল্পনার উদার প্রসার ছন্দের বা কোনও শব্দের সৌন্দর্য সম্বন্ধে জ্ঞান' যথেষ্টই আছে। কিন্তু যা এদের নেই সে হচ্ছে 'বর্তমানের উপযোগী বিষয় নির্বাচনের ক্ষমতা।···ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের, দাশরথি রায়ের প্রভাব তারা আজও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।' কিন্তু বিভূতিভূষণ এদের অবহেলা করতে চান না, বরং এদের প্রতি তাঁর একটা প্রীতিই আছে। কারণ তিনি জানেন, 'এরা

* উপন্যাসের ক্ষেত্রে আরণ্যকের ধাতুরিয়া, বেঙ্কটেশ্বর ও যুগলপ্রসাদও অনেকটা এই জাতীয় চরিত্র। একজন নৃত্যশিল্পী, একজন কবি আর একজনকে কি বলা যায়? পুষ্পশিল্পী?

সরস্বতীর নিঃস্বার্থ সেবক, এরা যশ পায় না, অর্থ তো পায়ই না—লেখার নেশায় লিখে যায়, যশের পরিবর্তে পায় অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের ব্যঙ্গবিদ্রূপ—'

এই জাতীয় 'সরস্বতীর নিঃস্বার্থ সেবক' সাহিত্য-জীবনের একেবারে গোড়ার দিকেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'অপরাজিত'-তে ঠিক এই ধরণের একটি চরিত্র আছে। তার নাম আজবলাল ঝা। সে উভয় অর্থেই সরস্বতীর সেবক—সে কবি ও শিক্ষক। কিন্তু টোল তার চলে না, তার কাব্য কেউ পড়ে না। নানা স্থানে ঘুরে কোথাও বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে সম্প্রতি একটি ডাকবাংলোয় আজ সাত-আট বছর 'বনবাস করিতেছে।' তার নির্জন জীবনে কাব্যই একমাত্র সঙ্গী। বিভূতিভূষণের অন্যান্য সাহিত্যিকের মত আজবলাল ঝা-ও 'একটু বেশী বকে, বিদ্যাটা যেন বেশী জাহির করিতে চায়—কিন্তু এত সরলভাবে করে যে, দোষ ধরাও যায় না।' এ লোকটিও 'বর্তমানের কোনও ধার ধারে না। প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষায় একেবারে ডুবিয়া আছে।' অপুর খুব সুন্দর লাগল 'এই নিরীহ অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটির কথাবার্তা ও তাহার আগ্রহভরা কাব্যপ্রীতি—এই নির্জন বনবাসেও একটা শান্ত সন্তোষ। কোন দুঃখ নাই, কোন কষ্ট নাই।'

'অপরাজিত'-র আগে 'পথের পাঁচালী'তে প্রায় অনুরূপ একজন শিল্পীর দেখা মিলবে। আজবলাল ঝা-কে দেখে অপুর তার বাবার কথা মনে পড়েছেঃ 'একটি অদ্ভুত ধরণের দুঃখ ও বিষাদ অপুর হৃদয় অধিকার করিল। কত কথা মনে আসিল, তাহার বাবা এই রকম গান ও পাঁচালী লিখিতেন তাহার ছেলেবেলায়, কোথায় গেল সে সব? যুগ যে বদল হইয়া যাইতেছে, তাহা ধরিতে পারে না।...কে আজকাল ইহার আদর করিবে? অথচ কত

ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনন্দ ইহাদের পিছনে আছে।' *

শিক্ষক আজবলাল ঝা-র সঙ্গে 'আরণ্যক'-এর শিক্ষক মটুকনাথের কিছুটা সাদৃশ্য আছে।

'শাবলতলার মাঠ'-এর (গল্পপঞ্চাশৎ) উমাচরণ মাষ্টারও কবি। এই সব গল্পে শিক্ষক-জীবনের সমস্যার বিশেষ ছায়াপাত হয় নি। বরং 'বিধু মাষ্টার'-এর (বিধুমাষ্টার) দারিদ্র্যের মধ্যে এ কালের শিক্ষক জীবনের সমস্যার ঈষৎ আভাস আছে। 'অনুবর্তন' উপন্যাসেও লেখক এই সমস্যার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়েছেন।

দূরকে জানার তীব্র আগ্রহ ছিল বিভূতিভূষণের। দেশ-পরিক্রমা ও মানসভ্রমণে তাঁর সাহিত্যের দেশ-কালের সীমা সুবিস্তৃত। উত্তর ভারতের গ্রাম-নগর-অরণ্যে তার ভৌগলিক বিস্তার, আর অতীতের বৌদ্ধ যুগ থেকে তার কালসীমা সুরু, ঊনিশ শতকের ইছামতী পেরিয়ে বর্তমানে তার উত্তরণ। আর 'দেবযানে' বিভূতিভূষণ দেশকালাতীত রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছেন।

কিন্তু এই দেশ-কাল-বিস্তৃত পরিধির মধ্যমণি সমসাময়িক গ্রাম-বাংলা। বাংলাদেশের গ্রামজীবনের এত খুঁটিনাটি পরিচয় বোধহয় আর কারুর লেখাতেই পাওয়া যায় না। কিন্তু লেখক গ্রামকে ভালবাসলেও গ্রামের মধ্যে আবদ্ধ নন। তাঁর দূর-তৃষিত মন জীবনকে বৃহত্তর

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিভূতিভূষণ তাঁর শিল্পীজীবনের কাজটাকে পিতার অসম্পূর্ণ কর্মের সম্পূর্ণতা-সাধন বলে মনে করতেন। তৃণাঙ্কুরে (পৃঃ ৮) বিভূতিভূষণ বলেছেন: 'আজ বই (পথের পাঁচালী) বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ করেছে দেখে আমি আনন্দিত। প্রবাসী অপিসে বসে এই কথাই কেবল মনে উঠছিল যে আজ মহালয়া, পিতৃতর্পণের দিনটা, কিন্তু আমি তিল-তুলসী তর্পণে বিশ্বাসবান নই—বাবা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবার জন্যে, তাই যদি কর্ত্তে পারি; তার চেয়ে সত্যতর কোনো তর্পণের খবর আমার জানা নেই।'

পাত্রে পান করাবার জন্য উদগ্রীব। গ্রামে কিন্তু একদল মানুষ আছে যারা গাঁয়ের চৌহদ্দীর বাইরে পা বাড়াল না কোনদিন, এদের প্রতি লেখকের মনোভাব ব্যঙ্গ বা পরিহাসের নয়। বরং এদের জন্যে তাঁর আছে সস্নেহ করুণা। তাদের বন্দীদশায় লেখক নিজে ব্যথিত, কারণ এই বন্দীরা জীবনের এক বৃহৎ আনন্দ থেকে বঞ্চিত। এদের জন্যে সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে 'বন্দী' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'বেচারী' (গল্প পঞ্চাশৎ) 'সার্থকতা' (যাত্রাবদল) প্রভৃতি গল্পে। 'বন্দী' এবং 'বেচারী' প্রায় একই গল্প। দু'যায়গাতেই নায়ক গ্রামসীমার গণ্ডী পেরোতে ব্যগ্র, অথচ তাদের মনের কোথায় যেন একটা শেকল পরানো আছে। এই অসঙ্গতি একজনকে করেছে অসহায় হতভাগ্য, আর একজনকে করেছে উন্মাদ।

'সার্থকতা'য় পঞ্চু মুখুয্যের 'দেখি-এবার-বেরিয়ে' মনোভাবের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ে-সফল ননীর জীবনের ব্যর্থতার প্রসঙ্গটিও বিপরীত দিক থেকে দেখানো হয়েছে। আর্থিক সাফল্যের অন্তরালে 'ভেতরের সম্পদ' ততটা পায় নি সে, পেয়েছে 'বাইরের পালিশ মাত্র।' ননীর প্রতিও লেখকের সহানুভূতি কম নয়। ননী ও পঞ্চু দুজনে জীবনের দুটো ভিন্ন দিক থেকে বঞ্চিত।

ননী কয়েক দিন গ্রামে থেকে আর্থিক সাফল্যের ঔজ্জ্বল্যে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে ; তার থেকেও অনেক গভীর ঔজ্জ্বল্য শ্রীপতির বৌর (কিন্নরদল), সে কয়েক মাসের জন্য বদ্ধ অন্ধকার গ্রামজীবনে একটুকরো স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করেছে তার প্রতিভা সুরুচি ও আত্মীয়তা দিয়ে। মৃত্যু এসে সেই স্বর্গপ্রাণকে নিভিয়ে দিয়েছে, গ্রাম আবার ফিরে গিয়েছে তার বদ্ধ নিরানন্দ অন্ধকার বিবরে। কিন্তু এ তো আর পুরনো সেই গ্রাম নয়, এ যে স্বর্গের স্বাদ পেয়েছে ইতিমধ্যে। সে-স্বাদ ভোলবারও নয়, নতুন করে রচনার সাধ্যও নেই। স্মৃতির উদ্বোধনে গল্পের পরিণতি বেদনা-ভারাতুর।

'মৌরীফুল'-ও গ্রামের মেয়ে ও সহরের মেয়ের সাক্ষাৎকারের গল্প। 'কিন্নরদলে' প্রধান চরিত্র সহরের মেয়ে, 'মৌরীফুলে' প্রধান চরিত্র গ্রামের মেয়ে। বস্তুত 'কিন্নরদলে'র শান্তি চরিত্রটিকে গুরুত্ব দিয়ে এঁকে শ্রীপতির বৌকে অপেক্ষাকৃত গৌণ স্থানে আনলে ভাববস্তুর দিক দিয়ে তা অনেকটা 'মৌরীফুলে'র কাছে আসবে। 'ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখিচি, অমন লংকাপোড়া ব্যাপক যদি কোথাও দেখে থাকি, ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার, বাবা, বাবা।'—এই বাক্যি নিয়ে শান্তি প্রথম আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছিল, তারপরে তার কী গুরুতর রূপান্তরই না ঘটল একটু সস্নেহ সুরুচির স্পর্শে! সুশীলাও একগুঁয়ে ও ঝগড়াটে, তারও দরকার ছিল একটু স্নেহস্পর্শের। সেটুকু পেলে সে যে কতদূর সুশীলা হতে পারে তার প্রমাণ ঐ একটি দিনের নৌযাত্রায় আছে। কিন্তু সেটা তার জীবনে একটি দিনই মাত্র এসেছিল, তাই সুশীলার 'মৌরীফুল'-পরিচয় শ্বশুরবাড়ীর লোকজনের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল চিরদিনের জন্যে, অথচ এটাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। এইখানেই গল্পটির ট্র্যাজেডী যে 'মৌরীফুল' হতে পারত, তার পরিচয় রয়ে গেল অলক্ষ্ম নামে।

সাধারণ মানুষ, আকাঙ্খাও তার সাধারণ; কিন্তু সেই তুচ্ছ আশাও অপূর্ণ থেকে যায়। রাজ্য ভাঙা-গড়াব মত বিরাট ঘটনা নয়, ট্র্যাজিক নায়কের সংগ্রাম-বেদনা-মথিত জীবন-মহিমা হয়তো এর নেই। তবু তুচ্ছ আশা আর তার ব্যর্থতা ঐ সাধারণ ব্যক্তিটির কাছে কম নয়। বিভূতিভূষণের কাছেও তার আবেদন গভীর। গ্রামের মেয়ে সহরে এসেছে বৌ হয়ে, তার ইচ্ছে স্বামীর অফিসের থিয়েটার দেখা (থিয়েটারের টিকিট—গল্পপঞ্চাশৎ), কোন অশিক্ষিতা কিশোরীর কামনা তার ভাবী স্বামী যেন ম্যাট্রিক পাশ করে (গায়ে হলুদ—গল্প-পঞ্চাশৎ), কারুর সারা জীবনের আকাঙ্খা একটা মাথা গোঁজবার মত বাড়ীর (ভণ্ডুলমামার বাড়ী—যাত্রাবদল), কারুর সাধ

পুঁইশাকের (পুঁইমাচা), কারুর বা বাটি চচ্চড়ির (বাটি চচ্চড়ি —কিন্নরদল)। সকলেরই এই সব সামান্য কামনা কোন না কোন ভাবে খণ্ডিত। থিয়েটারের লাল টিকিট, বাড়ীটা, পুঁইমাচা, আলু আর বাটি পরে ব্যর্থতার স্মৃতিকে জাগিয়ে বেদনাকে আরো গভীর করেছে।

পূর্ব-প্রণয় বা মিলন-সম্ভাবনার স্মৃতিকে জাগিয়েছে 'পারমিট' (গল্পপঞ্চাশৎ), 'বিড়ম্বনা' (গল্পপঞ্চাশৎ), 'চিঠি' (আচার্য কৃপালনী কলোনী), 'বাঁশী' (বেণীদির ফুলবাড়ী)।

স্মৃতির রাজ্যে ডুব দিয়ে তার আনন্দ-বেদনার স্বাদ পান করতে ভালবাসেন বিভূতিভূষণ। তাই শুধু উপরে উল্লিখিত গল্পগুলিই নয় আরো বহু স্থানে দেখা যাবে, গল্পের পরিসমাপ্তি কালে অন্তত পুরাতন স্মৃতিকে তিনি একবার জাগিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। 'দুর্মতি'তে ব্রেসলেট ও 'সঞ্চয়ে' আঠেরো টাকা সাত আনা পূর্বস্মৃতিকে তীব্রভাবে জাগিয়েছে। 'কিন্নরদলে' রেকর্ড-টা এই কাজ করেছে। এটা বিভূতিভূষণের বহু গল্পে একটা বিশেষ রীতিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

লঘু মিষ্টি রোমান্সের গল্প 'বাকস-বদল' (গল্পপঞ্চাশৎ)। 'ঠাকুরদার গল্প'-কেও (গল্পপঞ্চাশৎ) প্রায় এই দলেই ফেলা যায়।

তাঁর রোমান্স-জাতীয় লেখার মধ্যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত গল্পের উৎকর্ষ বেশী। যথা, 'মেঘমল্লার'।

'মেঘমল্লার' ছাড়া আরো কয়েকটি গল্প আছে ইতিহাসের পটে লেখা। 'দাতার স্বর্গ' (মৌরীফুল), 'প্রত্নতত্ত্ব' (মৌরীফুল), 'স্বপ্ন-বাসুদেব' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'শেষলেখা' (কুশল পাহাড়ী) প্রভৃতি।

এই ধরণের গল্পগুলিতে অবশ্য ইতিহাস খুবই ক্ষীণ ; লেখকের রোমান্স-কল্পনাই এগুলির প্রাণ। স্মৃতিচর উজানী মন তাঁর। স্মৃতি যতদূর স্পষ্ট, ততদূর তো স্বচ্ছন্দেই যাওয়া যায় ; তারও পেছনে

যেতেই বা বাধা কি, কপালে যখন সেই তৃতীয় নেত্রটা আছে, যে নেত্র শুধু বস্তুর অবস্তুক সৌন্দর্যকে দেখায় না, অদেখা বস্তুকেও জীবন্ত করে তুলতে পারে। আমাদের জীবন-পরিধির স্মৃতিও কি সবটুকু স্পষ্ট করে মনে থাকে, সে-ও কল্পনার রসে সঞ্জীবিত নতুন এক জগৎ। জীবন-পরিধির বাইরেও স্মৃতিচর উজানী মনটাকে ছড়িয়ে দিয়ে লেখক ঐ কল্পনা-রসটাই প্রধান করে তুলেছেন। বিভূতিভূষণ তাঁর 'আরণ্যকে' বলেছেন, 'ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়া লাভ কি? কি সুন্দর ছায়া এই শ্যাম বংশীবটের, কেমন মন্থর যমুনা জল, অতীতের শত শতাব্দী পায়ে পায়ে পার হইয়া সময়ের উজানে চলিয়া যাওয়া কি আরামের।' এই গল্পগুলির মূলে সময়ের উজানে শত শতাব্দী পার হবার রোমান্টিক আগ্রহ। তাই স্বভাবতই ইতিহাস এখানে অতি গৌণ, রোমান্স-প্রেরণা মুখ্য।

আর একটা লক্ষণীয় বিষয়, প্রধানত ইতিহাসের বৌদ্ধ যুগই লেখককে অনুপ্রাণিত করেছে; প্রায় সব গল্পেরই আবহাওয়া বৌদ্ধ।

বিভূতিভূষণের বুদ্ধপ্রীতির নিদর্শন তাঁর সাহিত্য-জীবনের গোড়া থেকে কিছু কিছু পাওয়া যায়। 'অপরাজিত'-র একটি অংশ এই রকম ঃ 'অপুর যদি কাহারও উপর শ্রদ্ধা থাকে তবে তাহার আবাল্য শ্রদ্ধা এই সত্যদ্রষ্টা মহাসন্ন্যাসীর উপর। ছেলের নাম রাখিয়াছে অমিতাভ।...মনে পড়ে সেই অপূর্ব রাত্রি, নবজাত শিশুর চাঁদমুখ ...ছন্দক...গয়ার জঙ্গলে দিনের পর দিন সে কি কঠোর তপস্যা।... রাজা শুদ্ধোদনের কপিলাবস্তুও মহাকালের স্রোতের মুখে ফেনার ফুলের মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, কোন চিহ্নও রাখিয়া যায় নাই, কিন্তু তাহার দিগ্বিজয়ী পুত্র দিকে দিকে যে বৃহত্তর কপিলাবস্তুর অদৃশ্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন—তাঁর প্রভুত্বের নিকট এই আড়াই হাজার বৎসর পরেও কে না মাথা নত করিবে?' (পৃঃ ২৬৬-৬৭)।

'দাতার স্বর্গ' অনেকটা পৌরাণিক গল্পের লক্ষণাক্রান্ত। তাছাড়া

অন্তর্নিহিত রূপক-অর্থটুকুই এর মূল বক্তব্য। 'শেষ লেখা'-রও উদ্দেশ্য যেন লেখকের একটি বক্তব্যকে প্রকাশ করা। সত্যকার জ্ঞান হলে জাগতিক প্রেমের প্রতি আর মোহ থাকে না—এই যেন গল্পটির মর‍্যাল। বিভূতিভূষণ তাঁর শেষ জীবনে আধ্যাত্মিকতার দিকে খুব বেশী ঝুঁকেছিলেন। তার প্রমাণ শুধু 'দেবযান' নয়, এই শেষ গল্পগ্রন্থ 'কুশল পাহাড়ী'র 'শেষ লেখা' ছাড়াও এই বইয়ের অন্য কতগুলি গল্পে তার পরিচয় আছে।

'মেঘমল্লার' ও 'প্রত্নতত্ত্ব' দুটোই মূলত সরস্বতীর গল্প। 'মেঘমল্লারে' সরস্বতী সৌন্দর্যের কলাদেবী, 'প্রত্নতত্ত্বে' জ্ঞানদেবী। 'মেঘমল্লারে' সরস্বতী বন্দিনী—তার বেদনায় আপ্লুত এ কাহিনী। 'প্রত্নতত্ত্বে' সরস্বতী ন' শো বছর মাটিচাপা থাকবার পর তার মুখে হাসি ফুটেছে। 'মেঘমল্লারে' সরস্বতী বন্দিনী থাকবার ফলে সমগ্র কলাজগতে বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। 'প্রত্নতত্ত্বে' সরস্বতী সমাধিস্থ থাকাতে যেন চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন দীপঙ্কর। একটি গল্পে সরস্বতীর মুক্তির মুল্য দিয়েছে প্রদ্যুম্ন—সে প্রস্তরীভূত হয়েছে। আর একটি গল্পে মাটি-চাপা সরস্বতীর মুখে হাসি ফোটাতে স্থকুমার শুনেছে সহকর্মীদের টিটকিরি—'চাকরিবাজী!' প্রদ্যুম্ন ও স্থকুমার বহির্জগতে তিরস্কৃত বা ব্যর্থ, অন্তর্জগতে তারা পুরস্কৃত, জ্ঞান ও সৌন্দর্যের ব্যাপ্তিতে তাদের সিদ্ধি। জ্ঞানের রাজ্যে স্থকুমার উত্তরসূরী, দীপঙ্কর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আর প্রদ্যুম্নের বিরাট আত্মত্যাগে যেন বিভূতিভূষণ স্বয়ং সশ্রদ্ধ। যারা কলাদেবীকে নিজেদের নীচ স্বার্থ ও প্রলোভনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়, তাদের প্রতি বিভূতিভূষণের বিরাগ, আর যারা সর্বস্ব ত্যাগ করে সরস্বতীর বিশুদ্ধ প্রাণসৌন্দর্যকে রক্ষা করবার জন্য, সেই সত্যকার শিল্পীদের প্রতি বিভূতিভূষণের মাথা আনত। এই প্রসঙ্গে 'উড়ুম্বর' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। এখানে অর্থলোভী ও সস্তা যশের প্রত্যাশী লেখকদের ঠাট্টা করেছেন বিভূতিভূষণ।

'স্বপ্ন-বাসুদেব'-এর কাহিনীটি নিয়ে পরবর্তী কালের একজন লেখক আর একটি গল্প লিখেছেন। রমাপদ চৌধুরীর 'হেলিওডোরাস ও মাধবিকা' (রূপযানী) ও 'স্বপ্ন-বাসুদেব' প্রায় একই গল্প। উভয়ের উৎস বোধহয় একটিই বই—'ভারতের দেবদেউল'। লেখক জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এই গ্রন্থে কাহিনীটির কাঠামো দেওয়া আছে। দুজনেই অবশ্য নিজের মত সামান্য পরিবর্তন করেছেন তাঁদের গল্পে।

বিভূতিভূষণের 'স্বপ্ন-বাসুদেবে' নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎকার বেশ নাটকীয়। গল্পের প্রথম অংশে একটা কাব্যিক পরিবেশ সৃষ্টিরও চেষ্টা আছে। হেলিওডোরাস যুদ্ধ উপলক্ষ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর থেকে দীর্ঘ অংশটি ক্লান্তিকর। পরিণতিতে রয়েছে খুব সাধারণ রোমান্টিক কল্পনার পরিচয়। অতিলৌকিক-প্রীতির বশে বিভূতিভূষণ বাসুদেবকে দিয়ে স্বপ্নে রাজাকে আদেশ করিয়ে বিবাহ ঘটিয়েছেন, ফলে নায়ক-নায়িকার প্রেমে তাদের সক্রিয় ভূমিকা গৌণ হয়ে গিয়েছে। উভয়ের বিরহ-বেদনা ও সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা এই প্রেমকে অবশ্য কিছুটা মহিমা দিয়েছে।

রমাপদ চৌধুরীর গল্প 'হেলিওডোরাস ও মাধবিকা'-য় হেলিও-ডোরাস মালোয়া-রাজপুত্রের বন্ধু এবং শান্ত যুবক। বিভূতিভূষণে হেলিওডোরাস উদ্ধত ভারত-বিদ্বেষী যুবক। বিভূতিভূষণ তাকে বাসুদেব-ভক্ত করিয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন; এখানে প্রেম হেলিওডোরাসের মনে বাসুদেব-ভক্তি এবং ভারত-প্রীতি ঢুকিয়ে দেওয়ার উপায় যেন। প্রেমকে বিভূতিভূষণ একক অনন্য-নিরপেক্ষ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেন নি। বিভূতিভূষণে প্রেম ভক্তির সোপান, এবং সেটা এসেছে আকস্মিকভাবে অলৌকিক পথে। রমাপদ চৌধুরীর গল্পে প্রেম এসেছে সাধনার পথে। রমাপদ প্রেমকে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী, ভক্তিকে নয়, অতিলৌকিক অংশকে নয়। হেলিওডোরাসের দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর সাধনা প্রধানত প্রেমের জন্য। সেই সাধনা তাকে ভাবের উচ্চলোকে নিয়ে

গিয়েছে—সেখানে বিবাহের অর্থ তার কাছে সাধারণ বিবাহ থাকে নি।

বিভূতিভূষণের গল্পে বিবাহ ঘটাচ্ছেন বাসুদেব ; বাসুদেবের অলৌকিক মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় গল্পরস শেষ দিকে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অবশ্য, গল্পের নামেও বোঝা যাবে, বিভূতিভূষণের লক্ষ্য ছিল বাসুদেব, আর রমাপদর লক্ষ্য নায়ক-নায়িকা।

গল্পের ভাষা বিভূতিভূষণে ভাল, আর ঘটনাবিন্যাস রমাপদতে সংহত।

দূর-অতীতের-পটে বিধৃত এই গল্পগুলিতে অতিপ্রাকৃতের ছায়াপাত ঘটেছে। আর কতগুলি গল্প আছে যেখানে অতিপ্রাকৃত বিষয়বস্তু বর্তমানের পটেই বিধৃত। যথা, 'হাসি' (মৌরীফুল), 'খুঁটিদেবতা' (মৌরীফুল), 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' (জন্ম ও মৃত্যু ; কিন্নরদল), 'পেয়ালা' (যাত্রাবদল) 'পৈতৃক ভিটা' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'মুটি মন্তর' (গল্প পঞ্চাশৎ), 'কাশী কবিরাজের গল্প' 'বিরজা হোম ও তার বাধা' ইত্যাদি। শুধু গল্প-সংখ্যা দেখেই বোঝা যায়, বিভূতিভূষণ তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায় এই বিষয়টার প্রতি অনেক বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন। শুধু গল্পে নয় বহু উপন্যাস ও ডায়রীতেও তার চিহ্ন বর্তমান। অতিলৌকিক জগৎ সম্বন্ধে তাঁর একটা সরল বিশ্বাস ছিল, যা এ যুগের মানুষের পক্ষে দুর্লভ। তিনি এ জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করেন নি কোন দিন, কোন সন্দেহ ছিল না তাঁর মনে। * এই সরল বিশ্বাসের স্বর্গ লোক থেকে আজকের

---

* বিভূতিভূষণ অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে অসম্ভব বা অবাস্তব মনে করতেন না: সেগুলি কোন কোন লোকের অভিজ্ঞতার বাইরে এই মাত্র। 'রুক্মিনী দেবীর খড়্গ' গল্পের সুরুতে লেখক বলেছেন : 'জীবনে অনেক জিনিষ ঘটে, যাহার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহাকে আমরা প্রতিপ্রাকৃত বলিয়া অভিহিত করি। জানি না, হয়তো খুঁজিতে জানিলে তাহাদেরও সহজ ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ বাহির করা যায়। মানুষের বিচার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ কারণগুলি ছাড়া অন্য কারণ হয়তো তাহাদের থাকিতে পারে—ইহা লইয়া তর্ক উঠাইব না—শুধু এইটুকু বলিব, সেরূপ কারণ যদিও থাকে—আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দ্বারা তাহার আবিষ্কার হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই, তাহাদিগকে অতিপ্রাকৃত বলা হয়।'

প্রায় সব লোকই চ্যুত। কেউ তাদের মতলোকের মাটি ধরবার চেষ্টা করছে, কেউ বা মর্তস্তরে ত্রিশংকু। নিরংকুশ বিশ্বাসের স্থান জনমানসে আজ সংকীর্ণ। তাই এ জাতীয় গল্প লিখতে গেলে আধুনিক লেখকরা বিশেষ ধরণের আবহাওয়া স্বষ্টির চেষ্টা করেন, যে-আবহাওয়া পাঠকের মনে একটা সূক্ষ্ম শিহরণ জাগায়; অথবা বিশেষ কোন মনস্তাত্বিক ভিত্তির উপরে অতিপ্রাকৃত সূক্ষ্ম জগৎকে গড়বার চেষ্টা করেন (যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' গল্পটির অতিপ্রাকৃত আবহাওয়ার ভিত্তি স্বামীটির অপরাধবোধ)। কিন্তু বিভূতিভূষণ সাম্প্রতিক কালের এই সব কলাকৌশলের উপর বিশেষ নির্ভর করেন নি। যেন তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, পাঠকরাও তাঁর মত সরল মনে সব কিছু বিশ্বাস করবে। ফলে সূক্ষ্ম কলাকৌশলের দিকে তাঁর নজর ছিল না। কিন্তু তার জন্যে গল্পগুলি যথেষ্ট উঁচু স্তরে উঠতে পারে নি। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর আবহাওয়া, 'নিশীথে'-র মনস্তাত্বিক পটভূমি, 'মাষ্টার মশাই'-এর প্রথম অংশের অস্বস্তিকর শিহরণের তুল্য কিছু বিভূতিভূষণে অনুপস্থিত। 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্পে' তবু আবহ-স্বষ্টির কিছু চেষ্টা আছে, অন্যত্র তাও প্রায় নেই।

বিভূতিভূষণের এই জাতীয় গল্পের আর একটি বিশেষত্ব, তাঁর অশরীরীদের অনেকেই বেশ স্নিগ্ধস্বভাব। 'পৈতৃক ভিটা' গল্পের লক্ষ্মী নামক অতিলৌকিক মানবীর কী অপরূপ শান্তিময় সস্নেহ রূপ। 'কাশী কবিরাজের গল্পে'র সেই মমতাময়ী মা-ও এর উদাহরণ। বিভূতিভূষণ যেন অতিপ্রাকৃত শক্তিকে মঙ্গলকারী হিসেবেই মনে করেন। এই গল্পগুলি অতিপ্রাকৃত আবহ-রচনায় বিশেষ সার্থক না হলেও লেখকের বিশ্বাসের আন্তরিকতা ও স্নিগ্ধ চরিত্র অঙ্কনে দক্ষতার জন্য মোটামুটিভাবে সুখপাঠ্য।

অতিপ্রাকৃত শক্তি যেখানে অমঙ্গলবাহী ও ভীতিকর তেমন গল্পও অবশ্য বিভূতিভূষণে একেবারে অনুপস্থিত নয়। যথা, 'হাসি',

'বিরজা হোম ও তার বাধা' ইত্যাদি। তবে এ গল্পগুলিও উৎকর্ষ-বিচারে খুব উঁচু যায়গায় স্থান পাবে না।

'ডাইনী' (কিন্নরদল) ঠিক অতিপ্রাকৃত গল্প নয়। আমাদের একটি অর্থহীন কুসংস্কারের উপর এর ভিত্তি। একদিকে সন্তানহীনা নারীর বেদনা, অন্যদিকে আশপাশের মেয়েদের তাকে ডাইনী হিসেবে সন্দেহ—এই পরিস্থিতিই গল্পটির উপজীব্য। ঠিক একই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা তারাশঙ্করের একটি গল্প আছে। গল্পটির নাম 'ডাইনীর বাঁশী'। বিভূতিভূষণের গল্পের পটভূমি শহর, আর তারাশঙ্করের গ্রাম। অনুভূতির তীব্রতায় তারাশঙ্করের গল্পটি নিঃসন্দেহে অনেক ভাল।

পূর্বে বিভিন্ন ধারায় যে-গল্পগুলির উল্লেখ করেছি সেগুলি বিভূতিভূষণের বিশেষ ধরণের মানসপ্রবণতার স্বাক্ষরবাহী। কিন্তু এ ছাড়াও এমন কতগুলি গল্প আছে যাকে মোটামুটিভাবে বলা যায় 'ব্যতিক্রম'। অর্থাৎ তাঁর উপন্যাস-ডায়েরী ইত্যাদির মধ্যে বিভূতিভূষণের এই ধরণের মনের পরিচয় প্রায় নেই বললেই চলে।

নিষ্ঠুরতার কাহিনী বিভূতিভূষণ লিখতে চান না। ওটা তাঁর কোমল কল্পনাপ্রবণ মনের অনুকূল নয়। দুঃখের কাহিনী যেখানে এঁকেছেন, সেখানেও তা এক ভাব-রসে জারিত, যার ফলে তাঁর কাছে 'সুখ ও দুঃখ দুইই অপূর্ব রোমান্স্'। কিন্তু দুঃখ যেখানে রোমান্সের স্বাদ আনে না, বরং তার তীব্রতা পাঠকেব মনে একটা অসহায় যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, এমন কয়েকটি গল্প তিনি লিখেছেন। যথা 'মুক্তি' (গল্পপঞ্চাশৎ), 'ডানপিটে' (যাত্রাবদল) ইত্যাদি। 'মুক্তি'-র নিস্তারিণী ও 'ডানপিটে'র সতীশ যৌবনে যথেষ্ট কৃতী ছিল, বৃদ্ধ বয়সে সংসারের গলগ্রহ হয়ে পড়েছে, আর অক্ষম মানুষ দুটি দু' মুঠো ভাতের জন্য নিত্য নিগ্রহ সহ্য করে। (সংসার-গলগ্রহের চিত্র ইন্দির-ঠাকুরুণেও আছে।) এই নিগ্রহের একটানা বর্ণনা

গল্প দু'টিতে। নিস্তারিণীর মুক্তি ঘটেছে মৃত্যুতে, আর সতীশ কৈশোর-স্মৃতির কাশীতে এসে নিঃস্বতার মধ্যেও এক ধরণের মুক্তি পেয়েছে। এই গল্পগুলির দুঃখচিত্রে স্মৃতি রোমন্থনের স্বাদ নেই, আলো-আঁধারি মায়ায় ঈষৎ বেদনা-মিশ্রিত আনন্দানুভবের রূপকথা এ নয়। এখানে একটানা হৃদয়হীনতার কাহিনী—অনেক যায়গায় এ আতিশয্য পাঠকের কাছে গুরুভার মনে হয়। এবং শুধু এই কারণেই এই গল্পগুলির এক ধরণের ব্যর্থতা আছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে এই হৃদয়হীনতার বর্ণনার মূলে কাজ করেছে নিগৃহীতের প্রতি লেখকের সহানুভূতি।

হৃদয়হীনতার বিপরীত হিসেবে যেখানে সহৃদয় একটি শক্তি সক্রিয়, সেখানে গল্পের ভারসাম্য অনেক বেশী বজায় থেকেছে, এবং গল্পগুলির বিরুদ্ধ দুটি স্রোত বৈপরীত্যের গুণে ভাল খুলেছে; এসব যায়গায় পাঠক ক্লিষ্ট হয়নি, অথচ গল্পের বেদনাটা ঠিকই সঞ্চারিত হয়েছে। ('মুক্তি' ও 'ডানপিটে'-তেও মানবতার স্পর্শ আছে নির্মলা প্রভৃতি চরিত্রে, কিন্তু সেটা বিরুদ্ধ শক্তির কাছে এত ক্ষীণ যে ভারসাম্য নেই)। এই ধরণের গল্পের উদাহরণ, 'যাত্রাবদল', 'একটি দিনের কথা' (কিন্নরদল)। এই গল্পগুলিতে দুই বিরুদ্ধ স্রোত—নীচ স্বার্থপরতা ও সহৃদয় মনুষ্যত্ব—পাশাপাশি সাদা কালো রঙে বয়ে গিয়েছে ও আবেগকে আপেক্ষিকভাবে উজ্জ্বলতর করেছে।

বাস্তবের রূঢ় সূর্যালোকে রোমান্সের আদর্শ সৌন্দর্যলোকের অবসান—এই বিষয়বস্তু বিভূতিভূষণের মনোধর্মের অনুকূল নয়। তাঁর কল্পলোকের সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত নেই। বরং তাঁর কল্পজগৎ ও বাস্তবজগৎ একসঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে চলে—যেন পরস্পরের সাথী, পরিপূরক। কিন্তু 'সুহাসিনী মাসিমা' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'কুয়াসার রং' (বেনীদির ফুলবাড়ী) প্রভৃতি কয়েকটি গল্পে তিনি তাঁর স্বকীয় পথ ছেড়ে উলটো পথ ধরেছেন। সুহাসিনী

ও কণা সম্পর্কে 'আমি' এবং পুতুলের যে কল্পসৌন্দর্য সৃষ্টি করা ছিল, তা একবার চোখে দেখা মাত্রই বাস্তবের আঘাতে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু 'তিরোলের বালা'-র (বেনীদির ফুলবাড়ী) মত গল্প বোধহয় সমগ্র বিভূতি-সাহিত্যে আর একটিও নেই। একটি পাগলী মেয়ে উন্মত্ততার বশে তার দাদাকে হত্যা করে ফেলল—এই রক্তাক্ত ঘটনার ভীতিকর আবহাওয়ার শিহরণ গল্পটিতে সঞ্চারিত। এই গল্পে বিভূতিভূষণের সম্পূর্ণ অন্য ধরণের এক পরিচয় আছে।

'অন্নপ্রাশন' গল্পটি অস্বাভাবিক। একমাত্র শিশুসন্তানের মৃত্যুর পর তাকে সমাহিত করে প্রতিবেশীর ছেলের অন্নপ্রাশনে যাওয়া এবং বাড়ীতে এসে ঘুমিয়ে পড়া পিতামাতার পক্ষে স্বাভাবিক নয় এবং বিভূতিভূষণের নায়ক-নায়িকার কাছে অপ্রত্যাশিত। রাতে বৃষ্টিশব্দে জেগে যখন কেশব কাঁদল, তখন গল্পে স্বাভাবিকতা ফিরেছে ও বিভূতিভূষণকে চেনা যাচ্ছে।

বিভূতি-মানসে ব্যঙ্গ-প্রবণতার স্বাক্ষর বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। নিজের ভাবজগতের এমন গভীরে তাঁর স্বপ্নপ্রবণ মনের স্থিতি যে সেখান থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টির আলোকে বাস্তবের অসঙ্গতি লক্ষ্য করা বেশ অসুবিধা। কিন্তু কয়েকটি গল্পে তিনি এই অসুবিধা কাটিয়ে উঠেছেন, এবং ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের সাধনা করেছেন। তাঁর ব্যঙ্গে অবশ্য আক্রমণের তীব্রতা নেই, আছে মৃদু কটাক্ষ।

'অনুশোচনা'য় (জ্যোতিরিঙ্গণ) এক পাদরি যিনি লোকের পাপ-স্বীকার শ্রবণ করে শাস্তিবিধান করেন, যিনি দুটো কুমড়োর জালি কেউ না বলে নিলে সেটাকে 'চুরি রূপ মহাপাপ' মনে করেন, যাঁর দীর্ঘ দাড়ির দিকে তাকালে অপরাধী 'সত্যিই নিজেকে...ঘোর পাপী ও অসহায় মনে না করে পারে না', সেই পুরোহিত বালাদাস আপ্তে ডুমুর গাছের ঝাড়ের আড়ালে চোরের মত দাঁড়িয়ে

স্নানরতা সুন্দরীর নগ্নসৌন্দর্য-চৌর্যকালে ধরা পড়েছেন একজন 'অপরাধী'-র কাছে, যে-অপরাধীকে আপ্তে স্বয়ং উক্ত অপরাধে শাস্তিবিধান করেছেন সেইদিনই সকালে।

এ যেন মম্-এর 'The Rain'-এর পাদরি সাহেবের অতি-সরল সাদা-মাটা লঘু এক সংস্করণ।

এ যুগের ফিল্ম্-প্রীতির আতিশয্যকে কটাক্ষ করা হয়েছে 'উড়ুম্বর' ও 'আইনষ্টাইন ও ইন্দুবালা' (গল্পপঞ্চাশৎ) গল্পে। একটায় ঠাট্টা লেখককুলের প্রতি, আর একটায় ফিল্ম্-পাগল জনসাধারণের প্রতি। 'উড়ুম্বরে' কালিদাস ভবভূতি থেকে ব্যাস পর্যন্ত তাঁদের বইয়ের 'বাঙ্ময়-আলেখ্য' করাবার জন্য ব্যস্ত। লেখককুলের চিত্রার্পিত হবার লোলুপতা এখানে বিভূতিভূষণের পরিহাসের লক্ষ্য।

'আইনষ্টাইন * ও ইন্দুবালা'-য় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও বাংলাদেশের এক চিত্রতারকা যদি ঘটনাচক্রে একই দিনে রাণাঘাটে

---

* আইনষ্টাইনের প্রতি লেখক অতি সশ্রদ্ধ ছিলেন। তাঁর ডায়রীর একাধিক স্থানে আইনষ্টাইনের নাম উল্লেখ আছে। তবে এখানে জলজ্যান্ত আইনষ্টাইনকে রাণাঘাটে নিয়ে আসা কতটা সঠিক হয়েছে সন্দেহ। নামটা সামান্য পাল্টে নিলেও গল্পের ক্ষতি হোতো না। যাই হোক, এটা তবু লঘু গল্প। সীরিয়াস গল্পের ক্ষেত্রেও সর্বজনবিদিত বিষয়ের পরিবর্তন করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে একজন সমালোচক (গিরিজাপতি ভট্টাচার্য) একবার একটা অভিযোগ করেছিলেন: "'গ্রহের ফের' সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এর নায়ক অধ্যাপক রাজচন্দ্রবাবুর গাণিতিক প্রতিভা প্রতিষ্ঠা করবার আগ্রহাতিশয্যে তাঁকে করা হয়েছে এক ধূমকেতুর ভবিষ্যদ্বাণীকার। লেভেরিয়ে ও অ্যাড্যাম্স্ কর্তৃক নেপচুন্ গ্রহের ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হয়ে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ থিওরীর জয়-জয়কার হয়েছিল বটে, কিন্তু ধূমকেতুর সংখ্যা অতি নির্দিষ্ট ও তাদের আবিষ্কারকদের নাম জগদ্বিখ্যাত, তার মধ্যে একটি বাঙ্গালীরও নাম পাওয়া যায় না। এ হেন গল্পের অবতারণা করে লেখক রাজচন্দ্রবাবুকে 'বিরিঞ্চি-বাবা'-র সমকক্ষ করে তুলেছেন। যা অতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যকে খণ্ডন করে বা যা সর্বজনবিদিত নজিরকে নাকচ করে তা নিয়ে গম্ভীর গল্প-উপন্যাস রচনা সম্বন্ধে আমার আপত্তি নিবেদন করি। ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে কোন বাঙ্গালী এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গে উঠেছিল বা ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড স্কোরিং-কে পরাভূত করেছিল—এ নিয়ে কি গম্ভীরভাবে গল্প রচনা চলতে পারে?" (পরিচয়, মাঘ, ১৩৩৯)।

এসে পড়ে তবে আইনষ্টাইনের সভাগৃহে কী মর্মান্তিক শূন্যতা দেখা দেবে তার বিবরণ। এমন কি বৈজ্ঞানিকপ্রবরের সভার উদ্যোক্তারাও নানা অজুহাতে ইন্দুবালার সভাগৃহে পৌঁছেছে, এবং নগদ মূল্যে টিকিট কিনে। বিজ্ঞানসভার মূল উদ্যোক্তা একা আইনষ্টাইনকে নিয়ে মহাশূন্যতার মধ্যে বসে থেকে থেকে শেষে বৈজ্ঞানিকপ্রবরকে নিয়ে এলেন ইন্দুবালার প্রেক্ষাগৃহে বাণী সিনেমা হলে। পরদিন খবর-কাগজে রিপোর্ট বার হোলো: 'গত সপ্তাহে স্থানীয় বাণী সিনেমাগৃহে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রতারকা ইন্দুবালা দেবী শুভাগমন করেন। নৃত্যকলা-নৈপুণ্যে ও কিন্নরকণ্ঠের সঙ্গীতে তিনি সকলের মনোহরণ করিয়াছেন। বিশেষত 'কালো বাদুড় নৃত্যে' তিনি যে উচ্চাঙ্গের শিল্প-সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন, রাণা-ঘাটবাসিগণ তাহা কোনদিন ভুলিবে না। এই উপলক্ষে উক্ত সিনেমা গৃহে অভূতপূর্ব জন-সমাগম হইয়াছিল।......বিখ্যাত জার্মাণ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন গতকল্য দার্জিলিং যাইবার পথে এখানে মিউনিসিপ্যাল হলে একটি বক্তৃতা দিতে নামিয়াছিলেন। তাঁহাকেও সেদিন বাণী সিনেমা গৃহে ইন্দুবালার নৃত্যের সময় উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল।'

এ কালের চিত্রতারকাপ্রীতির আতিশয্য আর একজন সমকালীন লেখকের হাসির খোরাক জুটিয়েছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'ভক্ত' গল্পের বিষয়বস্তুও এই। চিত্রাকাশের একজন তারকা-দেবী যদি অকস্মাৎ পর্দার স্বর্গলোক থেকে একটি অখ্যাত গ্রামাঞ্চলে স্খলিত হয়ে পড়েন, তবে গদগদ-ভক্তির উপচারে 'দেবী'-র পূজাটা কেমন হয়, তার কৌতুকরসোজ্জ্বল বর্ণনা আছে এই গল্পে। এ ছাড়া আরো কয়েকটি গল্পে তারকাপ্রীতির উৎকট আতিশয্যের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবণতা ব্যঙ্গ বা হাস্যের দিকে স্বল্প। তাঁর 'মূলো—র‍্যাডিশ—হর্স্‌র‍্যাডিশ', * 'অসমাপ্ত' প্রভৃতি

* গল্পটির কিছুটা বাস্তব ভিত্তি আছে। 'তৃণাঙ্কুর'-এ (পৃঃ ৯০—৯১) বিভূতিভূষণ লিখছেন: 'যোধপুরী ছাত্রটি আমাদের নিতে এসেছিল।...এখানে পাহাড়ের ওপর দুটো বড় হ্রদ আছে। একটার নাম আম্বাজেরী আর একটার নাম কি বল্লে যোধপুরী ছাত্রটি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

গল্পেও হাস্যের উপকরণ ছিল, কিন্তু লেখক সেটুকুকে বিশেষ কাজে লাগান নি। 'মূলো' শেষ হয়েছে 'সত্যকার দুঃখ' নিয়ে। আর 'অসমাপ্ত'-র হাসিটুকুকে লেখক যেন স্বেচ্ছায়ই ফুটিয়ে তোলেন নি, আভাস মাত্র দিয়েই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়েছেন। +

তাঁর হাস্যরসাত্মক গল্পগুলির একটা বড় ত্রুটি তাঁর ভাষা। তাঁর অন্যান্য রচনার ভাষায় যেমন বিলম্বিত লয়ের মন্থরতা ও ভাবগাম্ভীর্য বর্তমান, এই লঘুরচনাগুলির ক্ষেত্রেও তিনি তার কোন ব্যতিক্রম ঘটান নি। কিন্তু গল্পের পরিস্থিতিগত হাস্যধ্বনিকে ঠিক মত বাজিয়ে তুলতে সাহায্য করে ভাষার শাণিত দীপ্তি, অথবা তার লঘু গতি, অথবা তার ছদ্ম-গাম্ভীর্য ইত্যাদি। এ সব কলাকৌশল আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেন নি লেখক। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে সব ধরণের গল্পকেই পরিবেষণ করেছেন। এতে গল্পগুলির যতখানি সম্ভাবনা ছিল, ততখানি সার্থকতা পায় নি।

আসল কথা তাঁর মনের পক্ষে এই বিষয়গুলি খুব অনুকূল ছিল না। তবু লেখক যেন তাঁর মানস-বিচরণের সময় নেহাৎ বৈচিত্র্যের খাতিরেই তাঁর বাঁধা সড়কের বাইরে দু একবার পা বাড়িয়েছেন। আর বাঁধা সড়কের বাইরে বলেই গল্পগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

দুটোই বড় সুন্দর—অবিশ্যি আম্বাজেরী হ্রদটা অনেক বড় ও সুন্দরতর। হ্রদের সামনে কলকাতার ঢাকুরের লেককে লজ্জায় মুখ লুকোতে হয়। এক গম্ভীর মহিমার কাছে ঢাকুরিয়া লেক বাল্মীকির কাছে ভারতচন্দ্র রায়। এর কি তুলনা দেব ? ম্লান জ্যোৎস্না উঠলো। যোধপুরী ছাত্রটি লোক ভাল, কিন্তু তার দোষ সে অনবরত বকচে। প্রমোদবাবু তার নাম রেখেছেন: 'মূলো'—সে চুপ করে থাকলে আমরা আরোও অনেক বেশী উপভোগ কর্তে পারতুম।'

+ এ গল্পটির মূলেও সামান্য একটি ছোট ঘটনা আছে। 'হে অরণ্য কথা কও'তে (পৃঃ ৭০৮) লেখক লিখেছেন: 'পরশু এলুম উত্তরপাড়া রাজবাড়ীতে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব সম্পন্ন ক'রে। ...বেশ মজা করে মিটিং করা গেল—ভাটপাড়ার আশালতার সঙ্গে দেখা হল অনেকদিন পরে ---প্রায় আঠারো বছর পরে, ঘটে গেল জিনিষটা আমার সেই গল্পটির মত। একটি ছোট ছেলে এসে বল্লে, আপনাকে আমার মা ডাকছেন।...ঠিক একটি ছোট গল্প। কিছুদিন আগেই এ গল্প আমি লিখেছি কি একটা কাগজে।'

সপ্তম অধ্যায়

রচনারীতি

॥ এক ॥

॥ আঙ্গিক ॥

এ কালের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে বনফুল বোধহয় সবচেয়ে আঙ্গিক-সচেতন; আঙ্গিক নিয়ে তাঁর পরীক্ষার অন্ত নেই। প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই তাঁর আঙ্গিক-নূতনত্বের প্রয়াস থাকে। ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর গঠনকৌশল স্বতন্ত্র।

একজন পাশ্চাত্য সমালোচক বলেছেন, 'Here (অর্থাৎ উপন্যাসে) technique is miner's drill, and it is a peculiarity of this mine that new tools are required for every new seam.' ('Decline and Future of the English Novel,' by Philip Toynbee : New writing and Daylight, 1943—44), অর্থাৎ কথাসাহিত্যিকের প্রতি গ্রন্থেই নতুন হাতিয়ার চাই। এ বিষয়ে বনফুলের মত এতটা নিষ্ঠাবান বোধহয় আর কেউ নন। সমালোচকের এই উক্তিটির আক্ষরিক অর্থের আনুগত্য বনফুলে আছে।

বনফুলের ঠিক বিপরীত কোটীতে বিভূতিভূষণের স্থান। সাহিত্যিক-জন্মের প্রথম দিন তিনি যে-আঙ্গিকের সন্ধান পেলেন, শেষ দিনেও তাকে হাতছাড়া করবার দরকার মনে করলেন না। তাঁর হাতিয়ার একটাই। বনফুল শতায়ুধ।

নতুন বিষয়ই সাধারণত নতুন আঙ্গিক দাবী করে। বনফুলে তা নয়। তিনি হাতিয়ার ঘুরিয়ে কারিকুরি দেখান। প্রাণের পূর্ণতাকেধারণ ও প্রকাশ করে আঙ্গিক, বনফুলের আঙ্গিক বহুক্ষেত্রে শূন্যতাকে আবরিত রাখে।

আর বিভূতিভূষণ প্রথম গ্রন্থেই, জীবনবোধের যতখানি গভীরতা তাঁর ছিল, তার চরম যায়গায় এক বারেই পৌঁছে গিয়েছেন। তার পরে তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থের ভাবরসের মধ্যে বাকী জীবনটা কাটিয়ে গিয়েছেন। সুতরাং তাঁর আঙ্গিক-বৈচিত্র্য সম্ভব নয়। কারণ ভাবসত্যের প্রতিফলন আঙ্গিকে, সে-ভাবসত্য তাঁর অপরিবর্তিত। বৈচিত্র্যের চিন্তা দূরে থাক, তাঁর একতম রূপকল্প সম্পর্কেও তিনি সচেতনভাবে ভেবেছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁর আত্মভাব-মুগ্ধতা তাঁকে এ সব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবতে দিত না।

এই আত্মভাবমুগ্ধতার জন্যই সব উপন্যাস তাঁর প্রায় এক ধরণের একান্তভাষণ—স্বগতোক্তি। যদিও এক 'আরণ্যক' ও 'দৃষ্টিপ্রদীপ' ছাড়া প্রায় কোন উপন্যাসেই 'আমি'-র মারফৎ গল্প বলা হয় নি, তা সত্ত্বেও সূক্ষ্মভাবে তাঁর সব বইই আত্মজীবনীমূলক—বইয়ের প্রতি পাতায় ছড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁর সাহিত্যজীবন ও ব্যক্তিজীবনে কোন ফারাক নেই। তাঁর উপন্যাস ও ডায়রীর মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য, তাঁর উপন্যাস ডায়রীরই কল্পনা-প্রসারিত আদর্শায়িত রূপ। এই উভয় ধরণের সাহিত্য মিলিয়ে পড়লেই এ কথাটার সত্যতা বোঝা যাবে। ডায়রীর কোথাও পাওয়া যাবে কাঠ-বাঁশের কঙ্কাল-কাঠামো, কোথাও খড়-বিচুলির অর্ধপরিস্ফুট প্রত্যঙ্গ রূপ, কোথাও একমেটে আদল, কোথাও এক-রঙা সন্ধিক্ষণ, কোথাও বা বর্ণসমাবেশে সুসম্পূর্ণ প্রতিমা। খুব ভাল উদাহরণ হবে ডায়রী 'স্মৃতির রেখা' এবং উপন্যাস 'আরণ্যক'। দুখানা প্রায় একই বই মনে হয়। 'স্মৃতির রেখা'-তে যেন লেখক প্রাথমিক খসড়াটা করেছেন বা উপন্যাস রচনার মালমসলাগুলো দ্রুত নোট করে রেখেছেন ভবিষ্যতে কাজে হাত দেবেন বলে। * অবশ্য তাঁর ডায়রী নিছক রসহীন তথ্যপঞ্জী নয়, তাঁর অভিজ্ঞতা

---

* বিভূতিবাবুর গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে ঠিক সমান্তরালভাবে একটা ডায়রীর ধারা পাওয়া যায়। একটিতে সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ, অন্যটিতে আন্তর ইতিহাস। এদিক থেকে তিনি

কল্পনারসাশ্রয়ী, কারণ বাস্তবজীবনেও লেখক—'আমার কল্পনাজগতে আমি ডুবে থাকতে চাই' (স্মৃতির রেখা পৃঃ ৭২)।

তারপরে উপন্যাস যখন লেখা হলো তখনও সে বই ডায়রীর কাঠামোকে পূরো ছাড়ল না। বিভূতিভূষণের উপন্যাসেই এ কথা লেখার দরকার হয়ঃ 'ইহা ডায়রী বা ভ্রমণ কাহিনী নহে, ইহা উপন্যাস।' বিভূতিভূষণ তাহলে নিজেও জানতেন যে তাঁর উপন্যাসকে পাঠকরা ডায়রী ইত্যাদি বলে ভুল করতে পারেন। 'কল্পনাও কিছু না কিছু অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে তবে শূন্যে ভর করে—' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪১)। স্মৃতির রেখায় অভিজ্ঞতার অংশ প্রধান, 'আরণ্যকে' ঐ অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে কল্পনা উদ্দীপ্ত। কিন্তু 'আরণ্যক' উপন্যাস হয়েও দিন-ঘটনার সমষ্টির ধারক। উপন্যাস নিশ্চয়ই দিনপঞ্জী নয়, তাৎপর্যমণ্ডিত দিনকেই মাত্র সে গ্রহণ করে। তার বাছাই আছে। কিন্তু বিভূতিভূষণের কাছে কোন দিনই তাৎপর্যহীন নয়, কারণ প্রতি দিনই সূর্য ওঠে, আকাশে—মাটিতে আলোছায়ার খেলা চলে, লতা-পাতা-ফুল-ফল নানা কথা কয়, প্রকৃতি প্রতিদিনই অকৃপণ দাক্ষিণ্য বিতরণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। তাই বিভূতিভূষণের উপন্যাসে, যে-ঘটনা তাঁর ভাল লাগে তাদের অবারিত আবির্ভাব। ঘটনার চরিত্র-দ্যোতকতা বা অন্য ইঙ্গিত সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা স্বল্প।

নিজের মনের মধ্যে তিনি নিমজ্জিত। পাঠক সম্পর্কে সচেতনতাও তাঁর অতি-অল্প। পাঠকের মুখ চেয়ে সস্তা ফরমায়েসী লেখা লিখুন তিনি, তা বলছি না, কিন্তু যারা তাঁর ভাবের ভাবুক,

---

বাংলাসাহিত্যে অনন্য। মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের কিছু চিঠি আছে, ডায়রী নয়। চিঠি তবু দুজনের, ডায়রী একা লেখকের। পাশ্চাত্যের অনেক লেখকের ডায়রী রাখার অভ্যাস আছে। তাতে তাঁদের রচনার প্রাথমিক আভাস ও অন্যান্য চিন্তা স্থান পেয়েছে। হেনরী জেমস, টমাস হার্ডি, ভার্জিনিয়া উলফ্ প্রভৃতির ডায়রী ও উপন্যাস পাশাপাশি পড়লে তাঁদের আন্তর সৃষ্টি-প্রক্রিয়া স্তর-পরম্পরা লক্ষ্য করা যায়। বিভূতিভূষণেও তাই। দ্রষ্টব্য :
Henry James, Tho notebooks of Honry James; Thomas Hardy, The Early Years 1840-1891, The Later Years of Thomas Hardy, 1892-1928, Thomas Hardy's Notebooks; Virginia Woolf, A Writers Diary.

তাঁর রসের রসিক, তাদেরও ক্লান্তি আসতে পারে কোন সীমা অতিক্রম করলে, তা তিনি জানতেন না। নিজের মনের মধ্যে চোখ বুঁজে বসে স্মৃতি-অভিজ্ঞতার স্বাদটা রসিয়ে রসিয়ে স্বয়ং উপভোগ করাতেই তাঁর আনন্দ।

আর এই রসিয়ে স্বাদ গ্রহণের জন্যই তাঁর কাহিনীর গতি অতি মন্থর। ঢিমে তালে তাঁর চলন। এ যুগের অনেক উপন্যাসের চাল ধীর বিশ্লেষণে মন্থর—বিভূতিভূষণে ঠিক তা নয়। তাঁর চলন অপুর আড়বোয়ালের মাইনর স্কুলে যাতায়াতের মতন। ক্রোশ দুই পথ হাঁটতে তার ক্লান্তি দূরের কথা, বরং আনন্দ হোতো। দুধের বট, তুঁতের ছায়া, ঝোপঝাপ মাঠ, মাঝে মাঝে অনেকখানি ফাঁকা আকাশ, আর কত অসংখ্য রকমের মানুষ। এই সব দেখাটাই প্রধান—পথ চলাটাই আনন্দ। আর ভাল ক'রে দেখতে গেলে থামতেও হয়—তাই অপু থামতে থামতে চলে। বিভূতিভূষণের চলাও থামার সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ। বিশ্লেষণ বা পরিণতির জন্যে তাঁর তাড়া নেই। পথের চেয়ে কী এমন বেশী পাওয়া যাবে গন্তব্য-প্রান্তে—এই তাঁর মনোভাব। অতএব পথটাকে দেখতে দেখতে চল, পথের চার ধারে অনেক মণিমুক্তো ছড়ানো আছে সেগুলো কুড়িয়ে নাও। বিভূতিভূষণের লেখনী তাই এক পা চলে, বেশ দু' দণ্ড দাঁড়ায়, তারপরে আবার এক পা চলে। যে যুগে লোকের ব্যস্ততা এরোপ্লেনের গতিকেই অপ্রচুর মনে করছে, সেই যুগের পক্ষে বিস্ময়কর লেখক সন্দেহ নেই। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত নাগরিক ছটফটানি তো নয়ই, উপনাগরিক ডেলীপ্যাসেঞ্জারের ছোটাছুটিও তার অপছন্দ, গ্রামীণ নিশ্চিন্ত ছুটির তালে তাঁর কলম বাঁধা।

বিভূতিভূষণের কাহিনী অত্যন্ত শিথিল-গ্রথিত। একটা ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার যোগ তেমন জৈবিক নয়, একটা থেকে আর একটা উদ্ভূত নয়, আলগা-আলগা ঘটনাগুলো হয়তো কোন চরিত্রের

(বেশীর ভাগ সময়ই নায়কের) মনের সূত্রে শিথিলভাবে গাঁথা। অনেক বই থেকে (যথা, পথের পাঁচালী) মধ্যের কয়েকটা পাতা তুলে নিলেও বইয়ের বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। অন্য লেখকের বইতে এমন করলে পাঠক ঐ মধ্যবর্তী শূন্যতায় হোঁচট খাবে। বিভূতিভূষণে তেমন হবার আশঙ্কা নেই। তাঁর বইয়ের দু'একটি দৃশ্যের সংস্থানে যদি ওলট-পালট করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ আগের দৃশ্য পরে এবং পরের দৃশ্য আগে করে দেওয়া যায়, তাহলেও বিসদৃশ মনে হবে না। 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক' প্রভৃতি গ্রন্থে তো এ কথা খুবই সত্য। এটা হওয়ার কারণও রসাস্বাদী আত্মভাব মুগ্ধ বিভূতি-মানসে নিহিত। অন্যান্য ঔপন্যাসিক যখন নিজের কল্পনাকে প্লটের শাসনে বাঁধেন, তখন বিভূতিভূষণ রসাস্বাদনের আকাশে মুক্তি পেতে চান। প্লটের যৌক্তিক নিয়মশৃঙ্খলা মেনে, পরিমিতির মাপকাঠি মেপে ধাপে ধাপে কাহিনীকে গড়ে তুলবেন, বা তীক্ষ্ণাগ্র চূড়ান্তবিন্দুতে শেষ পর্যন্ত কাহিনীর ওজনটা চড়িয়ে মনকে বিপুলবেগে আকর্ষণ করবেন, এমন ধাত তাঁর ছিল না। ঘটনার নির্বাচনে ও সংস্থানে প্লটের দাবীর কথা তিনি বিশেষ মানতে চাইতেন না, নিজের ভাল-লাগা দৃশ্যের দাবী তাঁর মনের কাছে আগে। ঘটনা বাছাই ও সাজানোতে নাটকসুলভ পরিমিতি ও পারিপাট্য নেই তার। সুরের স্রোতে হাত-পা ছেড়ে ভেসে যাবার মন তাঁর। পা গুনে গুনে সংক্ষিপ্ততম লম্বপথে কোন অভীষ্টে তিনি পৌঁছতে চান না। কারণ, আগেই বলেছি অভীষ্ট তাঁর পথের শেষে নয়, পথের মধ্যে; গন্তব্যে নয়, গমনে। তাঁর কাহিনীতে ক্লাইম্যাক্স্ নামক বস্তুটা প্রায় নেইই বলা চলে; খুব ফ্ল্যাট ধরণে তিনি গল্প বলেন। তাঁর ঘটনার বিশেষ উত্থান-পতন নেই। একটা আপন-মনে-ভাবা অনুভূতিকে আপন-মনে-বলা ভাষায় তিনি প্রকাশ করতে চান। তাঁর সমধর্মী পাঠকও এই পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে ক্লান্তি বোধ করতে বাধ্য।

॥ দুই ॥

॥ স্টাইল ॥

ষ্টাইলের রাজা প্রথম চৌধুরী বিভূতিভূষণের অল্প আগের লোক (১৮৬৮-১৯৪৬)। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই পর্বে তাঁর দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত। 'কল্লোল'-কালীন তিরিশের যুগের বহু লেখকের রচনা-শৈলীতে স্পস্টভাবে অথবা সূক্ষ্মভাবে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব আছে। কিন্তু বিভূতিভূষণ যেমন ভাববস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও স্বতন্ত্র, রচনাশৈলীর দিক থেকেও অপ্রভাবিত।

প্রথম বইতেই বিভূতিভূষণ তাঁর নিজস্ব ষ্টাইলের সেরা স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁর এই ষ্টাইলের বিশিষ্টতা তার সারল্যে, 'সাদা-মাটা'-ভাবে, স্নিগ্ধ মাধুর্যে, এবং স্মৃতিচারণের ঈষৎ-করুণ মধুর এক মেজাজে। এখানে তাঁর ব্যক্তি-আত্মার প্রতিফলন অতি স্পষ্ট। তাঁর সাহিত্য-জীবন ও ব্যক্তিজীবন এক বলেই এই প্রতিফলন এত নিখুঁত।

ষ্টাইলের জগতে প্রমথ চৌধুরী ও বিভূতিভূষণ দুই বিপরীত কোটির মানুষ। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে প্রতিতুলনায় বিভূতিভূষণের এই বিপরীত প্রকৃতি বোঝা আরও সহজ। প্রমথ চৌধুরী নাগরিকতা-পরিশীলিত, বিভূতিভূষণ গ্রামীণতা-পরিপালিত; একজনের ষ্টাইলে নিখুঁত কেতাদুরস্ত ভব্যতা আর একজন একবারেই কেতা-নিরস্ত। একজন কথায় এলোমেলো ভাবটা একেবারেই বরদাস্ত করেন না, কথাগুলিতে কড়া ইস্তিরির ক্রীজ চড়িয়ে তবে সভ্য সমাজে তিনি বেরোন; আর একজন কথাটায় কোনরকম পরিচ্ছন্নতা এলেই খুশী, শানানো ক্রীজের জন্য তাঁর মাথাব্যাথা নেই। প্রমথ চৌধরী বহুপাঠী ও বুদ্ধিনিষ্ঠ.

বিভূতিভূষণ স্বল্পপাঠী ও অনুভূতিনিষ্ঠ। বাকচাতুর্যে প্রমথ চৌধুরীর জুড়ি মেলা ভার, বাকসারল্য বিভূতিভূষণের প্রধান অবলম্বন। অলঙ্কারে চৌধুরী মশায়ের প্রীতি আছে, সে-অলঙ্কার তাঁর ভার নয়, ধার। বিভূতিভূষণ নিরাভরণ, তরুলতা-ফুল-ফল যেমন মাটির স্বভাব-উক্তি, তেমনি স্বভাবোক্তি বিভূতিভূষণের একমাত্র অলঙ্কার ; সেটা কোন কোন সময় বোঝা হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু কোন সময়ই সবুজ স্বাভাবিকতা হারায় না। ঐ সবুজ আশ্রয়ে দু'দণ্ড জুড়োতে হ'লে যেতে হবে বিভূতিভূষণের কাছে, আর ভাষার অস্ত্রচালনার নৈপুণ্য দেখতে হলে যেতে হবে প্রমথ চৌধুরীর কাছে। চৌধুরী মশাই সূক্ষ্মাগ্র এপিগ্রাম ও প্যারাডক্সের খোঁচায় খোঁচায় পাঠকের মনকে এক দণ্ড স্বস্তি দেবেন না, আর বাঁড়ুজ্জ্যে মশাই দেবেন আঘাতের ওপর শীতল সান্ত্বনার প্রলেপ। প্রথম চৌধুরী রৌদ্র-দীপ্ত, বিভূতিভূষণ ছায়া-স্নিগ্ধ। একজনের কিশোর মন গড়ে দিয়েছে বাকবিদগ্ধ কৃষ্ণনগর, আর এক জনের সরল-বাক্ বনগ্রাম। গ্রামাঞ্চলে সবাই আত্মজন, সেখানে ভাষার পোষাকী রূপের দরকার হয় না, আটপৌরে রূপেরই চল ; আর নগরে বেশীর ভাগ সম্পর্কই 'ফর্ম্যাল', এবং সেইজন্য ভাষার পোষাকী রূপও অপরিহার্য।

সব চেয়ে বড় কথা দুজনের মন-মেজাজ। বিভূতিভূষণ যেন নিজের ভাবে বিভোর ; তিনি কথা বলেন নিজের কানে কানে। আর প্রমথ চৌধুরী পরের কান টেনে এনে তাকে দু' কথা শুনিয়ে দেন। প্রমথ চৌধুরীর একটা বড় দৃষ্টি সাহিত্য শিল্প ইত্যাদির ত্রুটির দিকে, তাই ঐ ফুটো-ফাটাকে মনে করে তাঁর ভাষার তীব্র আলোকরশ্মি-পাত ; বিভূতিভূষণের লক্ষ্য প্রধানত পূর্ণ সৌন্দর্যের দিকে, তাই তাঁর ভাষালোকের তীক্ষ্ণতা নেই, বরং আছে উপশমী (soothing) আভা। বাঁড়ুজ্যে মশাইর নজরটা ভাবের দিকে—তিনি ভাবুক ; চৌধুরী মশাইর একটা বড় নজর অভাবের দিকে—তিনি তাই বহু সময়ই চাবুক। সে-চাবুক

অবশ্য কোন কোন সময় মিষ্টি-মাখানো, তাতে ঝাল-মিষ্টি দুটোরই স্বাদ পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণে ঝালের নামগন্ধও নেই। প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে একটি সমালোচক সদা জাগ্রত ; সেই পাহারাদারের খবরদারী তাঁর গল্প-কবিতাতেও। সমালোচনার প্রধান পূর্বশর্ত সর্ববিষয়ে সম-লোচন কিন্তু বিশেষ বিষয়ে বিভূতিভূষণের পক্ষপাতিত্ব সর্বজনবিদিত, সুতরাং সমালোচনাধর্মী লেখা তাঁর পক্ষে দুষ্কর। প্রমথ চৌধুরীর ধরণটা ইন্‌টেলেকচুয়াল, বিভূতিভূষণের ইমোশনাল।

॥ তিন ॥

॥ ভাষা ॥

ছেলেবেলায় পাঠশালায় অপু শ্রুতিলিখন লিখেছিল: 'এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ-গিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশ-পথে সতত-সমীর-সঞ্চরমান-জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত—অধিত্যকা-প্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বন-পাদপ-সমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়······পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ-বিস্তার করিয়া······'

বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাসের' এই অংশ শোনবার সময় অল্পবয়স্ক অপুর অস্ফুট মনে যে প্রতিক্রিয়া জেগেছিল তা বিভূতিভূষণ লিপিবদ্ধ করেছেন: 'শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলা অমন সুন্দর কথা এক-সঙ্গে পরপর সে কখনো শোনে নাই। ও সকল কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না। কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝংকার-জড়ানো এ অপরিচিত শব্দসঙ্গীত, অনভ্যস্ত শিশুকর্ণে অপূর্ব ঠেকিল···' (পথের পাঁচালী, পৃঃ ৬৫)।

অপুর এই প্রতিক্রিয়া থেকে বিভূতিভূষণেরও কোন ধরণের ভাষা তাঁর ভাল লাগে, তার পরিচয় পাওয়া যাবে। বিদ্যাসাগরের এই ভাষার 'ললিত পদের ধ্বনি' তাঁর মনে আবেদন জাগিয়েছিল। অথচ বিদ্যাসাগরের ভাষা শুধু 'ললিত' নয়, তার মধ্যে এক ধরণের দার্ঢ্য আছে, গাম্ভীর্য আছে। কিন্তু এ দিকটা বিভূতিভূষণের মনে বিশেষ সাড়া জাগায় নি। তিনি ছিলেন মাধুর্যের ভক্ত—মনুষ্য চরিত্রের ক্ষেত্রে, প্রকৃতির ক্ষেত্রে এবং ভাষার ক্ষেত্রেও। তাঁর ভাষার ঝোঁক লালিত্যের দিকে বেশী। এ ভাষা সহজে মনকে প্রসন্ন করে।

প্রথম জীবনে সাধুভাষা এবং শেষজীবনে চলিতভাষা ছিল তাঁর প্রধান আশ্রয়। কিন্তু তাতে তাঁর ভাষার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে

নি, কারণ তাঁর মনের, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মেজাজ পালটায় নি। এমন কি, অনেক পাঠক হয়তো খেয়ালই করে না যে তিনি সাধু থেকে চলিত ভাষায় গোত্র পালটেছেন। কারণ গোত্রান্তরিতের ক্রিয়াপদের রূপান্তর ঘটেছে, প্রাণধর্মের রূপান্তর ঘটে নি।

তাঁর ভাষার গুণগুলো দানা বাঁধে সেই সব যায়গায়, যেখানে তাঁর মন সব চেয়ে জেগে ওঠে। যথা, প্রকৃতি-সৌন্দর্য বর্ণনায়, স্মৃতিরোমন্থনে প্রভৃতি। অন্যত্র তাঁর সাদামাটা ভাষা এই উচ্চ মাধুর্যের পর্যায়ে থাকে না। থাকাটা সম্ভব নয়, কারণ জীবনের প্রতিটি প্রসঙ্গে মাধুর্যের সুযোগ নেই। আর এই সাদামাটা অংশগুলিতে লেখকের যেন আনন্দ কম; তিনি এই অংশগুলিকে সংযোগ-সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন তাঁর অভীষ্ট প্রসঙ্গগুলিকে গেঁথে তোলবার জন্য। এই সূত্রগুলির বহু যায়গায় তাই লেখকের ক্লান্ত অনিচ্ছুক নিরানন্দ হাতের স্বাক্ষর আছে। বেশী লেখাও হয়তো এর একট কারণ। কিন্তু অভীষ্ট স্থানগুলিতে পৌঁছলেই তাঁর কল্পনাশক্তি উদ্দীপ্ত হয়, সেই সানন্দ উদ্দীপ্তির আলো পড়ে তখনকার ভাষায়।

বিভূতিভূষণের ভাষার দোষ প্রধানত তিনটি। ক্লান্তিকর একটা একঘেয়েমি আছে তাঁর ভাষার। দ্বিতীয়ত, শব্দবিন্যাসের বিপর্যয় আছে দু' এক ক্ষেত্রে। তৃতীয়ত, ভাষার সংহতি কম। তিনটি ত্রুটিই পরস্পর-সংযুক্ত। তিনটিরই কারণ তাঁর আত্মপরায়ণ ভাবমুগ্ধতা, এবং সচেতনতা ও প্রযত্নের অভাব। কিন্তু এ ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর লেখা একসঙ্গে অনেকখানি পাঠ না করলে, বা তাঁর পূর্বোল্লিখিত শ্রেষ্ঠ অংশগুলির সান্নিধ্যে এলে এক ধরণের ললিত সুরের প্রসন্নতার স্বাদ লাভ করা যায়। অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় বিভূতিভূষণের ভাষার দুর্বলতার কথা বলেও তিনটি গুণের কথা স্বীকার করেছেন। এক, 'স্বচ্ছ ও অনায়াস'। দুই, 'পাণ্ডিত্য-প্রকাশনী কোটেশন বা এলিউশনের অভাব।' তিন, 'দুর্লভ প্রসাদগুণ ও কবিত্বশক্তি'। (পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৩৯)।

॥ চার ॥

॥ স্মৃতিলোক ও চেতনাপ্রবাহ ॥

স্মৃতি-জগতে পদচারণা বিভূতিভূষণের অত্যন্ত প্রিয় কর্ম। বর্তমানের পথে রূঢ়তা ও রুক্ষতার কাঁটা বড় বেশী বাস্তব, তাকে ভোলা যায় না। অতীত স্মৃতির জগতে কাঁটাগুলোর কথা মনে পড়ে না মানুষের। বা পড়লেও তার ধার থাকে না, তখন সেই ভোঁতা কণ্টকাগ্রে হাত বুলিয়েও এক ধরণের আনন্দ আছে। নিজের মনের ভাল-লাগা সেখানে বাধাহীনভাবে মুক্তি পায়, বর্তমানের বাস্তবতায় খণ্ডিত হয় না। এমন কি বিস্মৃতির যবনিকাও সেখানে কোন বাধা নয়। সে যবনিকা অবলীলাক্রমে সানন্দ কল্পনায় এঁকে তোলা যায়। বস্তুত অতীতস্মৃতির জগৎ তো তাই-ই—খানিকটা কল্পনা ও খানিকটা ঘটনায় গড়া। 'বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।' (জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১)।

বিভূতিভূষণ ডায়রী লিখতেন প্রধানত এই স্মৃতিরস পান করবার জন্য। এটা লেখবার সময় একবার নিকট-অতীতের কথা স্মরণ করতে হয়, তখন সেই স্মৃতিরসের আনন্দ তত ঘন নয়। কিন্তু সেই সঞ্চয় পরে কোন এক দিন ঘন স্মৃতিরসের আনন্দ-স্বাদ দান করবে। 'আমি এই সব তুচ্ছ খুঁটিনাটি লিখি এই জন্যেই যে, সবশুদ্ধ দিনটাকে ও তার আবহাওয়াটাকে অনেক দিন পরে আবার ফিরে পাওয়া যাবে। বড় আনন্দ হয়।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪৬-৪৭)। এই ডায়রীর দিনগুলিকে স্মরণপথে আনলেই বিভূতিভূষণের কল্পনাশক্তি একটা মৃদু উত্তেজনা লাভ করত—সেটাকে তিনি রসিয়ে পান করতেন। এই পানপর্বই তাঁর গল্প-উপন্যাসের পর্ব। নিকটকে নিয়ে লিখতেন ডায়রী, সেই নিকটকেই একদিন দূরে ফেলে লিখতেন উপন্যাস বা গল্প।

সে-লেখা ডায়রীর যথাযথ পুনরুক্তি হোতো না, হোতো ডায়রীর কাঠামোর উপর কল্পনা-রচিত প্রতিমা। (আগেই বলেছি, 'স্মৃতির রেখা' ও 'আরণ্যক' মিলিয়ে পড়লে এর সত্যতা বোঝা যাবে।) এই জন্য তাঁর সব লেখাতেই স্মৃতি-রোমন্থনের একটা ভঙ্গি আছে, স্বাদও অনেকটা পূর্ববর্ণিত ঐ স্মৃতিরসের।

এই স্মৃতিলোকচারিতার ফলেই মাঝে মাঝে তাঁর উপন্যাসে চেতনা-প্রবাহ (Stream of Consciousness) বর্ণনার আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য আবছা আভাসই মাত্র, জয়েস-প্রুস্ত-প্রমুখ লেখকদের মত এই আঙ্গিকের পরিণত স্তরে তিনি যান নি। মাত্র দু' একটি যায়গায় ঐ স্তরের রচনাভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়—যেখানে আভ্যন্তর পরাগতির (Inward Turning) চিহ্ন আছে। পাশ্চাত্ত্য সমালোচকরা এই আন্তরচারিতার মধ্যে mental prattle, association, revery, musing, building up প্রভৃতি যে সূক্ষ্ম ভাগ করেছেন, তার অনেকগুলিরই অস্ফুট স্বাক্ষর পাওয়া যাবে বিভূতিভূষণে। 'পথের পাঁচালী'র শেষ দিকে অপু নিশ্চিন্দিপুরে ফিরতে চায়, তখন তার চিন্তাপ্রবাহের বর্ণনা দিয়েছেন বিভূতিভূষণ এইভাবে :

'আস্তাবলে দুই সহিসে ঝগড়া বাধাইয়াছে, রান্নাবাড়ীর ছাদে কাকের দল ভাতের লোভে দলে দলে জুটিতেছে—একটু পরে তাহার মনে হইল একই কি কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছে, একই কি কথা। আস্তাবলে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ থামে নাই···সে যেন মাটির ভিতর কোথায় সেঁধিয়া যাইতেছে···খুব, খুব মাটির ভিতর · নীচের দিকে যেন টানিতেছে বেশ আরাম···মাথা ধরা নাই বেশ আরাম।

'উঃ—কি রোদটাই ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে! দিদির যা কাণ্ড—এত রদ্দুরে চড়ুইভাতি! সে বলিতেছে—দিদি শুয়ে নে, এত রদ্দুরে চড়ুইভাতি?

'রাণুদি কানের কাছে বসিয়া কি সব কথা, অনেক কি সব কথা·

বলিয়া যাইতেছে। রাণুদির ছলছলে ডাগর চোখ দুটি অভিমান-ভরা। সে কি করিবে? নিশ্চিন্দিপুরে তাদের চলে না যে? রাণুদি না লীলা?

'হারাণ কাকা বাঁশের বাঁশি বেচিবার জন্য আনিয়া বাজাইতেছে··· ভারী চমৎকার বাজায়! সে বাবাকে বলিল—এক পয়সার বাঁশের বাঁশি কিনবো বাবা, একটা পয়সা দেবে?

'তাহার বাবা তাহার বড় বড় চুল কানের পাশে তুলিয়া দিতে দিতে আদর করিয়া বলিতেছে—বেশ হয়েছে তোর গল্পটা, ছাপিয়ে এলে আমায় দেখতে দিস্ খোকা?

'সে বলিতেছে—কোকেন কি বাবা? গিরিশ সরকার বলেচে আমি নাকি কোকেন খাবো—

'বাবার গলায় পদ্মবীজের মালা। সেই কথক ঠাকুরের মত। তাহাদের মাঝেরপাড়ার ইষ্টিশান, কাঠের বড় তক্তায় লেখা আছে, মা-ঝে-র-পা-ড়া। সে আগে আগে, ভারী বোঁচকাটা পিঠে, মা পিছনে পিছনে। তাহার গায়ে রাঙ্গা পাঞ্জাবিটা, কেমন ছায়া সারাপথে। আকাশে সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে। পাকা বটফলের গন্ধে ভরা বাতাসটা।

'নিশ্চিন্দিপুরের পথ যেন ফুরাইতেছে না···সে চলিয়াছে··· চলিয়াছে···চলিয়াছে···সে আর মা···এ পথে একা কখনো আসে নাই, পথ সে চিনিতে পারিতেছে না···ও কাস্তে-হাতে কাকা, শুনচো, নিশ্চিন্দিপুরের পথটা এট্টু বলে দ্যাও না আমাদের। যশড়া-নিশ্চিন্দিপুর বেত্রবতীর ওপারে?' (পথের পাঁচালী, পৃঃ ২৩২)

দ্বিতীয় উদাহরণ নিচ্ছি 'অপরাজিত' থেকে। মৃত্যুর আগে সর্বজয়ার চিন্তাধারা:

'জ্যোৎস্না অপূর্ব, ভয় হয় না···কেমন একটা আনন্দ···আকাশটা, পুরাতন আকাশটা যেন স্নেহে প্রেমে জ্যোৎস্না হইয়া গলিয়া ঝরিয়া বিন্দুতে বিন্দুতে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে···টুপ···টুপ···টুপ-

টাপ···আবার কান্না পায়···জ্যোৎস্নার আলোয় জানালার গরাদ ধরিয়া হাসিমুখে ও কে দাঁড়াইয়া আছে?···সর্বজয়ার দৃষ্টি পাশের জানালার দিকে নিবদ্ধ হইল···বিস্ময়ে, আনন্দে রোগশীর্ণ মুখখানা মুহূর্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল···অপু···দাঁড়াইয়া আছে। এ অপু নয় সেই ছেলেবেলাকার ছোট্ট অপু···এতটুকু অপু···নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবনের ভিটেতে এমন কত চৈত্র জ্যোৎস্না-রাতে ভাঙ্গা জানালার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িত যাহার দন্তহীন ফুলের কুঁড়ির মত কচি মুখে···সেই অপু···

'ও ছেলেমানুষ খঞ্জন পাখীর মত ডাগর ডাগর চোখের নীল চাহনি···চুল কোঁকড়া কোঁকড়া মুখচোরা, ভাল মানুষ লাজুক বোকা···জগতের ঘোরপ্যাঁচ কিছুই একেবারে বোঝে না···কোথায় যেন সে যায়,···নীল আকাশ বাহিয়া বহুদূরে···বহুদূরের দিকে, সুনীল মেঘপদবীর অনেক উপরে···যায়···যায়···যায়···যায়···মেঘের ফাঁকে যাইতে যাইতে মিলাইয়া যায়।'···(অপরাজিত, পৃঃ ২৫৪-৫৫)।

প্রথম উদাহরণের ভাবনাধারাটি তন্দ্রাকালীন, দ্বিতীয়টির প্রাক-মৃত্যু মুহূর্তের। স্বাভাবিক অবস্থার মন বর্ণনায় প্রায় অসম্বদ্ধ, ইতস্তত-বিচরণশীল চেতনাধারার উল্লেখ বিভূতিভূষণ করেন নি। কাহিনীর বর্ণনায় তিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের বিপর্যয় ঘটান না। কাল-ক্রমের পারম্পর্য রক্ষায় তিনি উৎসাহী; সকল কালকে ভেঙ্গে চুরে একটা চেতনার মণ্ড বানাতে চান না তিনি। এ ক্ষেত্রে বিভূতি-ভূষণ গতানুগতিক ভঙ্গীর অনুসারী। পাশ্চাত্যের একাধিক আধুনিক স্মৃতিচারী লেখক কালক্রমের ব্যত্যয় ঘটিয়ে যে নূতন পরীক্ষা করেছেন, স্মৃতিপ্রীতি সত্বেও বিভূতিভূষণ সে দলের নন।

'স্মৃতির এক কাজ সময়ের গতিকে স্তম্ভিত করিয়া কালপ্রবাহকে বিপরীত মুখে চালানো। প্রখর স্মৃতির সাহায্যে বর্তমানের কঠিন নিগড় হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, অতীত বর্তমান অপেক্ষাও সজীব

হইয়া উঠে। এই স্মৃতিলীলার ফলে বিভূতিবাবুর উপন্যাসে বর্তমান হইতে অতীতে ও অতীত হইতে বর্তমানে নিয়ত যাতায়াত চলে। হঠাৎ প্রুস্ত্‌-এর 'হারানো কালের অনুধাবনের' কথা মনে পড়িয়া যায়। পরক্ষণেই ধরা পড়ে এ তুলনা কপট তুলনা। কথাশিল্পে কালবোধের প্রয়োগে বিভূতিবাবু সনাতন পন্থী; অপুর জীবনকাহিনীতে সময়ের ক্রম সহজেই অনুসরণ করা যায়, ঘটনার পারম্পর্যের শৃঙ্খল অটুট থাকে বলিয়া। প্রুস্ত্‌ একেবারে বিপ্লবপন্থী। তাঁহার কালক্রম বৈজ্ঞানিকের ক্রনোমিটারে ধরা পড়িবার নয়। তাহা একেবারে স্বসিদ্ধ, স্বেতর কোন শাসনের বশীভূত নয়।...

'প্রুস্ত্‌ বর্ণিত কাল স্থিতিস্থাপকশীল, তাহার আপেক্ষিকতা বহির্বর্তী মানদণ্ডের অতীত। এ কথায় সকলেই সায় দিবেন যে প্রুস্তের মধ্যে তারিখ বা যুগসম্বন্ধে কখনো কোন সুনিশ্চিত নির্দেশ থাকে না। তাঁহার উপন্যাসে কাল গণনা মাস বা বৎসরের অনুপাতে হয় না, হয় কেবল আত্মার ঋতুপরিবর্তন অনুসারে। কালের সেই বঙ্কিম প্রবাহ এতই অনিয়ন্ত্রিত যে তাহাকে অঙ্কে বাঁধা অসাধ্য। সেখানে পরিবেষ্টনের সামান্য বিকারই বিশ্বসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট, এবং সেই বিবর্তনেই পাঠক সঞ্জিবিত হইয়া উঠে; সেখানে দেশ ও কাল স্মরণের উপকরণ মাত্র, আসলে উহাদের পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতই অভীষ্ট বস্তু।' (নীরেন্দ্রনাথ রায়, অপরাজিত, পরিচয় শ্রাবণ, ১৩৩৯)

পরিশিষ্ট

বিভূতিভূষণের গ্রন্থপঞ্জী

১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' মুদ্রিত হয়। এর পর প্রায় দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর তিনি (মৃত্যুকাল—কার্তিক ১৩৫৭) যে সকল গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন, তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হোলো। গ্রন্থে মুদ্রিত প্রকাশ-কালের তারিখ (সাধারণত বাংলা সালে) ব্যতীত [ ] বন্ধনীর মধ্যে যে তারিখ দেওয়া হোলো, তা বেঙ্গল লাইব্রেরী সঙ্কলিত 'মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা' থেকে সঙ্কলিত। উভয় রকমের তারিখে কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু গরমিল আছে। যথা, মেঘমল্লার, অপরাজিত, চাঁদের পাহাড়, জন্ম ও মৃত্যু, কিন্নরদল, আদর্শ হিন্দু হোটেল, জ্যোতিরিঙ্গণ। তথ্য-সঙ্কলন কার্যে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত। তাঁর কাছে বর্তমান লেখক কৃতজ্ঞ।

১। পথের পাঁচালী (উপন্যাস)। আশ্বিন ১৩৩৬ [১লা নভেম্বর ১৯২৯ খৃঃ] পৃঃ ৪২৭

উপন্যাসটি লেখা শেষ করে গ্রন্থাকারে কোলকাতায় পাঠান ২৬শে এপ্রিল, ১৯২৮। প্রথম প্রকাশ বিচিত্রায়, আষাঢ় ১৩৩৫-আশ্বিন ১৩৩৬)।

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৩৯।

এ বইয়ের বাল্যপাঠ্য সংস্করণ ঃ

(ক) ছোটদের পথের পাঁচালী। [১৪ আগষ্ট, ১৯৪৪] পৃঃ ১৯২

(খ) আম আঁটির ভেঁপু। [২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৪] পৃঃ ১৮১

২। মেঘমল্লার (গল্প)। শ্রাবণ ১৩৩৮ [৩০শে জানুয়ারি ১৯৩২] পৃঃ ২১৯

সূচী : মেঘ-মল্লার, নাস্তিক, উমারাণী, বউ-চণ্ডীর মাঠ, নব-বৃন্দাবন, অভিশপ্ত, খুকীর কাণ্ড, ঠেলাগাড়ী, পুঁইমাচা, উপেক্ষিতা

(এই গল্পটির নাম নাকি প্রথমে দিয়েছিলেন 'পূজনীয়া'। পরে করেন 'উপেক্ষিতা'। দ্রষ্টব্য, 'পাঁচুগোপালের ডায়রী'—যতীন্দ্রমোহন রায়। —সোমপ্রকাশ, আষাঢ়-ভাদ্র, ১৩৬৬।)

৩। অপরাজিত। (উপন্যাস):

১ম খণ্ড, মাঘ ১৩৩৮ [২৬ এপ্রিল ১৯৩২] পৃঃ ১-৩৫৪

২য় খণ্ড, ফাল্গুন ১৩৩৮ [২৫ মে ১৯৩২] পৃঃ ৩৫৪-৬১৯

প্রথম প্রকাশ প্রবাসীতে। (পৌষ, ১৩৩৬—আশ্বিন ১৩৩৮)। গ্রন্থকার প্রথমে এই গ্রন্থের নাম দেবেন ভেবেছিলেন 'আলোক সারথি'।

৪। মৌরীফুল। (গল্প)। ভাদ্র ১৩৩৯

[৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩২] পৃঃ ১৭৫

সূচী : মৌরীফুল, জলসত্র, রোমান্স, বাক্ষসগণ, হাসি, প্রত্নতত্ত্ব, দাতার স্বর্গ, খুঁটি-দেবতা, গ্রহের ফের, মরীচিকা।

এই গ্রন্থের অন্তর্গত প্রথম গল্পটি প্রথমে 'প্রবাসী'র অগ্রহায়ণ ১৩৩০ সালে মুদ্রিত হবার পর সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত 'কথা ও কাহিনী' গল্পমালার পঞ্চম সংখ্যার পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

৫। যাত্রাবদল। (গল্প)। কার্তিক ১৩৪১

[৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৪] পৃঃ ১৬২

সূচী : ভণ্ডুলমামার বাড়ী, পেয়ালা, উইলের খেয়াল, কনে দেখা, সার্থকতা, একটি দিন, বাইশ বছর, বৈদ্যনাথ, ডানপিটে, যাত্রাবদল।

৬। দৃষ্টি-প্রদীপ। (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৪২ [২৭ আগষ্ট, ১৯৩৫] পৃঃ ৩১৬। 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত (ফাল্গুন ১৩৪০—চৈত্র ১৩৪১)।

৭। বিচিত্র জগৎ (সন্দর্ভ) ভাদ্র, ১৩৪৪। ক্রাউন 1/8 আকার পৃঃ ২৯০
দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৫৬

সূচী : আধুনিক গ্রীস, পারস্য (পার্সিপোলিস), বর্তমান প্যালেষ্টাইন, বর্তমান মাঞ্চুরিয়া, বলিভিয়া, বেলজিয়ামের খালপথে, বরফের রাজ্য (ফিনল্যাণ্ড), ইংলণ্ডের পল্লী, নরওয়ের পল্লী, উত্তর আমেরিকা হইতে দক্ষিণ আমেরিকা, হাওয়াই হইতে সানফ্রান্সিস্‌কো, প্যারিস হইতে স্থল-পথে কাশ্মীর, বোম্বেটেদের শহর সেণ্ট ম্যালো, সাণ্টা ফি, জ্যামেকা, কলোরাডো, বোর্ণিও দ্বীপ, ফিজি দ্বীপ, মাদাগাস্কার দ্বীপ, প্রশান্ত মহা-সাগরের দ্বীপপুঞ্জ (মোইক্রোনেসিয়া), সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জ ও পলিনেসিয়া, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ (লাসিবা), ভারত সমুদ্রের দ্বীপ, হাইতুরু দ্বীপ (পক্ষীদ্বীপ), টাঙ্গানিয়াকা ও কঙ্গো (দক্ষিণ আফ্রিকা), যবদ্বীপের আগ্নেয় গিরি, মরুভূমির দেশ আরব, আরিজোনার মরুভূমি, তুর্কিস্থানের মরুপথ, মাঞ্চুকুও (মঙ্গোলিয়া), পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজন, কলো-রাডো নদী, চীনের নদী, পৃথিবীর বিশালতম অরণ্য (আমাজন), পানামা খাল ও অরণ্য, ভোলাপথ (কানাডার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল), ভূস্বর্গ সেচিলিস, মার্গুয়ের সেলুঙ জাতি, সমুদ্রতলের নূতন জগৎ, জলের তলায় নূতন জগৎ, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের আশ্চর্য বস্তু, তিব্বতী দস্যুদের পবিত্র শিখর—কংকা, কেপ্রিদ্বীপের পাখীর আড্ডা, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার কয়েকটি আশ্চর্য বস্তু, ব্যাঙের চাষ, কোমোডো দ্বীপের অতিকায় গিরিগিটি, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পক্ষী, লিবীয় মরুভূমি, এঞ্জিনবিহীন এরোপ্লেন, আমেরিকার কাঠবিড়ালীর আশ্চর্য ঘুম, ফার্ণ, ভূমধ্যসাগর হইতে পিকিং।

'প্রকাশকের নিবেদন'-এর অংশ বিশেষ : 'ইংরাজিতে Countries of the World, World of Wonder, Lands and Peoples প্রভৃতি যে শ্রেণীর বই,...বাংলাভাষায় 'বিচিত্র জগৎ' হয়েছে সেই শ্রেণীর বই। বইখানির বিষয় নির্বাচন ব্যাপারে কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নি। যে সব লেখক, পর্যটক, অভিযান-কারী বা ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রবন্ধ বা কাহিনী 'বিচিত্র জগৎ' রচয়িতার ভাল লেগেছে, নানা কারণে যে সব কাহিনী তাঁর বিচিত্র ও অপূর্ব মনে হয়েছে

সে সবই তিনি তাঁর নিজস্ব অনম্নুকরণীয় স্টাইলে মনোরম গল্পের মত বর্ণনা করেছেন।...আমাদের পরিচিত জগতের বাইরে যে একটা ব্যাপকতর অজ্ঞাত, সৌন্দর্যময় জগৎ আছে—যে জগৎ রূপে, বর্ণে, গন্ধে, মাধুর্যে—অপূর্ব সমগ্রতায়—অবর্ণনীয়, অপরূপ; 'বিচিত্র জগৎ'-এর পাতায় সেই জগতেরই অনাস্বাদিত আনন্দময় রূপ বিকশিত হয়েচে, প্রবাহিত হয়েচে শান্ত সমুজ্বল বর্ণোৎসবের দীপ্তি।'

উদ্ধৃতির শেষ অংশটি পড়ে হঠাৎ মনে হয় প্রকাশকের বেনামীতে লেখাটি কি স্বয়ং বিভূতিভূষণের ?

গ্রন্থটির তথ্য বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত হলেও লেখক স্বীয় মনকে এর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। একটি ক্ষুদ্র উদ্ধৃতি দিই 'কলোরাডো' অংশ থেকে: 'এই পার্বত্য হ্রদগুলির সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। এদের চারিধারে বন, বনে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরনের বন্যপুষ্প বন আলো করে রাখে, একটি গম্ভীর প্রশান্তি ও চারিদিকের সৌন্দর্যে দর্শকের মনঃপ্রাণ বিভোর হয়ে ওঠে। যারা খেলাধূলা ভালোবাসে না, শুধু বসে বসে ভাবতে চায় বা কবিতা লিখতে চায়, তারা নৌকা ভাড়া করে আপন মনে আসন্ন সন্ধ্যায় হ্রদের নিস্তরঙ্গ নীল জলে ইচ্ছামত বেরিয়ে বেড়াতে পারে।'

লেখাগুলির বেশীর ভাগ বেরিয়েছিল 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায়, কিছু 'বিচিত্রা'-য় 'বিশ্ব-প্রকৃতি' বিভাগে। 'বিচিত্রা'-র 'বিবিধ সংগ্রহ' বিভাগেও মাসে মাসে এই জাতীয় সন্দর্ভ বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন। যথা, প্রশান্ত সাগরের কয়েকটি মরুদ্বীপ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬), তারকার জন্ম (শ্রাবণ, ১৩৩৬), উল্কার সমাধি (আশ্বিন, ১৩৩৬), ব্রিটানির প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর-কীর্তি (কার্ত্তিক, ১৩৩৬), বর্তমান আবিসিনীয়া (মাঘ, ১৩৩৬); আরিজোনা মরুভূমির পর্বতগাত্রে প্রাচীন ছবি (শ্রাবণ, ১৩৩৭), কলেরেডোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য (ভাদ্র, ১৩৩৭) প্রভৃতি।

শেষের এই লেখাগুলির অধিকাংশই বোধহয় কোন গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। অথচ এই লেখাগুলিতে লেখকের বিশিষ্ট মনের ছাপ আছে।

ইংরাজীতে পঠিত দেশগুলিকে তিনি যেন মানসচক্ষে দেখতেন। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি।

কলেরেডোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি অংশ: 'অত্যন্ত উচ্চভূমি হইতে তুষারাবৃত শিখরগুলির সৌন্দর্য, বিশেষ করিয়া তাহাদের অহরহ পরিবর্তনশীল মূর্তি বড় অদ্ভুত দেখায়—এই হয়তো কোনটা মেঘাবৃত আছে, আবার এখনি মেঘ সরিয়া গিয়া পরিপূর্ণ সূর্যকিরণে তাহার প্রতি-অঙ্গ স্নাত হইতেছে—দূরে অন্য একটা ছোট শিখরে হয়তো ততক্ষণ বৃষ্টি সুরু হইয়াছে, অথচ এখানে মাথার উপরকার আকাশ ঘন নীল, মেঘ-গুলির প্রান্ত রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছে। এখানকার সূর্যাস্তগুলিও দেখিবার জিনিস—সমতল ভূমিতে, এ ধরনের সন্ধ্যার দৃশ্য চোখে পড়ে না।'

'বর্তমান আবিসিনীয়া'র শেষ প্যারাগ্রাফ: 'আবিসিনীয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। বনাচ্ছাদিত পার্বত্যভূমি, তৃণপূর্ণ উপত্যকা, হ্রদ, নদী, পর্বতকন্দর ও Canyon, বড় বড় নির্জন মাঠ—দেশের সর্বত্র এমন ছড়ানো আছে যে, কোনো একটা দৃশ্য বেশীক্ষণ দেখতে হয় না, একঘেয়ে মনে হয় না। আধুনিক সভ্যতা বিস্তার না হওয়ার দরুণ চওড়া রাস্তা নাই, মাঠের মধ্যে বেড়া নাই, টেলিগ্রাফ লাইন নাই, গাড়ীঘোড়া নাই,—চারিদিকে হাস্যময়ী প্রকৃতির মুক্ত অবাধ লীলা।'

৮। চাঁদের পাহাড় (বাল্যপাঠ্য উপন্যাস) ১লা আশ্বিন ১৩৪৪ [২৮শে জানুয়ারী ১৯৩৮] পৃঃ ১৭৭

মৌচাকে প্রথম প্রকাশিত (আষাঢ় ১৩৪২—চৈত্র ১৩৪৩)

উপন্যাসটির ঘটনাস্থল আফ্রিকা। ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনার জন্য লেখক নির্ভর করেছেন প্রধানতঃ Sir Harry Johnston, Rosita Forbes প্রভৃতি বিখ্যাত পর্যটকদের বইয়ের ওপর। জুলুল্যাণ্ডের আরণ্য-অঞ্চলে প্রচলিত ডিঙ্গোনেক (Rhodesian monster) ও বুনিপের প্রবাদ-বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থটি রচিত।

৯। জন্ম ও মৃত্যু (গল্প)। আশ্বিন ১৩৪৪।

[৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮] পৃঃ ১৮৮

সূচী : যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ, জন্ম ও মৃত্যু, সই, রামশরণ, দারোগার গল্প, খুড়ীমা, বায়ুরোগ, অরন্ধনের নিমন্ত্রণ, লেখক, বড়বাবুর বাহাদুরী, অন্নপ্রাশন, তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, ডাকগাড়ী, অকারণ।

১০। আইভ্যানহো (অনুবাদ)। পৃঃ ২১১

১১। কিন্নরদল (গল্প)। কার্তিক ১৩৪৫ [অক্টোবর, ১৯৩৮] পৃঃ ২০৫

সূচী : মণি ডাক্তার, পুরোণো কথা, খোসগল্প, একটি দিনের কথা, বাটি চচ্চড়ি, তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প, ডাইনী, বুধীর বাড়ী ফেরা, বিধু মাস্টার, উন্নতি, কিন্নরদল।

১২। আরণ্যক। (উপন্যাস)। চৈত্র ১৩৪৫

[২১শে মার্চ, ১৯৩৯] পৃঃ ৩৩৩

ইহার বাল্যপাঠ্য সংস্করণ 'ছেলেদের আরণ্যক' অগ্রহায়ণ ১৩৫৩-তে প্রকাশিত হয়। আরো পরে প্রকাশিত হয় 'লবটুলিয়ার কাহিনী।'

১৩। মরণের ডঙ্কা বাজে। (বাল্যপাঠ্য উপন্যাস)।

১৫ই জানুয়ারী ১৯৪০ পৃঃ ১৫০

মৌচাকে প্রথম প্রকাশিত (পৌষ ১৩৪৪—আশ্বিন ১৩৪৬)

১৪। অভিনব বাঙলা ব্যাকরণ। (স্কুলপাঠ্য)

[২৮শে জুলাই ১৯৪০] পৃঃ ১৫৫

১৫। আদর্শ হিন্দু-হোটেল। (উপন্যাস) আশ্বিন ১৩৪৭

[নভেম্বর, ১৯৪০] পৃঃ ২৯২

অধুনালুপ্ত 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ হয়। তখন মাতৃভূমির অন্যতম কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীগোপাল নিয়োগী (দৈনিক 'বসুমতী'র বর্তমান সম্পাদক।) শোনা যায় গোপালবাবুর মেয়ে বীণা বিভূতিভূষণকে হাজারিঠাকুর বলে ডাকত। দ্রষ্টব্য, 'পাঁচুগোপালের ডায়রী'—যতীন্দ্রমোহন রায়,—সোমপ্রকাশ, আষাঢ়-ভাদ্র, ১৩৬৬)।

১৬। অভিযাত্রিক (ভ্রমণ কাহিনী) [২২ মার্চ ১৯৪১] পৃঃ ২৫৮

১৭। বেণীগির ফুলবাড়ী (গল্প) [১৫ই এপ্রিল ১৯৪১] পৃঃ ১৮৯

সূচী ঃ বেণীগির ফুলবাড়ী, মাষ্টার মশায়, তিরোলের বালা, জনসভা, প্রত্যাবর্তন, প্রাবল্য, বাঁশি, পাঁচুমামার বিয়ে, শান্তিরাম, কুয়াশার রঙ, ফিরিওয়ালা, নিস্ফলা।

১৮। স্মৃতির রেখা। (দিনলিপি) ১লা শ্রাবণ ১৩৪৮, পৃঃ ১৫৫ প্রথম ক্যালকাটা পাবলিশার্স সংস্করণ, মহালয়া, ১৩৬২। ২৭শে অক্টোবর, ১৯২৪—এই দিনের ডায়রী প্রথম দুটি পাতা। তারপর ২৯শে এপ্রিল, ১৯২৫ থেকে ২৬শে এপ্রিল ১৯২৮ পর্যন্ত দিনলিপি আছে। পথের পাঁচালী লেখার প্রধান সময় এটা। 'আরণ্যকে'র অরণ্যে তখন লেখক ছিলেন।

১৯। বিপিনের সংসার। (উপন্যাস)। ভাদ্র, ১৩৪৮ [সেপ্টেম্বর ১৯৪১] পৃঃ ৩৪৯। দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৫৮

২০। দুই বাড়ী। (উপন্যাস) মহালয়া ১৩৪৮। পৃঃ ১৮৬ প্রথম সিগনেট সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৫৯

২১। মিসমিদের কবচ। (বাল্যপাঠ্য উপন্যাস) [১লা এপ্রিল ১৯৪২] পৃঃ ৯৯। দেব সাহিত্যকুটীর কর্তৃক কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজে প্রকাশিত।

২২। অনুবর্তন। (উপন্যাস) ভাদ্র, ১৩৪৯ [২২শে জুলাই ১৯৪২ ?] পৃঃ ২৯৯

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। (লেখক এই বইটি লিখেছিলেন 'ক্লার্কওয়েলের স্কুল' নামে। প্রকাশকালে নাম পরিবর্তন করা হয়।)

২৩। তৃণাঙ্কুর। (দিনলিপি) ১৩৫০। পৃঃ ১২৪

এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৯শে জুন ১৯৩৮ থেকে জানুয়ারী ১৯৩৯ পর্যন্ত। 'অপরাজিত' রচনার প্রধান কাল এটা।

২৪। টমাস বাটার আত্মজীবনী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ (১৯৪৩) পৃঃ ১৬০
জন বারোস কৃত ইংরেজী থেকে অনূদিত।

২৫। নবাগত। (গল্প) [২৫ জানুয়ারী ১৯৪৪] পৃঃ ১৮০
সূচী ঃ দ্রবময়ীর কাশীবাস, আশার নেশা, ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল, পারমিট, মুক্তি, গায়ে হলুদ, ঠাকুরদার গল্প, ভিড়, আরক, থিয়েটারের টিকিট, পার্থক্য, স্বপ্ন-বাসুদেব।

২৬। তালনবমী। (গল্প সংগ্রহ) বৈশাখ ১৩৫১ [১৬ই মে ১৯৪৪] পৃঃ ১০৪
সূচী ঃ তালনবমী, রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ, মেডেল, মশলা ভূত, বামা, বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি, অরণ্যে, গঙ্গাধরের বিপদ, রাজপুত্র, চাউল।

২৭। ঊর্ম্মিমুখর। (দিনলিপি)। পৃঃ ৮৫

২৮। দেবযান। (উপন্যাস) [৩ রা অক্টোবর ১৯৪৪] পৃঃ ২৩৭
দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণে পৃঃ সংখ্যা ২৪৪[২১শে জুলাই, ১৯৪৬]

২৯। উপল খণ্ড। (গল্প)। [১৬ই এপ্রিল ১৯৪৫] পৃঃ ১৭১
সূচী ঃ আহ্বান, একটি ভ্রমণ কাহিনী, নসুমামা ও আমি, দৈবাৎ. বিড়ম্বনা, ভুবন বোষ্টুমী, শাবলতলার মাঠ, পৈতৃক ভিটা, দুর্গতি, ফকির, আইনষ্টাইন ও ইন্দুবালা।

৩০। বিধু মাস্টার। (গল্প)। ১৩৫২ সাল [১৯৪৫] পৃঃ ২০৮
সূচী ঃ বাক্সবদল. মূলো—র‍্যাডিস—হর্স র‍্যাডিস, সুলোচনার কাহিনী, বেচারী, অভয়ের অনিদ্রা, অসমাপ্ত, কবি কুণ্ডু মশায়, সঞ্চয়, সুহাসিনী মাসীমা, বিধু মাস্টার, অভিশাপ।

৩১। কেদার রাজা। (উপন্যাস) পৃঃ ৩৬৩

৩২। বনে পাহাড়ে। (ভ্রমণ কাহিনী)। [২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৫] পৃঃ ৮৯
মৌচাকে প্রথম প্রকাশিত (আষাঢ় ১৩৫০—আষাঢ় ১৩৫২)

৩৩   ক্ষণভঙ্গুর   (গল্প) ২৯ শে ভাদ্র ১৩৫২

[সেপ্টেম্বর ১৯৪৫] পৃঃ ১৩১

সূচী : সিঁদুরচরণ, একটি কোঠাবাড়ীর ইতিহাস, বুদোর মায়ের মৃত্যু, ছেলেধরা, রামতারণ চাটুয্যে—অথর, মুটি মন্তর, ফড় খেলা, হাট, অরণ্যকাব্য।

৩৪। উৎকর্ণ। (দিনলিপি) পৃঃ ২৫৪

৩৫। অসাধারণ। (গল্প)। [৭ই মে ১৯৪৬] পৃঃ ১৮১

সূচীঃ অসাধারণ, নদীর ধারের বাড়ি, বিপদ, জন্মদিন, কাঠ-বিক্রি বুড়ো, হারুণ অল রসিদের বিপদ, সুলেখা, রূপো-বাঙাল, তেঁতুল তলার ঘাট, দুই দিন, মাকাল লতার কাহিনী, বংশ লতিকার সন্ধানে, কমপিটিশন, ব্ল্যাক মার্কেট দমন কর, তুচ্ছ, পিদিমের নিচে।

৩৬। হীরা মাণিক জ্বলে (উপন্যাস)। পৃঃ ১৫৯

মৌচাকে প্রথম প্রকাশিত (বৈশাখ, ১৩৪৮--চৈত্র ১৩৪৯)।

৩৭। বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প। [১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭] পৃঃ ২১২

সূচীঃ কিন্নরদল, মৌরীফুল, কানভাসার কৃষ্ণলাল, দ্রবময়ীর কাশীবাস, আহ্বান, একটি ভ্রমণ কাহিনী, নসুমামা ও আমি, বিপদ, তুচ্ছ, সিঁদুর চরণ, তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, ভণ্ডুল মামার বাড়ী, কনে দেখা, মেঘ মল্লার, পুঁই-মাচা।

৩৮। অথৈজল। (উপন্যাস) কার্তিক ১৩৫৪, পৃঃ ২৫৩

৩৯। মুখোস ও মুখশ্রী। (গল্প) [১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৭] পৃঃ ১৭৫

সূচীঃ মুখোস ও মুখশ্রী, বাসু হাড়ি, দৈব ঔষধ, বারিক অপেরা পার্টি, উড়ুম্বর, মাছ চুরি, বেসাতি, কলহান্তরিতা, উল্টোরথ, মুক্তপুরুষ হরিদাস, অন্তর্জলি, বোতাম, খোলস, চৌধুরাণী।

৪০। হে অরণ্য কথাকও। (দিনলিপি) [২৪ জানুয়ারী, ১৯৪৮] পৃঃ ১৮৮

৪১। আচার্য্য কৃপালনী কলোনী। (গল্প)। আশ্বিন ১৩৫৫। পৃঃ ১১৪
নতুন সংস্করণে পরিবর্তিত নাম 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব'।
সূচীঃ আচার্য্য কৃপালনী কলোনী, নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব, বরো বাগদিনী, প্রভাতী, সাহায্য, গিরিবালা, চিঠি, মড়িঘাটের মেলা, হাজারি খুড়ির টাকা, প্রত্যাবর্ত্তন, পড়ে পাওয়া, আমার ছাত্র।

৪২। জ্যোতিরিঙ্গণ। (গল্প)। চৈত্র ১৩৫৫ [১লা মার্চ, ১৯৪৮] পৃঃ ১৩৯
সূচীঃ সংসার হিংয়ের কচুরি, দুই দিন, অনুশোচনা, দাস্থ, বাসা, বন্দী, থনটন কাকা, কালচিতি, দিবাবসান, মুস্কিল, গল্প নয়।

৪৩। ইছামতী (উপন্যাস)। পৌষ, ১৩৫৬ [১৫ জানুয়ারী ১৯৫০]
পৃঃ ২২৪

ইছামতী-প্রীতির উদাহরণ লেখকের সাহিত্যজীবনের গোড়া থেকেই পাওয়া যায়। 'অপরাজিত' থেকে দুটি উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি। অপুর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ইছামতী: 'শৈশবে এই ইছামতী ছিল তার কাছে কি অপূর্ব কল্পনায় ভরা।

'ইছামতী ছিল পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মা। তার তীরের আকাশ বাতাসের সঙ্গীত মায়ের সুখের ঘুম-পাড়ানি গানের শত শত স্নেহে তার নব মুকুলিত কচি মনকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল, তার তীরে সে-সময়ের কত আকাঙ্ক্ষা, বৈচিত্র্য, রোমান্‌স্‌,—তার তীরে ছিল দূরের অদেখা বিদেশ, বর্ষার দিনে এই ইছামতীর কূলে-কূলে ভরা ঢলঢল গৈরিক রূপে সে অজানা মহাসমুদ্রের তীরহীন অসীমতার স্বপ্ন দেখিত......

এখন সে আর বালক নাই, কত বড় বড় নদীর দুকূল-ছাপানো লীলা দেখিয়াছে—গঙ্গা, শোন, বড়দল, নর্মদা—তাদের অপূর্ব সন্ধ্যা, অপূর্ব বর্ণসম্ভার দেখিয়াছে—সে বৈচিত্র্য, সে প্রখরতা ইছামতীর নাই, এখন তার চোখে ইছামতী ছোট নদী।......

কিন্তু তা বলিয়া ইছামতীকে সে কি কখনো ভুলিবে?'

(অপরাজিত, পৃঃ ৩৮২-৮৩)

'ইছামতী এই চঞ্চল জীবনধারার প্রতীক। ওর দুপাড় ভরিয়া প্রতি চৈত্র বৈশাখে কত বনকুসুম, গাছপালা, পাখী-পাখালী, গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত ফুল ঝরিয়া পড়ে, কত পাখীর দল আসে যায়, ধারে ধারে কত জেলেরা জাল ফেলে, তীরবর্তী গৃহস্থবাড়ীতে হাসিকান্নাব লীলাখেলা হয়, কত গৃহস্থ আসে, কত গৃহস্থ যায়—কত হাসিমুখ শিশু মায়ের সঙ্গে নাহিতে নামে, আবার বৃদ্ধাবস্থায় তাহাদের নশ্বর দেহের রেণু কলস্বনা ইছামতীর স্রোতোজলে ভাসিয়া যায় —এমন কত মা, কত ছেলেমেয়ে, কত তরুণ-তরুণী মহাকালের বীথিপথে আসে যায়—অথচ নদী দেখায় শান্ত, স্নিগ্ধ, ঘরোয়া, নিরীহ।'

(অপরাজিত, পৃঃ ৪০২)

এই রকম উদ্ধারযোগ্য অংশ বিভূতিসাহিত্যে আরো আছে।

'ইছামতী' উপন্যাসটি লেখবার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগে ১লা মার্চ, ১৯২৯। 'স্মৃতির রেখা'-তে (পৃঃ ৯১) লিখেছেন ঃ 'খুব রোদ চড়েছে, কল্‌বলিয়াতে স্নান করতে এলাম। ঠাণ্ডা জলে নাইতে নাইতে ভাবছিলাম—ঐ আমাদের গ্রামের ইছামতী নদী। আমি একটা ছবি বেশ মনে করতে পারি—এই রকম ধূ-ধূ বালিয়াড়ী পাহাড়, পাহাড় নয়। শান্ত ছোট, স্নিগ্ধ ইছামতীর দু'পাড় ভরে ঝোপে ঝোপে কত বনকুসুম, কত ফুলে ভরা ঘেঁটুবন, গাছপালা, গাঙশালিকের বাসা সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট, আকন্দ ফুল।......কত হাসিকান্নার মেলা। আজ পাঁচশত বছর ধরে কত গৃহস্থ এল, কত হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল—কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানশয্যা হল ঐ ঠাণ্ডা জলের কিনারাতেই, ঐ বাঁশবনের ঘাটের নিচেই কত মা, কত ছেলে, কত তরুণ-তরুণী সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথিপথ বেয়ে। ঐ শান্ত নদীর ধারে ঐ আকন্দ ফুল, ঐ পাটা শেওলা, বনঝোপে দ্যুতিমান, এদের গল্প লিখবো, নাম

হবে ইছামতী।

৪৪। কুশল পাহাড়ী (গল্প) [৭ই এপ্রিল, ১৯৫১]পৃঃ ২৩৪

সূচীঃ কুশল পাহাড়ী, ঝগড়া, বড় দিদিমা, অবিশ্বাস্য, খেলা, জাল, আবির্ভাব, মান তালাও, বে-নিয়ম, অভিমানী, শিকারী, পরিহাস, জহরলাল ও গড, গল্প নয়, সীতানাথের বাড়ী ফেরা, হরিকাকা, এমনই হয়, ঝড়ের রাতে, চাউল, পথিকের বন্ধু, আর্টিষ্ট, শেষ লেখা।

৪৫। ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (গল্প)। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২। দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৬৩ (জুলাই, ১৯৫৬) পৃঃ ১১০

সূচীঃ আরক, দাদু, বাঘের মন্তর, থনটন কাকা, মুটি মন্তর, হারুণ-অল রসিদের বিপদ, ঠেলাগাড়ি, কাশী কবিরাজের গল্প, অবিশ্বাস্য, বিরজা হোম ও তার বাধা, পথ চেয়ে।

৪৬। গল্প পঞ্চাশৎ।

সূচীঃ নবাগত, উপলখণ্ড, ক্ষণভঙ্গুর, বিধুমাষ্টার ও জ্যোতিরিঙ্গণের 'প্রায় সব গল্প'।

৪৭। রূপ হলুদ। (গল্প) জ্যৈষ্ঠ ১৮৭৯ শকাব্দ। পৃঃ ১১৮

সূচীঃ ননীবালা, বিরজা হোম ও তার বাধা, বুড়ো হাজরা কথা কয়, কাশী কবিরাজের গল্প, ছোট নাগপুরের জঙ্গলে, মায়া, আমার ডাক্তারী, বর্শেলের বিড়ম্বনা, কাদা, ভৌতিক পালঙ্ক।

৪৮। অশনি-সংকেত (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৬৬। পৃঃ ১৬০

'মাতৃভূমি'তে (মাঘ ১৩৫০—মাঘ ১৩৫২) ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। চৈত্র ১৩৫২ সালে মাতৃভূমির অবলুপ্তির পর এই রচনাটি অসমাপ্ত থেকে যায়।

৪৯। দম্পতি (দেব সাহিত্য কুটির প্রকাশিত)।

৫০। অনুসন্ধান (১৯৫৯ খৃঃ) বিভূতি প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিতব্য।